ভক্তি।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

(একাদশ বর্ষ।)

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃপ্রেম স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্যজীবনম্‌ ॥

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

হাওড়া

ভক্তি কার্য্যালয়

ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান হইতে

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া

ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টীং ওয়ার্কস্

হইতে

শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।২০ সাল।

একাদশ বর্ষের সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১,২৫,৮১,১০৫,১৩০,১৭৯ ২০১,২৩৩,২৮৯
গোপনে (পদ্য)	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস	৩
দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন জীবনী প্রসঙ্গ	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪,২৯,১০৮, ১৬২, ৩১০
নববর্ষ (পদ্য)	শ্রীচুনীলাল চন্দ্র	৯
ধর্ম্মোপাসনা	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	১০,৪৬,
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (পদ্য)	শ্রীরসিকলাল দে	১৪,
শ্রবণাদ্বাদশী	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১৬,৩৫
আমি কে?	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন	২৩,৭৫
চিত্রপরিচয়	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী	২৪,৫২,
অভিনন্দন (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাভূষণ	২৭
কামনা	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার	৪০,
দেবসঙ্কেত (পদ্য)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৫,
শ্রবণাদ্বাদশী ব্রতনির্ণয়	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী	৪৯
বৃন্দাবন ভ্রমণ	শ্রীবামাচরণ বসু	৫৩,৮৪,১৮৪,২০৪
তত্ত্বকথালাপ	—	২৩৯,
অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি (পদ্য)	শ্রীশশীভূষণ সরকার	৬৩
জীবতত্ত্ব	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	৬৫
পণ্ডিতের উক্তি (পদ্য)	শ্রীচুনীলাল চন্দ্র	৬৮
কাঙ্গালের মনের কথা	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য	৬৮,...২,১৫৪,২২৪,

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
রাধাষ্টমী (পদ্য)	শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪,
জন্মাষ্টমী (পদ্য)	শ্রীঅনাদিনাথ দে	৭৯
গোরা অনুরাগ (পদ্য)	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য	৯১
অন্তিম নিবেদন (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভক্তিবিনোদ	৯৬
কর্ম্ম	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার	৯৯,১৪৪
প্রেমভৎর্সন	শ্রীগোপীবল্লভ গোসাঞি	১০০,১৩৩
পাতকীর প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীশশীভূষণ সরকার	১০৭
অনুতাপ (পদ্য)	শ্রীহরিদাস গোস্বামী	১১৭
ব্রহ্মগোপাল বেশং	শ্রীগোপীবল্লভ গোসাঞি	১১৮
মোহমুদ্গর (পদ্যানুবাদসহ)	শ্রীচুনীলাল চন্দ্র	১২৯
প্রাণের ডাক	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১৭১
হতাশের নিবেদন (পদ্য)	শ্রীবনমালী দাস ঘোষ	১৮১
ধর্ম্ম	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার	১৮৩,২১৪
আশ্রমধর্ম্ম	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী	১৮৯,২৭১,
শ্মশান (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভক্তিবিনোদ	১৯১
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	১৯৩
বৈষ্ণব পণ্ডিত গঠন	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন	১৯৫
নিবেদন (পদ্য)	শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী	১৯৭
বাসনা	শ্রীহরিনারায়ণ আচার্য্য	১৯৮
আকিঞ্চন (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ	১৯৯
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিরহ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	২০০
ভক্তি ও বৈরাগ্য	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামি পুরাণতীর্থ	১৪৮
দুইটী গীত (পদ্য)	শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৫২
ষট্ সন্দর্ভ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১৫৯
ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল	শ্রী—	১৬০
ক্ষমা (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	২০৩
বৈষ্ণব লক্ষণ	শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহপাত্র	২০৯,২৫৫

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
ভক্তি	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী	২২০
নিমাই আমার কাঁদে কেন,	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী পুরাণতীর্থ	২২৪
হরি তুমি আছ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	২২৮
মুরালী আহ্বান (পদ্য)	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি,এল,	২৩১,২৬৫
শ্রীপদকমল (পদ্য)	শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৩৪
বৈষ্ণব দর্শন	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	২৩৬,
দীনবন্ধু স্মৃতি	শ্রী—	২৪৬
প্রাচীন বৈষ্ণব স্ত্রীকবি	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	২৪৭,৩২২,
পাগলের প্রলাপ	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য	২৫০,২৯২,
বৈষ্ণবব্রত তালিকা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী	২৫৩
সৃষ্টিতত্ত্ব	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার	২৫৯,৩০৬,
আত্মশুদ্ধি	শ্রীঅনাদিনাথ দে	২৭৪
এস (পদ্য)	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস	২৮১
শ্রীশ্রীবংশীবদন ঠাকুর	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	২৭৩
শ্রীগৌরনাম, (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ	২০১
পতিতের প্রার্থনা	শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য	২৯৯
পদভিখারী (পদ্য)	শ্রীশশীভূষণ সরকার	৩০২
হরেনামৈবকেবলম্,	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামি পুরাণতীর্থ	৩০৩
বর্ষশেষে বিজ্ঞপ্তি	সম্পাদক	৩১৫
একি ভয় অকারণ (পদ্য)	শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	৩২০
বরষ অন্তে (পদ্য)	শ্রীরামচন্দ্র সেন	৩২৫
শ্রীবেদনা।	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ভক্তিবিশারদ	পৃথক পত্রাঙ্কে।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১১শ বর্ষ
১৩১৯ সাল

ভাদ্র মাস।
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।

১ম সংখ্যা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

মঙ্গলাচরণম্।

"জয়তু জয়তু দেব দেবকী নন্দনোঽয়ং।
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ॥
জয়তু জয়তু মেঘ-শ্যামলো কোমলাঙ্গঃ।
জয়তু জয়তু পৃথ্বী ভারনাশোমুকুন্দঃ॥

প্রার্থনা।

নারায়ণ জগদ্বন্ধো শরণাগত পালক।
ত্বদ্দাসদাস দাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো॥

হে নারায়ণ! হে জগদ্বন্ধো! হে শরণাগত পালক! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার দাসানুদাস করিয়া রাখ। আমি তোমার কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয় অন্তরে তোমারি প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া জীবন ধন্য করি।

ইচ্ছাময়! তোমার যে কি ইচ্ছা তাহা তুমিই জান, আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের বুদ্ধিশক্তিও ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ সুতরাং সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা তোমার

অসীম লীলা খেলার ভাব বুঝা দূরে থাকুক, কিঞ্চিৎ মাত্র ধারণা করিতে যাইয়াই একেবারে আত্মহারা হইয়া যাই। তুমি যে কখন কাহাকে কিভাবে কর্ম্ম করাইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর করাইতেছ, তাহা মঙ্গলময় সর্ব্বান্তর্যামি! তুমিই জান। আমাদের এমন কোন শক্তি নাই যে তদ্দারা তোমার সেই নিগূঢ় লীলার বিন্দুমাত্র ভাবও হৃদয়ঙ্গম করি। তুমিই জগতের যাবতীয় কর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ এবং তুমিই সকল কর্ম্মের সাক্ষী ও ফলদাতা। আমরা যত কর্ম্ম করিয়াছি বা করিতেছি এবং করিব, সে সমস্তই শক্তিময়! তোমার শক্তিতে। তুমি কি উদ্দেশ্য সাধন মানসে যে আমাদিগের দ্বারা কার্য্য সাধিত করাইতেছ তাহাও তুমিই জান। প্রভো! আমার জানিবারও প্রয়োজন নাই, তবে এই প্রার্থনা, যেন কোন কার্য্যেই নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান না আসে, যেন কৃতকর্ম্মে আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান না করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সমস্তই অকপট প্রাণে তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারি। তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছাতেই যে, সমস্ত হইতেছে এই বিশ্বাস যেন দৃঢ় হয়। "আমি দাস" "তুমি প্রভু" এই 'দাস প্রভু" সম্বন্ধ যেন ভুলিয়া না যাই, তুমি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাকে তোমার আদেশ পালনোপযোগী শক্তি প্রদান কর, আমি তোমার কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া তোমারই আদেশে কর্ম্মক্ষেত্র এই সংসারে তোমার ভাবে ভাবে কর্ম্মকরিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মজনিত ফলভোগ ক্ষয়করি।

হে বিশ্বজীবজীবন! এই বিশ্বসংসার তোমারই মূর্ত্তি, তোমারই মঙ্গলময় ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই পালন কর্ত্তা, আবার তোমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার বিশ্বে যাবতীয় কার্য্যই মঙ্গলের নিমিত্ত হইতেছে, আমরা ঘোর মায়ামুগ্ধজীব, লীলার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াই তোমার মঙ্গলময় সত্ত্বায় দোষারোপ করিতেছি। প্রভো! ভাব দাও, স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি সূক্ষ্ম পদার্থেই তোমার মঙ্গলময় সত্ত্বা অনুভব করি। ভক্তি দাও, তোমাকে ডাকিয়া, তোমার লীলার মর্ম্ম অনুভব করিয়া ভাবে ভাবে তোমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া মানব জীবন সফল করি। "তোমার ইচ্ছায়, তোমার শক্তিতে সমস্ত হইতেছে" এই বিশ্বাস যেন বদ্ধমূল হইয়া যায়। দয়াময় প্রভো! দয়াকর—দয়াকর।

আজ দশ বৎসর যাবৎ ক্ষুদ্র ভক্তি ডালিখানি লইয়া তোমার প্রেমপূর্ণ অমোঘ আশীর্ব্বাদ্ লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। আজ আবার নূতনবর্ষে তোমার

মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ সূচক অভয় বাণী প্রার্থনা করিয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত; তুমি কৃপাদৃষ্টি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ বাণী প্রদান করিয়া আমাদিগকে কার্য্যে উৎসাহিত কর। জানি না এতদিন এই ক্ষুদ্র ভক্তি ডালির কুসুমগুলি তোমার পদসেবার উপযুক্ত হইয়া আসিতেছে কি না, তবে ভরসা আছে যে, শিশুপুত্র পিতাকে ডাকিতে না পারিলেও যখন তাহার আধ আধ অস্পষ্ট বুলিগুলি পিতার নিকট অধিকতর প্রিয় হয়, তখন তুমি জগৎ পিতা ও ভাবগ্রাহী, আমরা তোমার অবোধ শিশুপুত্র, কেন আমাদিগের কথা তোমার প্রিয় হইবেনা? তুমি ভক্তির লেখক ও গ্রাহকগণের উপর শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তোমার অমৃতোপম তত্ত্ব প্রচারে উৎসাহিত কর। প্রতি গৃহে গৃহেই তোমার ভাব লইয়া "ভক্তি" বিরাজ করিতে থাকুক এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ত্রিতাপ তাপে তাপিত হৃদয়কে তোমার প্রেম পূর্ণ কৃপাবারী বর্ষণে শীতল করিতে সমর্থ হউক। হে মঙ্গলময়! হে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ভক্তবৎসল! আমাদিগের এই কাতর প্রার্থনাটী পূর্ণ কর।

দীনহীন—দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য॥

গোপনে।

—:•:—

গোপনে গহনে ফুটিয়া কুসুম
গোপনে বিতরে সুবাস রাশি।
গোপনে গগনে উদিয়া তারকা
ঢালে উজ্জলতা সারাটী নিশি॥
গোপনে গহ্বরে জনমি তটিনী
কুলু কুলু স্বনে ধাইছে ক্ষিতি।
গোপনে গোকুলে গোপবালাগণে
সঁপিলা জীবন প্রেমেতে মতি॥
গোপনে নিশীথে কোবিদ মণ্ডলী
ভাবে সুগভীর কাব্যের কথা।

গোপনে আশার আশ্বাস পাইয়া
বিরহিনী ভুলে বিরহ ব্যাথা॥
গোপনে কোয়েলা স্বরূপ ঢাকিয়া
গায় মাতাইয়া জগৎ প্রাণ।
গোপনে নিহিত নিখিল মঙ্গল
পূজা-জপ-তপ-বিরহ গান॥
গোপনে ধেয়ায় গিরি তরু মূলে
যোগী ঋষিগণ সদা পীতবাসে।
(মন!) ডাকরে গোপনে গোপিকা মোহনে
মিছে কেন ভুলে থাক পরবাসে॥

দীন—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস।

নিত্যধামগত পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

সংসার পথে।

সেই যৌবন কালে, দীনবন্ধু, সংসার হইতে বিদায় লইয়া, যাহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন, গুরু কৃপায় গোবিন্দের কৃপায় যখন তাহার সন্ধান পাইলেন, এবং যখন সাধুগনের দ্বারা সংসারে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন, তখন তিনি আবার সেই সংসারের পথে ফিরিলেন। যৌবনে, বিশেষতঃ বিবাহিত জীবনে, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া ঐকান্তিক ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন তিনি শ্রীগোবিন্দের আশীষ যাচিয়া লইলেন, তখন তাঁহার সংসার আর মরুভূমি বলিয়া মনে হইল না। পরশ মণি যাহার আছে সে সকল পদার্থকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে, কেননা লোহা, পিতল প্রস্তর যাহা কিছু তাহাকে স্পর্শ করিবে তাহাই সুবিমল সুবর্ণে পরিণত হইবে। যাহার হৃদয়ে এই পরশ

মণির শক্তি বিকাশিত হইয়াছে, তাহার আবার ভাবনা কিসের? যিনি সেই পরশ মণির শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সাশ্রু বিগলিত নেত্রে, ভাবোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেন "দীন এই ভিক্ষা চায়, যথা তথা যায়, মন-যেন তে মায় ভোলেনা।" তাঁহার সংসার পথে প্রত্যাবর্ত্তন যে মধুময় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যখন শূন্য কলস লইয়া কেহ জলাশয়ে গমন করে, তখন সেই ঘটাকাশে বায়ুর স্পন্দনে একটা শূন্যতা একটা অপরিপূর্ণতার করুণ ধ্বনি উত্থিত হয় কিন্তু যখন সেই কলস সলিল পূর্ণ করিয়া সেই ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন সেই করুণ স্বর শুনিতে না পাইলেও, তাহার পূর্ণতা তাহার উল্লাস, চলকে চলকে উছলিয়া ওঠে। যে পথ দিয়া সেই শূন্য ঘট আনিয়া ছিল, সেই পথ দিয়া যখন পূর্ণঘট ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার আনন্দোৎফুল্ল আবেগ প্লাবনে পথের কিয়দংশ সিক্ত হইয়া গেল। রবিকর তপ্ত পথের উত্তপ্ত ধূলিকণা রসে সিক্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিল।

ব্রাহ্মণ সন্তান, আজ ঋষি নিশেবিত আচার পালন করিয়া, অধীত শাস্ত্র ও গুরোপদিষ্ট হইয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যখন সংসারে ফিরিতেন, তখন তাঁহারা সংসারে কি অনুপম শান্তির অভিনয় করিতেন। তাই তাঁহাদের সংসার "সংসার আশ্রম" নামে অভিহিত হইত। আর সেই আশ্রমের এই ব্রাহ্মণ আচার্য্যেরা, আচারের দ্বারা, চরিত্রেরদ্বারা সমাজকে শিক্ষা দিতেন যে, সংসার ধর্ম্ম ও সাধন ধর্ম্মে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই; কেবল দৃষ্টির প্রভেদ মাত্র। আলোকে, আনন্দকে, আনন্দের আধার শ্রীগোবিন্দকে, সম্মুখে রাখিয়া সংসার পথে চল, সংসারধর্ম্মকর, সংসারে থাক, তখন দেখিবে সংসারধর্ম্মও সাধনধর্ম্ম হইয়া যাইবে; অন্ধকার, মায়া, অজ্ঞান নিরানন্দ, ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে সরিয়া যাইবে। আর যদি আলোর দিকে, আনন্দের দিকে আনন্দ ময়ের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াও তবে সংসার পথ আঁধারময় হইবে, মায়া, অজ্ঞান ও নিরানন্দ তোমার চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিবে। তাই ব্রাহ্মণ সন্তান, সেকালে আচার্য্য গৃহে অধ্যয়ন ও তৎপরে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা লক্ষ্য স্থির করিয়া সংসার পথে প্রবেশ করিতেন ও সংসারী জীবকে দেখাইতেন যে এই সংসারধর্ম্মও সাধনধর্ম্ম।

দীনবন্ধুও এইরূপে লক্ষ স্থির হইলে সংসারের পথে পদার্পণ করিলেন।

সেই সাধুগণ চরণে বিদায় লইয়া, পবিত্র সুন্দর নয়নানন্দকর ভাবোন্মত্ত ব্রাহ্মণ যুবক, কোন্ পথ দিয়া কোথায় গমন করিয়া ছিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনা সংগ্রহ করা আয়াস সাধ্য নহে তবে আমরা এইটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া দীনবন্ধু অবশেষে কালিঘাটে, অধ্যাপক কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই যে গৃহে না ফিরিয়া অধ্যাপকের নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ইহার ভিতরও একটু রহস্য আছে বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, তিনি শিক্ষাদাতা গুরুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থই তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন ও যাঁহার নিকট বেদান্তের রহস্য অবগত হইয়া বেদান্তের চরম ভগবানের সেই আনন্দময় লীলা রসাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন তাঁহার নিকটে আজ আসিয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে যথার্থরূপে বলিতে পারিলেন :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবেনমঃ॥"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় দীনবন্ধুর সেই দীনতা, সেই সরলতা, চিত্ত প্রসন্নতা ও ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়া, তাঁহার নিকটে তাহাকে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দীনবন্ধু অধ্যাপকের আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে, দীনবন্ধুর পিতা বহুকাল পর্য্যন্ত পুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। পরিজনদিগের নিকট তিনি পুত্রের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না। অবশেষে তিনি, দীনবন্ধুর শেষ শিক্ষা স্থান, কলিকাতা ভবানীপুর ও কালীঘাটে সন্ধান লইবার জন্য, কলিকাতায় আসিলেন। দৈবযোগে এমনি ঘটিল যে তিনি যে পথ দিয়া দীনবন্ধুর সন্ধানে যাইতে ছিলেন, দীনবন্ধুও সেই পথের বিপরীত দিক্ হইতে সে সময় আসিতে ছিলেন। পথের মধ্যে এই ভাবে পিতা পুত্রের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু পিতা, পুত্রকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না। না পারিবার কারণও ছিল, দীনবন্ধুর তখন সুন্দর কপোল বহিয়া লম্বিত চিকুর, পরিধানে গৈরিক বসন, অঙ্গে আলুথালু। এই বেশে সজ্জিত হইয়াও দীনবন্ধুর বদনে যে ভাব ফুটিয়া বাহির হইত, নয়নে যে দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হইত তাহা

দেখিলে, পথের লোকে তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিত। আর চাহিয়া মনে করিত, লোক তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুবিমল সৌম্যমূর্ত্তি তো সহজে দৃষ্টি গোচর হয় না। সুন্দর তো অনেক আছে, কিন্তু এই সুন্দর যুবাকে দেখিলে প্রাণে যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়, যেন কি এক আনন্দের সঞ্চার হয়। কেন এমন হয় তাহা বুঝিতে পারে না, কেবল স্তম্ভিত হইয়া দীনবন্ধুর পানে চাহিয়া থাকে, সাধারণ লোকে যাঁহাকে দর্শন করিয়া এইরূপে আকৃষ্ট হইত, তখন তাঁহার পিতা যে স্বীয় পুত্রকে দেখিয়া, এরূপে আকৃষ্ট হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দীনবন্ধু পূজনীয় জনকের সন্দর্শনে, আত্মগোপন না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন "বাবা! আমিই আপনার দীনবন্ধু।"

পিতার তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না! তাঁহার হারা-নিধি, আজ পথের মাঝে পাইয়া সাশ্রু নয়নে পুত্র দীনবন্ধুকে আলিঙ্গন করিলেন! তখন পুনর্ব্বার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া পিতার সঙ্গে দীনবন্ধু ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যাইবেন কোথা? তিনি তো আর কোথায়ও নির্দ্দিষ্ট ভাবে থাকিতেন না। মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকের বাটিতে অবস্থান করিতেন, কখনও বা ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে অহোরাত্র তত্ত্ব আলোচনায় গঙ্গাতীরে অতিবাহিত হইত। সুতারাং পিতাকে লইয়া কোথায় যাইবেন এই কথা আলোচনা করিতে করিতে তিনি ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইবার পর, তাঁহার পিতৃদেবের ক্লান্তি বোধ হওয়ায় একটি কুটীর সমীপে উভয়ে উপবেশন করিলেন। ঠিক ঐ সময় তথায় কোন লোক আসিয়া তাঁহাদের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ, মহাশয়! এখানে কোন বাটি ভাড়া পাওয়া যায়?" তদুত্তরে সেই ব্যক্তি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—; ঠাকুর! আপনি যেরূপ প্রকৃতির লোক দেখিতেছি, তাহাতে আপনার যে কোন বিষয়ের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে কুটীর দ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন, ঐখানিই তো খালি রহিয়াছে! আর আপনাকে অন্যত্র বাসার সন্ধানে যাইতে হইবে না। ঐ ভূস্বামীও এখনই এখানে আসিতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে কুটীর স্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কুটীর দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। দীনবন্ধুর সংসার গৃহ প্রবেশের ইহাই সূত্রপাত।

গৃহেতো প্রবেশ করিলেন, কিন্তু গৃহস্থলীর দ্রব্যাদি আসে কোথা হইতে? আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ও ঘর ভাড়া কপর্দ্দক শূন্য ব্যক্তি কোথা হইতে দিবেন? দীনবন্ধু প্রথমে, একবার একথাটা ভাবিলেন। তাহার পিতৃদেব, তাহার মনের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন "বাবা কোন বিষয়ের জন্য চিন্তা করিওনা, যিনি তোমার চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন তাঁর শক্তিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে, তুমি আমি কি জগৎ ছাড়া?" কথাগুলি শুনিয়া দীনবন্ধুর প্রাণে "স্বরূপেন ব্যবস্থিতির" ভাবটুকু জাগিয়া উঠিল। আর কি সে ভাব চাপা থাকে? যে ভাবে থাকে, তাহার কাছে ভাবের কথা বলিলে সে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কোন পুত্র-হারা জননীর কর্ণে যদি অপর কোন অপরিচিত কণ্ঠের বিলাপধ্বনি প্রবেশ করে তবে তাঁহারও হৃদয় তখনি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সরল প্রাণের সরল ভাব এমনিই তরল। সামান্য ইঙ্গিতেই বিকশিত হয়। দীনবন্ধুরও তাহাই হইল। ভাবের কথা শুনিয়া ভাবের ভোরে তাঁহার সেই সুমধুর কণ্ঠ, হইতে এই প্রাণারাম প্রার্থনা, গীতকারে নিসৃত হইল,—

ওহে জগদীশ আমি যে বিদেশী ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি হয় না সাধন।
তোমার আদেশে সংসার বিদেশে
(যেন) তোমারি সংসার করিহে পালন ॥

তুমি বিশ্বরূপ অরূপ চিদ্রূপ বিশ্ব তোমার রূপ নাহয় বিরূপ।
প্রভাতে উঠিয়ে চৈতন্য পাইয়ে
চলেছি এবার করিতে ভ্রমণ ॥

দে'খ দয়াময় তোমারি আশ্রয় করিয়ে সংসার (যেন) সং—সার নাহয়।
তুমি হৃষীকেশ হৃদয়ের ঈশ
(ক'রো) সাবধান (যেন) নাহই পাপেতে মগন ॥

(যেন) অন্ধকার দিনে যাপাই যেখানে তাই মন প্রাণে করিহে গ্রহণ।
(যেন) অহং ভাবে ম'জে দ্বিপাদ পশু সেজে
(যেন) প্রতিকাজে তোমায় নাহই বিস্মরণ ॥

(যেন) স্পর্দ্ধা তিরস্কার কলিগত পাপ রোগ শোক দুঃখ দৈন্য অনুতাপ।
হয় না যেন ভবে হতাশ সন্তাপে
ওহে, ত্রিতাপহারী হরি ক'রো নিরীক্ষণ ॥

(এতো) আমার নয় সংসার সকলি তোমার আমিও তোমার তুমিও আমার
ওহে সারাৎসার সংসারের সার
(যেন) সংসারে এবার পাই দরশন ॥
(দেখ) ঐ অধম দীনে আজিকার দিনে ওহে দীননাথ দিও সুদিন দীনে।
যেন তোমা বিনে আর কিছু ভাবিনে
(যেন) তোমারি আদেশ করিহে পালন।

গীত সমাপ্ত হইল, তখন পিতা বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্রের নয়নে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতেছে। এমন সময় ভবানীপুর নিবাসী কোন ধনী ব্যক্তির পরিচারক আসিয়া বিনীত ভাবে বলিল "ঠাকুর মহাশয়! আমার বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তাই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ও জানিতে চাহিয়াছেন যে কোন সময়ে আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাতের সুবিধা হইবে?" এই কথা শুনিয়া দীনবন্ধু মনে মনে একটু হাসিলেন, এবং প্রকাশ্যে বলিলেন "বাছা! তোমার বাবুকে কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার মতন লোকের নিকট আসিতে হইবে না। বরং তাঁহার কখন অবসর হইবে বল, আমি সেই সময় তাঁহার নিকট যাইব।" এই কথা শুনিয়া পরিচারক বলিল, "বাবু আপনার জন্যই বসিয়া আছেন, আপনি তবে অনুগ্রহ করিয়া এখনই যাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।" এই উত্তর পাইয়া, তখন দীনবন্ধু পিতাকে তথায় অবস্থান করিতে বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ও তাহার সহিত গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নববর্ষ।

—:০:—

এস—এস—নববর্ষ এস তুমি এবে,
এসেছি তোমারে আজি করিতে বরণ;
পুরাতন রেখে গেছে অসম্পূর্ণ সবে,
সম্পূর্ণ করগো তাহে করিয়া নূতন।

শর্ব্বরী-তিমির ভেদি' মিহির যেমন,
ধরণী কিরণ রাগে করি' উদ্ভাসিত,
সঞ্চারে জীবের দেহে নূতন জীবন,
ধীরে ধীরে প্রাচীদিকে হইয়ে উদিত;
অপসার করি' তথা বিষাদ, নিরাশা,
এস, ওহে নববর্ষ! এস ধীরি ধীরি;
জাগুক উদয়ে তব হৃদে নব আশা,
উৎসাহ বীণার তান উঠুক ঝঙ্কারি'।
নববর্ষে প্রফুল্লিত সকল হৃদয়!
হউক সকল কর্ম্ম সফলতাময়।

শ্রী চুণীলাল চন্দ্র।

ধর্ম্মোপাসনা।

—:০:—

(রাজসাহী বৈষ্ণব সমতিতে পঠিত।)

ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বোধহয় আপনারা সকলেই জানেন। "ধৃ" ধাতু হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। ধর্ম্মই আমাদিগের দুঃখ দূর করেন, আমাদিগকে পাপ, তাপ হইতে রক্ষা করেন, নরক যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ করেন। স্ত্রী পুত্র ধন ঐশ্বর্য্য বন্ধু বান্ধব আমাদিগকে ইহকালে কোনবিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে বটে কিন্তু পরকালে কেহ সঙ্গে যায় না। পার্থিব স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব কেহই সর্ব্বত্র সকল সময়ে আমাদের বন্ধুর কার্য্য করিতে পারেনা। কেবল ধর্ম্মই ইহপরকাল সর্ব্বত্র সকল সময় আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমাদিগের মৃত্যুর সময় আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান। কিন্তু ধর্ম্ম আমাদিগকে কখন ত্যাগ করেন না। আর্য্যঋষিগণ বলেন :—

"একমেব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনে প্যনু যাতি যঃ।"

মৃত্যুর পরও ধর্ম্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। সেই জন্য ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র সুহৃদ্। অতএব এরূপ বন্ধুর উপাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্মের উপাসনার প্রধানতঃ পাঁচটী পন্থা আছে। কেহ গণপতির, কেহ সূর্য্যের, কেহ শিবের, কেহ শক্তির, কেহ বিষ্ণুর, উপাসনা করেন। রুচি ভেদে এই পাঁচ প্রকার উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। যিনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, গন্তব্য স্থান একই। নদী যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইয়া অবশেষে সাগরে সম্মিলিত হয়, জীবগণও তদ্রূপ আপন আপন ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিয়া পরিণামে ইষ্ট বস্তু লাভ করিয়া থাকে।

বেদে উপাসনার বিবিধ প্রকার যাগ যজ্ঞাদির বিধান আছে। কলিকালে তাহার অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। সেইজন্য কলিকালে তন্ত্রমতে উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। কিন্তু তাহাও সহজ সিদ্ধ নহে। তন্ত্রের ভাষা এরূপ জটিল যে সাধারণলোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। অনেকে কুকর্ম্ম করিয়া ভয়ানক পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। যখন পাপাচারীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইল, তখন ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। মহাপ্রভু যে উপাসনা পদ্ধতি প্রচার করেন তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। তিনি বলেন যে এই মায়াময় সংসার হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। পাপ, তাপ, হরণকারী সমন দমন রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিলেই জীব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের পদাশ্রয় পাইবে।

মহাপ্রভুর গুরুদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বেদান্তে তাহাদের অধিকার নাই। তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ করাই সংসার মোচনের একমাত্র উপায়। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥"

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অনেক উপদেশ আছে তাহা বিস্তার রূপে বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মন্ত্র এই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

ইহার অর্থ বোধ হয় এইরূপ,—যে ব্যক্তি তৃণ হইতেও আপনাকে নীচ মনে করে, বৃক্ষের মত যে ব্যক্তি সহ্যগুণ সম্পন্ন, যে ব্যক্তি নিজে অভিমান শূন্য এবং যে নিজেমান না চাহিয়াও অন্যকে সম্মান করে, সেই ব্যক্তিই হরিনাম কীর্ত্তনের যোগ্য। এইরূপ গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি যে জগতের আদর্শ পুরুষ তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। ঐরূপ স্বভাব পাইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রে চিত্ত শুদ্ধি করিতে হয় আমাদের মন যেমন কলুষ পূর্ণ তাহাতে আমরা কখনই বৈষ্ণব হইতে পারিব না। অন্যেপরে কাকথা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব হইতে ছিল মনেবড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ॥"

মহাপ্রভু লোক শিক্ষার জন্যই ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। নচেৎ যিনি ভগবানের পূর্ণাবতার, তাঁহার আবার বৈষ্ণব হইবার বাধা কি? যাঁহারা মনে করেন আমি বড় ভক্ত, আমি বড় ধার্ম্মিক, আমি বড় সাধু; আমি রূপবান, বলবান, ধনবান, বিদ্বান বলিয়া যাহাদের মনে অহঙ্কার আছে তাহারা কখন শ্রীকৃষ্ণের করুণার পাত্র হইতে পারেনা। ভগবানের করুণা পাইতে হইলে সর্ব্বপ্রকারে অভিমান শূন্য হওয়া আবশ্যক; কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেন, হিন্দু শাস্ত্রের মূল মন্ত্রই এই, "নাহঙ্কারাৎ পরোরিপু" শাস্ত্রে অহঙ্কারকে পরম শত্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একটী গল্প মনে পড়িল। আপনারা বোধহয় সকলেই ঐ গল্প জানেন। তথাপি আমি গল্পের প্রলোভনটী ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। গল্পটী এই:—

গরুড় মনে মনে ভাবিত যে, তাহার মত বীর আর নাই। তাহার মনে এইরূপ অভিমান উপস্থিত হওয়ায় ভগবান তাহার শিক্ষা দেওয়ার জন্য একদিন বলিলেন "গরুড়! অনেক দিন মহাদেবের সঙ্গে দেখা হয়নাই, চল একবার কৈলাশে যাই" গরুড় যে আজ্ঞা বলিয়া পক্ষ বিস্তার করিলে ভগবান গরুড়োপরি উপবেশন করিলেন গরুড় বায়ু বেগে নিমেষ মধ্যে কৈলাশে উপস্থিত হইল। কৈলাশের দ্বার দেশে মহাদেবের বৃহদাকার ষাঁড় দর্শনে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবান তাঁহার

অভিবাদন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় ষাঁড়কে মায়া নিদ্রা দিয়া গেলন। ষাঁড় অমনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। ক্ষণকাল পরে ষাঁড়ের নাসিকাতে গোঁ গোঁ শব্দ হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে গরুড় নিশ্বাসের জোরে শন্ শন্ শব্দে ষাঁড়ের নাশারন্ধ্রে প্রবেশ করিল এবং প্রশ্বাসের সময় গরড় বহু দূরে যাইয়া পতিত হইল। মহাবীর গরুড় আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই পারিল না। দেখিতে দেখিতে পুনরায় গরুড়কে ষাঁড়ের নাসিকা মধ্যে সজোরে টানিয়া লইল, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দেখেন গরুড় নাই। গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কোথায়ও গরুড় নাই। হঠাৎ শন্ শন্ শব্দে ষাঁড়ের নাসরন্ধ্র হইতে গরুড় বাহির হইয়া দূরে নিপতিত হইল। কৃষ্ণ দর্শনে সকলেরই চিত্তে আনন্দের উদয় হয়। কিন্তু গরুড়ের তাহার বিপরিত হইল। গরুড়ের মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে লজ্জার উদয় হইল। কৃষ্ণ বলিলেন, "গরুড়! একি!" তখন গরুড় বলিতে লাগিল হে কৃষ্ণ! রক্ষাকর, বলিতে বলিতে কৃষ্ণের সমক্ষেই পুনরায় গরুড় ষাঁড়ের নাসার মধ্যে প্রবেশ করিল ও তৎক্ষণাৎ প্রশ্বাসের সঙ্গে দূরে পতিত হইল। ভগবানের ইচ্ছায় তখন ষাঁড়ের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় গরুড় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। গরড় ভগবানের চরণে লুন্ঠিত হইয়া বলিল আর কখন অভিমান করিব না। অভিমান করায় ভগবানের প্রিয় বাহন গরুড়েরই এই দশা, অন্যের পক্ষে অভিমান যে সর্ব্বনাশ ঘটাইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি! অতএব মনে কোনরূপ অভিমান আসিতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া সকলেরই আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অন্তঃকরণ পবিত্র করা প্রয়োজন। আবার বাহ্য শুচি না হইলে সহজে অন্তরশুদ্ধি হইতে পারেনা, আজকাল সাধুর বেশ দেখিলে অনেকে ভণ্ড বলিয়া উপহাস করেন, আজকাল যে ভণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সাধুর বেশধারী মাত্রকেই ভণ্ড বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সম্মত নহে। তাহার কার্য্যাবলী বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যাহাহউক চিত্ত শুদ্ধকরিতে হইলে বাহ্য শুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন, পট্টবস্ত্র পরিধান, নামাবলী উত্তরীয় ধারণ ও

সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপগ্রহণ করিলে, মনে যেরূপ এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইলে, মনের চাঞ্চল্য দূর হইয়া মন স্থির হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে। কোনবিষয়ে একাগ্রতা, না জন্মিলে তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না ভগবানের উপাসনা করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা হওয়া আবশ্যক শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে ভগবানের নামে মন একেবারে বিভোর হইয়া যায়। তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকেনা। আপনারা জানেন অনেকে, হরিনাম সংকীর্ত্তন শুনিয়া এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নামেই একবারে মোহিত হইয়া যায়; বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়। আজকাল কোন কোন মহাত্মা ওরূপ মোহভ্রান্তিকে 'ভণ্ডামি বলেন। কাহার হৃদয় এমন পাষাণ যে সে অন্যকে দয়ালু ভাবিতেও পারেনা। সকলের মন সমান নয়। কেহ সহজেই মুগ্ধ হয়। কাহারও হৃদয় এমনই কঠিন যে কিছুতেই বিগলিত হয় না "কাহার সাপের" গল্প বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। দাবা খেলাতে মন এতই মোহভ্রান্ত হইয়াছে যে, নিজ মাতা সর্পদষ্ট হওয়ার সংবাদ পাইয়াও বিচলিত হওয়া দূরে থাকুক "কাহার সাপ" বলিয়া উত্তর দেওয়া হইতেছে। এরূপ আমাদের মন কোন কোন সময়ে কোন বিষয়ে একেবারে বিমোহিত হইয়া যায় তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমশ:

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত!

(গীতি-কবিতা।)

—:•:—

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্॥"

কণ্ঠের হারের মধ্য মণিটী, সুন্দর দ্যুতিমান্।
তারকার মাঝে পূর্ণ শশধর, জুড়ায় নয়ন প্রাণ॥

সুরপুরে নানা দেবতা বেষ্টিত, শোভে কিবা আখণ্ডল।
নৃপতির শিরে হেরি কোহিনূরে, করে তাহা ঝলমল॥
সরিৎকুলের গরিষ্ঠ গঙ্গা, পতিত পাবনী নাম।
পাদপদ্ম হ'তে বাহির হইয়ে পূতকরে কত ধাম॥
হিমের আলয়, ধন্য হিমালয়, নগরাজ ব'লে ধন্য।
ধীর গম্ভীর, পরম যোগীর প্রকাশে ভাবের চিহ্ন॥
সরোবর নীরে পত্র বেষ্টিত অস্ফুট কুসুম মাঝে।
সুন্দর-বর-ফুল্ল কমল, আহা মরি কত সাজে॥
সতী শিরোমণি সহধর্ম্মিণীর সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু।
ললিত কুন্তল, কৃষ্ণসাগর মথি উঠে যেন ইন্দু॥
শঙ্কর বুকে, রাতুল চরণ, বড়ই মানস লোভা।
সখিগণ মাঝে, কিশোর কিশোরী, কি বলিব তার শোভা॥
যোগীদের মাঝে, মহাদেব যোগী সকল যোগীর মান্য।
শিবোঽহং শিবোঽহং রব, উঠিতেছে ভেদি শূন্য॥
জ্ঞানি চাহি আছে, ব্রহ্মের পানে, জ্যোতি হেরি আত্মহারা।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং ভগবান ফেলিতেছে অশ্রুধারা॥
গ্রন্থখনিমাঝে নানারত্ন শোভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গনি কারে?
"শ্রীচরিতামৃত" যেন দুগ্ধসার কে যেন বলিল মোরে॥
ভাব প্রেম রস পুষ্ট কলেবর শ্রীচরিতামৃতখানি।
তাই, শিরঃ পরশিয়ে, নিয়েছি হৃদয়ে, মহারত্ন জ্ঞানে টানি॥
"রাঙ্গাপাদুখানি" মধুর উজ্জল হেরিতে যাহার সাধ।
সাধু গুরু কাছে "চরিতামৃতের" করুক্ সে রসাস্বাদ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

শ্রবণা দ্বাদশী।

—:০:—

শ্রবণা দ্বাদশী সম্বন্ধে শ্রীপত্রিকায় বহুকাল হইতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এক শ্রেণীর লোক একবারেই সে সংবাদ রাখেন না, অথচ সুসিদ্ধান্তিত মীমাংসার প্রতিকূলে নূতন সংশয় উপস্থাপিত করেন, আবার অপর এক শ্রেণীর লোক শফরীর ন্যায় আমাদের কোনও কথার অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে প্রয়াস না পাইয়া উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ান এবং অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায় সুসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বিতণ্ডা করিতে সচেষ্ট হয়েন। আবার আমাদের বন্দনীয় বয়োজ্যেষ্ঠ অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি সময়ে সময়ে পিষ্টপেষণবৎ মীমাংসিত একই কথা লইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে প্রয়াসী হয়েন। আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের মতামতের আলোচনা করিতে হয়। আমরা আবার আমাদের মীমাংসার পুনরুল্লেখ করিতেছি।

শ্রবণা দ্বাদশী অষ্টমহাদ্বাদশীর একতম বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। নিম্নে উহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে :—

গ্রন্থকার ও টীকাকার একই ব্যক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা উপসংহারে শ্রীজীব আত্মপরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন, হরিভক্তি ও তাহার টীকা শ্রীপাদ সনাতনের লিখিত। শ্রীপাদ সনাতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেরণায় বৈষ্ণব স্মৃতি প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই মান্য। গ্রন্থের বাক্য পরিস্ফুট করাই টীকা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন হরিভক্তিবিলাসের দিগ্‌দর্শনী টীকায় শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে স্পষ্টতঃই লিখিয়াছেন, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র সংযোগে মহাদ্বাদশী হয়, সুতরাং শক্তাশক্তের বিচার না করিয়া মহাদ্বাদশীতেই বৈষ্ণবগণের উপবাস করা কর্ত্তব্য। শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণের ২৫২ অঙ্ক ধৃত টীকা দেখুন। সুতরাং শ্রবণা দ্বাদশী মহাদ্বাদশী হইলেই উপোষ্যা।

পূর্ব্বপক্ষ।

"ভাস্বর্ক" •বিধানে মহাদ্বাদশী যোগ সংঘটিত হইলেই বৈষ্ণবগণ শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া এই মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিবেন, নচেৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী ত্যাগের অপর ব্যবস্থা নাই। ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-মহানুভবের সিদ্ধান্ত। তিনিই বৈষ্ণব স্মৃতির প্রবর্ত্তক। তাঁহার আজ্ঞাই চরম সিদ্ধান্ত। অপরের কথা অমান্য। কারিকাতে যে শক্তাশক্তের কথা বলা হইয়াছে উহা স্বমতের সিদ্ধান্ত নহে, শ্রবণা দ্বাদশী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ মাত্র। পূর্ব্বপক্ষের লক্ষণ এইরূপ :—

"সিদ্ধান্তবিরুদ্ধতর্কোপন্যাসেন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধসংশয়ৈককোটি ব্যবস্থাপনম্ পূর্ব্বপক্ষঃ।"

শ্রবণা দ্বাদশী অধিকরণে "একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে" হইতে উপক্রম করিয়া "উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণা দ্বাদশী দিনে" পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত নহে।

নির্ণয়।

অতঃপরে নারদীয় বচনে ব্রত-তিথির নির্ণয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ একাদশী ত্যাগ করিয়াও শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ইহাই নির্ণয়াংশ। সিদ্ধান্তসিদ্ধ বিচার্য্য বাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণই নির্ণয়। গৌতম সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন মুনিও এই কথাই বলিয়াছেন—

"তয়ো (পক্ষপ্রতিপক্ষয়োঃ) রন্যতরস্য নিবৃত্তিরেকতরস্যাবস্থাপনম্ অবশ্যম্ভাবি, যস্যাবস্থাপনং তস্যাবধারণম্-নির্ণয়ঃ।"

এস্থলে উপবাসদ্বয়-ব্যবস্থার নিবৃত্তি করিয়া নারদীয় বচনে এক উপবাসের নির্ণয় করা হইয়াছে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার টীকাতে উহাই পরিস্ফুট করিয়া লিখিয়াছেন। সাধারণ পণ্ডিতেরা "নির্ণয়" বুঝিতে না পারিয়া গোলযোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের একথাটা বুঝা উচিত যে, গ্রন্থকারই টীকাকার। টীকায় তিনি কারিকার নির্ণয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। টীকাতেই তিনি ভাদ্রের শ্রবণা দ্বাদশী যোগকেও অষ্টমহাদ্বাদশীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াই বিচার করিতে আদেশ করিয়া-

ছেন। মহাদ্বাদশীর লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কেবল দ্বাদশীতে কোনও সময়ে শ্রবণা স্পর্শে উপবাস হইবে না।

১। কেহ কেহ, দ্বাদশীর যে কোন সময়ে শ্রবণা স্পর্শ করিলেই উহা উপোষ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিতে ইচ্ছুক। সেরূপ ভাবে একটা শ্রবণা দ্বাদশী হইতে পারে, কিন্তু উহা হরিভক্তিবিলাস গ্রাহ্য নিত্য মহাদ্বাদশী নহে,—উহা রঘুনন্দন-গ্রাহ্য কাম্য শ্রবণা দ্বাদশী। তাহাতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী ত্যাগ করিয়া উপবাস হইতে পারে না। শ্রীপাদ সনাতন বৈষ্ণবগণের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা দেন নাই।

২। শ্রবণা-দ্বাদশী ঘটক শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণে দ্বাদশী শ্রবণা যোগ সম্বন্ধে কুত্রাপি স্পৃশ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় না। গোস্বামি—ভট্টাচার্য্য "স্পৃশ" ধাতুযোগ শ্রবণা দ্বাদশীর যে লক্ষণ করিয়াছেন উহা শাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রমূলক বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

টীকার ভ্রমার্থ-গ্রহণ।

কেহ কেহ বলেন হরিভক্তিবিলাসের ১৫ বিলাসের ২৫০ অঙ্ক ধৃত টীকায় লিখিত হইয়াছে—

"বৈষ্ণবমৃক্ষং শ্রবণং ক্বচিদিতি রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়েঽপীত্যর্থঃ।"

এই টীকা অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে দ্বাদশী ব্রত নির্ণয় করা হয় নাই। যাহারা এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমরা এ বারে দুই ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি, একজন ঢাকা বেতিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী, ইনি আমাদের নিকট পত্রে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। অপরজন শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রের লেখক শ্রীমান্ কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী। বেতিলার শ্রীমান্ মধুসূদন লিখিয়াছেন—"এই টীকার অভিপ্রায়, রাত্রিতে দ্বাদশীর যোগ হইলেও হইবে।" রাত্রিতে যোগ হইলে কি হইবে লেখকের তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত ছিল। শ্রবণা একাদশী বা বিজয়া একাদশী লক্ষণের টীকাতেই উক্ত কথা লিখিত হইয়াছে, মূল শ্লোকটী এই—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা।

•এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অবসানে যে "কচিৎ" শব্দ আছে, উদ্ধৃত টীকায় উহারই অর্থ পরিস্ফুট •করা হইয়াছে; কথা এই যে, ভাদ্রের শুক্লা একাদশী তিথিতে যখন শ্রবণা নক্ষত্র বর্ত্তমান থাকে তখন উহা শ্রবণা-একাদশী নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু এই শ্রবণা নক্ষত্রের ব্যাপ্তি-সঙ্কোচ দ্বারা ইতর ব্যাবৃত্তির রীত্যনুসারে এখানে যে যথান্যায়ে শ্রবণা একাদশীর লক্ষণ করা হইয়াছে, শ্রীমান্ মধুসূদন ও শ্রীমান্ কৃষ্ণপদ বাবাজী তাহা বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল শ্রবণা একাদশীতে, একাদশী তিথিতেই শ্রবণার প্রবৃত্তি থাকে, এই অবস্থায় যদি একাদশীর অহোরাত্রের মধ্যে উহা কোনও সময়ে, এমন কি রাত্রিতে কোনও সময়ে যদি দ্বাদশীকে প্রাপ্ত না হয়, তবে উহা বিজয়া একাদশীতে পরিনত হইবে। ইহাই হইতেছে শ্রবণার ব্যাপ্তি-সঙ্কোচ দ্বারা শ্রবণা একাদশীর লক্ষণ নিরূপণের উপায়।

যদি একাদশ্যুপবাসের অহোরাত্রের মধ্যে কোনও সময়ে, এমন কি রাত্রিতেও যদি কোন সময়ে একাদশীযুক্ত-শ্রবণা, দ্বাদশীকে স্পর্শ করে তবে উহা বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে পরিনত হইবে। তাই পূজ্যপাদ নিখিলশাস্ত্রবিদ্ টীকাকার উদ্ধৃতাংশের পরেই ঐ অঙ্ক ধৃত টীকার শেষাংশে লিখিয়াছেন—"অত এবোক্তং মাৎস্যে"—"দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা। স এব বৈষ্ণবো যোগোবিষ্ণুশৃঙ্খল-সংজ্ঞিতঃ।"

মূল কারিকাতেও—

দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।
স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা:—

"একাদশী" পদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে।
অন্যথা দ্বাদশীস্পর্শস্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে॥

"স্পৃশেদেকাদশীং" এই বাক্যে যে "একাদশী" পদ আছে উহাই এই কারিকার লক্ষ্য। একাদশী পদে এখানে একাদশীর অহোরাত্র বুঝিতে হইবে।

"দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা ইহাতেও স্পৃষ্টতা মাত্রই বুঝাইবে। "শ্রবণস্পৃষ্টা" দ্বাদশী অর্থ এই যে, যে দ্বাদশীকে শ্রবণনক্ষত্র স্পর্শ মাত্র করিয়াছে তাহাই "শ্রবণস্পৃষ্টা" দ্বাদশী। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে একাদশীতে—প্রবৃত্ত শ্রবণা নক্ষত্র, রাত্র্যাদিতে কোনও সময়ে দ্বাদশী স্পর্শ করিলে সেই শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর সহিত একই অহোরাত্রে একাদশী স্পর্শ ঘটিলে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়। এইরূপে একাদশীর অহোরাত্রিতে শ্রবণাস্পৃষ্ট দ্বাদশীর অল্পকাল যোগ হইলেও সেই যোগ অষ্টযামিক বলিয়া ধর্ত্তব্য। ইহাতে পরদিন দ্বাদশী মধ্যে পারণের ব্যবস্থা আছে। একাদশী রাত্রির কোনও সময়ে অল্পকাল সংযোগ জন্যই "শ্রবণস্পৃষ্টা" দ্বাদশী বলা হইয়াছে। নচেৎ "দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষ" ইত্যাদি পাঠ হইত। যথা দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে :—

একাদশী, দ্বাদশীচ বৈষ্ণব্যমপিভক্তবেৎ। „

সুতরাং একাদশী অহোরাত্রে রাত্র্যাদি কোনও সময়ে একাদশীতে-প্রবৃত্ত-শ্রবণার সহিত দ্বাদশীর অল্পমাত্র স্পর্শের কথাই টীকাকারের অভিপ্রায়। তাই ১৫ বিলাসের ২৫৩ অঙ্কের টীকা—উপসংহারে 'বিকল্পো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশী তিথির কোনও সময়ে শ্রবণা স্পর্শ হইলেই যে, শ্রবণা দ্বাদশী হইবে, কারিকা বা টীকা পাঠ করিয়া আমরা বুঝা যায় না।

তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে "একাদশীযুক্ত শ্রবণং ক্বচিৎ (রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়ে পীত্যর্থঃ) যদি দ্বাদশ্যাং ন প্রাপ্যতে তদা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা একাদশী ভবতি সা এব উপোষ্যা চ ভবতি।" একাদশীযুক্ত শ্রবণা একাদশীর অহোরাত্রের মধ্যে কোনও সময়ে দ্বাদশী স্পর্শ করিলে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ সংঘটিত হয়।

পরন্তু এই উত্তর জিজ্ঞাসুর ইহাও বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, "অতএব উক্তং মাৎস্যে" ইত্যাদি এই অঙ্কেরই অন্তর্ভুক্ত এবং "ক্বচিৎ" শব্দের অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়াই ইহার অর্থ করিতে হইবে। নচেৎ টীকার অর্থ-সংলগ্নতা

ও অর্থ-পরিস্ফুটতা হইবে না। এইজন্যই শাব্দিকগণ উপক্রম উপসংহার-সমন্বয়সহ শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণয়ের উপদেশ করিয়াছেন। পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বাক্যের একাংশত্যাগে অপরাংশের অর্থ গ্রহণ করায় ভ্রমসংঘটন অনিবার্য্য। এই উভয় জিজ্ঞাসুই শ্লোকের তাৎপর্য্যে দৃষ্টি না রাখিয়া টীকার একাংশের অসঙ্গত অর্থগ্রহণ করিয়া বিপরীত ধারণায় উপস্থিত হইয়াছেন। হরিভক্তি-বিলাস ও ইহার টীকা দার্শনিক প্রণালীতে লিখিত। সুবিচারিত অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে এই গ্রন্থের তাৎপর্য্যাববোধের শোচনীয় দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়।

উভয় নামই এক শ্রবণা মহাদ্বাদশী-বোধক ;

কেহ কেহ বলেন, বিজয়া দ্বাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশী ভিন্ন। ইহার হেতু নির্দ্দেশ স্থলে ইহারা বলেন—

(ক) বিজয়া দ্বাদশী পক্ষকৃত্যান্তর্গত অষ্টমহাদ্বাদশীর একতম, আর শ্রবণা দ্বাদশী মাসকৃত্যের অন্তর্গত, উহা কেবল ভাদ্র মাসেই ঘটে।

(খ) উভয়ের ফলশ্রুতিতেও ভিন্নতা আছে। আমরা নিম্নে এই ভ্রমের অপনোদন সঙ্কেত প্রদর্শন করিতেছি।

(ক) ১। শ্রীপাদ সনাতনের স্পষ্ট উক্তি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাদ্র কৃত্যের শ্রবণা দ্বাদশীর টীকায় শ্রীপাদ সনাতন শ্রবণা দ্বাদশীকে মহাদ্বাদশী সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। কেননা শঙ্কাশঙ্ক বিষয়ক নির্ণয়ে তিনি এই শ্রবণা দ্বাদশীকেও "মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণের টীকাতেও উপোষ্য-শ্রবণাদ্বাদশীকে মহাদ্বাদশী বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রবণা দ্বাদশী ও বিজয়া দ্বাদশী অভিন্ন।

(খ) ২। সামান্য-বিশেষ কথন

শাস্ত্র-মাত্রেই সামান্য-বিশেষ-কথনের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। হরি-ভক্তিবিলাসেও এই রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই। পক্ষকৃত্যে বিজয়া দ্বাদশীর মহাদ্বাদশীত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু ভাদ্রমাসে এই শ্রবণা দ্বাদশীর

অধিকতর ফলশ্রুতি ও গৌরব, পুরাণাদি-শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায় মাসকৃত্যে বিশেষ-রূপে উহার বর্ণনা করা হইয়াছে—

"আচার্য্যাণামিয়ং শৈলী যৎসামান্যেনাভিধায় বিশেষণ বিবৃণোতি।"

অর্থাৎ আচার্য্যদিগের ইহাই এক সঙ্কেত যে কোন বিষয়ের সামান্যরূপে বর্ণনা করিয়া পরে বিশেষরূপে বর্ণনা করা হয়। ভাদ্রমাসে বিজয়া দ্বাদশীর ফলশ্রুতি নিবন্ধন ভাদ্রে উহা অধিকতর বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পক্ষকৃত্য ও মাসকৃত্যে একই বিজয়া দ্বাদশীরই সামান্য ও বিশেষরূপে পৃথক্ উপন্যাস করা হইয়াছে।

৩। শ্রবণা দ্বাদশীর অপর নাম বিজয়া দ্বাদশী।

শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে যে সকল পুরাণ বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত বচনগুলিতে এই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত বিজয়া দ্বাদশী নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"শুক্লা ভাদ্রপদে স্বর্গ" মিত্যাদিমারভ্য "মহাপুণ্যপ্রদা হ্যেষা সঙ্গমে বিজয়া তিথিরিত্যন্তমিতি।"

তত্রৈব—

"বিজয়া নাম সা প্রোক্তা তিথিঃ প্রীতিকরী হরেঃ।"

তত্রৈব—

"বিজয়া বাসরে সর্ব্বদেবানাং সঙ্গমো ভুবি।"

সুতরাং শ্রবণা দ্বাদশী বিজয়া মহাদ্বাদশী হরিভক্তিবিলাস অনুসারে অভিন্ন।

৪। শ্রবণা দ্বাদশীরই অপর নাম শ্রবণা মহাদ্বাদশী।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫ বিলাসে শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে শ্রবণা দ্বাদশীর যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহারপ্রায় সকলগুলি প্রমাণবচনেই শ্রবণা দ্বাদশী "মহতী দ্বাদশী" বলা হইয়াছে। ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ও ২৫১ অঙ্কে এই শ্রবণা দ্বাদশী "মহতী দ্বাদশী" নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং "মহতী" এই বিশেষণ দ্বারাও এই দ্বাদশী যে "মহাদ্বাদশী" তাহা স্পষ্টতঃই সমর্থিত হয়। মহতী দ্বাদশী ও মহাদ্বাদশী একই কথা। ক্রমশঃ

শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ।

আমি কে ?

—:০:—

আমি সুখের আশায় ইতস্ততঃ ধাবিত হই সুখ সুখ করিয়া বেড়াই কিন্তু সুখের সন্ধানতো পাইনা, যাহাকে সুখ বলি তাহাতো নিয়ত দুঃখ ভোগই আনিয়া দিতেছে, অশন, বসন, শয়ন যাহা সুখের মনে করি তাহা দুঃখ প্রদান করে, রসাল মধুর ভোজ্য সংগ্রহ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিলাম, কৈ তাহাতে সুখ হইলনা, বরং দুঃখই বাড়িয়া গেল। অতি ভোজনের গুরু ভারে উদর স্ফীত হইয়া ব্যাধি আনয়ন করিল। যদি ব্যাধির হাত হইতে কোন রকমে মুক্ত হইলাম, তাহাতে আবার বুভুক্ষা, যে অতৃপ্তি সেই অতৃপ্তিই রহিয়া গেল, কিসে আমার হৃদয়ের নবোদ্ভূত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে, কিসে আমি শান্তি পাইব তাহা আমায় কে বলিয়া দিবে। আমার স্বরূপ কি? অস্থি মজ্জা চর্ম্মসংমিশ্রন জাত চৈতন্য বিশিষ্ট মনুষ্য নামধারী ("চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ এবাত্মা ইতি চার্ব্বাকঃ আমার স্বরূপের কি ইহাই চরম পরিণতি? এই সুন্দর সুশ্রী দেহ যাহাতে অশেষ সুখ ভোগের আশা করিয়া রাখিয়া শেষে দুঃখ ভোগ করিয়া যাইতেছি, ইহা ব্যতিরিক্ত আমার আর কিছু কি আছে? না ইহাই শেষ। যদি ইহাই শেষ হয়, যদি এই দেহের সুখই পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে সেই সুখ যায় কেন? যদি অর্থ ও কামনাই পুরুষার্থ হয় তাহাকে ইচ্ছা মত লাভ করিতে পারিনা কেন? আমি শত চেষ্টা করিয়াও যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছিনা, একজন তাহা বিনা আয়াসে লাভ করে কিরূপে, সেখানে আমার পুরুষকার অক্ষম হয় কেন? আমিত যথেষ্ট উদ্যম করিয়াছিলাম। যদি বল তুমি ক্ষুদ্র তোমার আবার পুরুষকার কি? রাজার প্রতি দেখ তিনিই এ পুরষকারের চরম লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অভিলষিত বিষয় ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সুখের সীমা নাই, কিন্তু কৈ আমি তাঁহাকে সুখী দেখিতেছিনা, তিনিতো তাঁহার সুখকে চিরদিন ভোগ করিতে পারিতেছেন না। হয়ত তাঁহাকে অতৃপ্ত ভোগ বাসনা লইয়া মরিতে হইতেছে, তিনি তাঁহার পুরস্কার তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহার অশেষ সুখরূপ ভোগের আধার শরীরকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার সুখকে পুরুষার্থ

বলি কি প্রকারে, যে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকে তুমি পুরুষার্থের নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, আমি চেষ্টা করিলেও ঐ দেহের চৈতন্য আনয়ন করিতে পারিনা কেন? আমার দেহের কোন বিকার নাই, দেহ যথাবৎ রহিয়াছে তথাপি উহার চৈতন্য চলিয়া গেল কেন। আমি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ কোন যষ্টির সাহায্যে একপদ নড়িতে হয়, কৈ আমারতো চৈতন্য নষ্ট হইলনা, আমি বৃদ্ধ আমার সে বাল্যকালের দেহ এখন নাই, কিন্তু সে দেহে আমি যাহা শিক্ষা করিয়া ছিলাম তাহা অবিকৃত রহিয়াছে কেন? তাহা হইলে এই নাশ-প্রবন-সুখের ভানে, দুঃখের আগার দেহকে আমি কি করিয়া আমার স্বরূপ বলি, যদি আমি, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে না পারিলাম যদি আমার সেই অতৃপ্তিই রহিয়া গেল, তাহা হইলে এদেহ ও দেহের সুখ কি করিয়া চরম পরিণতি হইতে পারে।

ক্রমশঃ—শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী।

চিত্র-পরিচয়।

(পুস্তকের প্রথম ভাগে চিত্র দ্রষ্টব্য)

—:•:—

কাঁহা করোঁ কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাঁহা মেরা প্রাণনাথ, মুরলী বদন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥

নয়নে ঝরিছে ধারা, বাহেন্দ্রিয়-জ্ঞানহারা,
চলিছে ছুটিয়া গোরা শান্তিপুর পথে।
পথেতে বালক যত, "হরি" ব'লে অবিরত,
নাচিয়া গাহিয়া যায় প্রভু সাথে সাথে॥

প্রভু বলে—তোরা কিগো গোপের কুমার?
বল্ বল্ বৃন্দাবন কত দূরে আর॥
তথা আছে প্রাণধন! পাব নাকি দরশন?
আর যে সহিতে নারি বিরহ বেদন॥

আকুল পরাণে, হায়, উঠে প'ড়ে ছুটে যায়,
পথ বা বিপথ কোথা নাহি তাহে মন।
কমণ্ডলু দণ্ড হাতে, শ্রীপাদ আছিল সাথে,
আগাইয়া বলে—"প্রভু! কর দরশন।
ওই বহে শ্রীযমুনা ঐ বৃন্দাবন"॥

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।

পরিণত হইয়াছে, কারণ এটি পৌরাণিক যুগ নয়গো --এটি হইতেছে তান্ত্রিকীযুগ। ছিন্দী ছিন্দী, ফট্ ফট্ যুগাধিষ্ঠাত্রী করাল বদনা দিগ্‌বসনা মানুষ রসনার মহাবিলাস বাসনাময়ী মহাশ্মশান বাসিনী ভীমা ভৈরবীর সর্ব্বকনিষ্ঠ আদুরে ছেলে শ্রীমান্ কলিযুগের পরমারাধ্য কোমলাকান্ত কৌলিকান্ত সঙ্গী কৌলীনযুগ। হায়! হরি!! কি অভূতপূর্ব্ব বিড়ম্বনা, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।" কেহ বৈদিক যুগের হিংসাময় যজ্ঞানুষ্ঠান, কেহ পৌরাণিক যুগের পরম হিংসাময় পূজানুষ্ঠান, আবার অনেকেই তান্ত্রিকী কুলাচার বা অকুলাচার ইত্যাদি পরম স্বেচ্ছাচারের মহামরু মাঝে মহামারী সমর সাজে সজ্জিভূত অথবা ছাগ, ভেঁড়ার প্রাণপাতে সর্ব্বদা অভিভূত।

পাঠকবৃন্দ! প্রকৃতই হউক অথবা পরবর্ত্তী কল্পনাই হউক শিববাক্যে এবং ব্যাস রচিত পুরাণাদি পুস্তক পাঠে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যজ্ঞ বা বিশেষ বিশেষ দেবতাদের পশু বধই অবধ তুল্য। কিন্তু এরূপ যজ্ঞ বা পূজা পরলোকে স্বর্গজনক হয়, অর্থাৎ বৈধহিংসা প্রভৃতি ভাবে সম্পাদিত হইলে যজমান স্বর্গ সুখ প্রাপ্ত হন বটে কিন্তু সে সুখ অচির শান্তিপ্রদ। যজ্ঞ সম্বন্ধে মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলেন যে,—

যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ॥৩২॥
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
পর্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ॥৩৩॥

ইতি কালিকাপুং ৩১শ অধ্যায় ৭।৮ শ্লোক।

অর্থাৎ যজ্ঞেই দেবগণ অবস্থান করেন, যজ্ঞ দ্বারাই সকলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যজ্ঞই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন এবং যজ্ঞই প্রজাদিগকে পাপমুক্ত করিতেছেন॥৩২॥ অন্নহেতু প্রাণি সকল প্রাণ ধারণ করিতেছে পর্জ্জন্য (মেঘ) হইতে সেই অন্ন উৎপন্ন হইতেছে এবং ঐ পর্জ্জন্যই আবার যজ্ঞ হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। অতএব জগত সমস্তই যজ্ঞময়॥৩৩॥

"মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রকারের প্রাণিকেই হিংসা (বিনাশ) করিবেনা, আমরা যথাশক্তি বেদ আলোচনা, কিম্বা শ্রীল রঘুনন্দনের তিথি তত্ত্বের (দুর্গোৎসব প্রকরণ) বৈধ হিংসা পরিচ্ছেদে ঐরূপ একটি বৈদিক সূত্র (শ্রুতি)

দেখিয়াছি। পরন্তু তদ্‌বিপরিত অর্থবোধক ২১টি শ্রুতিও যে দেখিতে না পাই তাহা নহে, যথা "বায়ব্যং শ্বেত ছাগল মালভেত" এবং "অগ্নিষ্টোমীয় পশুমালভেত" অর্থাৎ বায়ু দেবতার প্রীতির জন্য শ্বেত ছাগ বিনাশ করিবে আর অগ্নিষ্টোম নামক যজ্ঞে পশুবধ করিবে। এইরূপ অপর আর্য্য শাস্ত্র মহোদধি মন্থন করিতে মন মন্দরকে নামাইয়া দিলে, পদ্ধতি বা তন্ত্র পুরাণ এবং বৈদিক প্রভৃত্তি স্রোত মাঝে কেবল "মারয় মারয়" "ভেদয় ভেদয়" এবং "ছেদয় ছেদয়" ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক দেহ জগতের সদৈব তৃপ্তিকর "কদলীসার স্বর্গ" প্রাপ্তিকর বহু আশীর্ব্বচন লাভ করিয়া থাকি।

"কোন প্রকারের প্রাণিকেই হিংসা করিবে না" স্মার্ত্ত প্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইহাকে "সামান্যবিধি" এবং "বায়ব্যং শ্বেত ছাগল মালভেত' দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রুতিকে বিশেষ বিধি বলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ প্রথমটী অবৈধ হিংসা বলিয়া পরিত্যজ্য এবং দ্বিতীয় তৃতীয়কে বৈধ হিংসা বলিয়া স্বপিপ্য গ্রাহ্য বা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দুর্গোৎসব প্রকরণে অর্থাৎ তিথিতত্ত্ব নামক স্মৃতি সন্দর্ভে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কলিযুগ অশ্বমেধ গোমেধ অথবা নরমেধ প্রভৃতি হিংসা যজ্ঞের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও, হায়! ঠাকুর রঘুনন্দন! আপনি কোন্ বিবেকের বলে সেই পরিণাম পথ্যকর যথার্থ শান্তি সুখময় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বিগ্রহকে সামান্য উপলখণ্ডের ন্যায় বঙ্গসাগরের অগাধ লবণাম্বু মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গেলেন হায় রঘুনন্দন! আপনি কোন প্রাণে এই সুমহান মানব মণ্ডলীকে পারত্রিক অশান্তিপ্রদ জীব হিংসারূপ মহাযজ্ঞের অতি গভীর গ্রাসে উৎসর্গ করিয়া গেলেন? হায় ঠাকুর রঘুনন্দন! আপনি যে সদ্‌বিবেকের বলে বৈধ হিংসারূপ কলিমানবের মহা অবৈধ অমঙ্গলের আমলিবৃক্ষ বঙ্গবাসীর প্রত্যেক গৃহ প্রাঙ্গনে রোপন করিয়া গিয়াছেন, শুনিতে চাই ঠাকুর! যে জ্ঞান বা বিবেকের সাহায্যে আপনি ছাগ বলি মেষ বলিরূপ "সৌদামিনীস্বর্গ" হাতে দিয়া জ্ঞান কাঙ্গাল বাঙ্গালীকে ভুলাইয়া গেলেন, বলুন দেখি ঠাকুর! আপনি সেই হিংসা ব্রত প্রতিষ্ঠার ফলে সপ্ত স্বর্গের কোন শান্তি স্বর্গে এতাধিক পঞ্চশত শতাব্দি অধিবাস করিতে সমর্থ হইলেন অথবা ভবদীয় সেই "সৌদামিনীর স্বভাব স্বর্গ" আর কতদিন ভোগ্য হইবে ঠাকুর? "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।" এই প্রমাণকে যে অর্থে অর্থান্তর ঘটাইয়া স্মার্ত্ত প্রবর রঘুনন্দন, আমাদের বঙ্গবাসীর প্রত্যেকের

করে জীব হিংসার ভীষণ করবাল তুলিয়া দিয়াছেন, পাঠকগণ! প্রমাণের যথার্থ অর্থে উপনীত হইলে প্রত্যেক ধমনীর শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া এক কালীন হইয়া পড়ে। যেহেতু যজ্ঞ শব্দের মুখ্যার্থ "সঙ্কল্প বা কামনা বিহীন হইয়া ভগবদ্ বিষ্ণু উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম সম্পাদন করা, যজ্ঞ অর্থে সাক্ষাদ্ বিষ্ণুকেই উপলব্ধি করিয়া থাকে। ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোকের গুহ্য ভাবই যজ্ঞ, অর্থাৎ "যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে দাম্ভিকতা নাই কামনার লেশ মাত্র নাই এবং যে কর্ম্মের শুভফল ভগবান্ শ্রীহরিতে অর্পিত তাহাই যজ্ঞ। যে যজ্ঞের কর্ম্মভূমি সুদুর্লভ মানব জন্মের উদ্দেশ্য, যে যজ্ঞের যজমান মানবের সদ্বিবেক, যে যজ্ঞের পুরোহিত নিষ্কাম পরতা, যে যজ্ঞের পশু মানবের জীবাত্মা;—অসি সংপ্রবৃত্তি, হাড়ীকাঠ তত্ত্বজ্ঞান এবং কামনা পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি, পাঠকভ্রাতা! তাহাই যথার্থ যজ্ঞ।" ফলে এবম্প্রকার যে, পরম যজ্ঞ, তাহাই মানবের আত্যন্তিকী সংসার বন্ধনের ছেত্তা এবং পরমা শান্তি মুক্তি প্রদাতা রজো ভাবাপন্ন মানবের ইপ্সিত যজ্ঞানুষ্ঠান, অশ্বমেধ বা নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞতো উপস্থিত কলিযুগে (পুরাণ প্রমাণে বা ঋষিবাক্যে) নিষিদ্ধ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। ঐ রাজসি যজ্ঞ একদিন ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন কালে অবশ্যই যে ছিল তাহাতো আমরা মহাভারতাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থপাঠেই জানিতে সমর্থ হইয়াছি। পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞ জনমেজয়ের অশ্বমেধের বিষয় আমরা পুরাণ প্রসঙ্গ এবং মহাভারত পাঠে জ্ঞাত আছি। সেরূপ যজ্ঞ দূরে থাক্ তদপেক্ষা অতীব ক্ষীণ যজ্ঞও যে এখন আর্য্যবর্ত্তে আছে এরূপ মনে করাও বাতুলতা, আমাদের এই বঙ্গদেশতো সর্ব্বথাই যজ্ঞ বিহীন নীচ প্রদেশ। স্মার্ত্তাচার্য্যরঘুনন্দনের মতে ছাগ মহিষাদি প্রাণান্তকর তুর্ব্বল রাজসিক শক্ত্যর্চ্চনই এখন এদেশে বৈদিক যজ্ঞের স্থানটী অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পাঠকগণ! এবম্বিধ শক্তি অর্চ্চনরূপ পূজা যজ্ঞ জীবন্ত পশুর প্রাণান্ত করিয়া অবধ তুল্য সফল প্রদান করিতে শক্তিমান্ বঙ্গীয় পূজক বিপ্র বা পুরোহিত ঠাকুর যে এই বঙ্গমাতার অধমাঙ্গেও আছেন আমার হয়তো মনেই তাহা স্থান পাইতেছেনা। কারণ বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ বঙ্গীয় পুরোহিত, বেদ, অগ্নি এবং ব্রাহ্মণোচিত সদাচার সদনুষ্ঠান বিবর্জ্জিত। ইঁহারা সর্ব্বথা ব্রাহ্মণত্বেরই প্রতিকুল সর্ব্বদা অনুচিতভাবে উদরান্ন সংস্থানে ব্যতিব্যস্ত, মসীবৃত্তিতে লালায়িত অথবা দাসত্বের দাস গ্রন্থিতে সুদৃঢ় বন্দী কৃত।

ইঁহারা তন্ত্রাদি শাস্ত্র কথিত প্রাণায়াম ও ভূত শুদ্ধি প্রভৃতি দৈনন্দিন অনুষ্ঠানিক যোগ কর্ম্মের অনোপযুক্ত। "হৃৎপদ্মমাসনংদদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতাদি অন্তর্যাগ বা মানসিক পূজা দ্বারা মহামায়ার অর্চনা এখন কেবল মহাদেবের শ্রীমুখ বিনির্গত ঐ শ্লোক কয়েকটির আবৃত্তি বা অস্ফুট উচ্চারণেই যথেষ্টতা লাভ করিতেছে। বলিলে বাঙ্গালী পুরোহিত পুঙ্গবেরা রাগিয়া হয়তো আমাকে এককালীন বাপান্ত জেঠান্ত করিয়া ছাড়িবেন। যেহেতু আমার বিশেষ প্রকারই জানা আছে যে, বিশুদ্ধ "একরূপ" চণ্ডীপড়ার ব্রাহ্মণই দশবিশ গ্রাম খুঁজিলে পাওয়া যায়না কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ এখন ক্রমেই বঙ্গমাতার অঙ্গছাড়া হইয়া পড়িতেছে। এরূপ হইলেও তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ অবজ্ঞা করিতেছি। চণ্ডীপাঠে "অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অবশ্যনিষিদ্ধ" এইবোধ অনেক পাঠকেরই নাই, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি পরের মুখে শুনা কথা বলিতেছিনা। পাঠক ভ্রাতাগণ! অপনারা জিজ্ঞাসা করিলে বা একটু অনু-সন্ধিৎসু হইলেই এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারি। পুরোহিত বিপ্রবর্গের অধিকাংশের ইহাতে অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া আমি রহস্য করিতেছি না, ব্যঙ্গ করিতেছিনা অতিদুঃখে মজিয়া আর অতি ক্ষোভে পচিয়া ধসিয়াই হায়! এরূপ পাপের কথা পাপমুখে বলিতে বাধ্য হইয়াছি।* পরিশেষে পাঠক ভ্রাতাদিগের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বাঙ্গালী পুরোহিত বিপ্র মণ্ডলি মধ্যে চণ্ডীর বিশুদ্ধ পাঠানুষ্ঠানকারী অভিজ্ঞ

---

* চণ্ডীর পাঠানুষ্ঠান সম্বন্ধে "শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠরহস্যম্" নামকরণে একখানা ছোট পুস্তকের প্রথম কাপি সংগ্রহ মাত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। এদুর্ভাগা মূর্খের সময়াভাবে এপর্য্যন্ত। (৮১৫ মাস) তাহার আর দ্বিতীয় কাপি বা "বিশুদ্ধলিপী" হইয়া উঠেনাই। তার পর অর্থাভাবে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করা, সে এক অনিবার্য্য বিপত্তি বটে। চণ্ডীপাঠের সাধারণতঃ যে কয়েকটি নিষেধ আছে তাহাও আমাদের অনেক বাঙ্গালী ব্রহ্মাণেরা জানেন না। "ইতিশব্দ উচ্চারণে লক্ষ্মীনাশ, বধশব্দে বংশক্ষয় এবং অধ্যায় শব্দোচ্চারণে যজমানের প্রাণ বিনাশ হইয়া থাকে।" বলুন দেখি এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরোহিত বিপ্র বঙ্গদেশে শতকরা কয়টি মিলে?

ব্যক্তি থাকিলেও তাহার সংখ্যা আবার এতই অল্প যে শতকরার কথা না বলিয়া হাজার করা ২।৩ টির বেশী হইতেই পারিবেনা। অধিক আর কি বলিব বর্ত্তমান সময় বেশীর ভাগ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই খাদ্যাখাদ্যের হিসাব কেতাবের কোনই ধার ধারেন না। "প্রতিপদে অর্থহানি কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে" ইত্যাদি দৈনিক খাদ্যাখাদ্যের ধার ব্রাহ্মণেরাই ধারেন না আর অপর জাতির কথা বলাতো বাতুলতা মাত্র। হায়! ব্রাহ্মণোচিত সদাচারের বিষয় এখনকার ব্রাহ্মণেরা একবার স্মরণও করেন না, সন্ধ্যা দেবীকে ব্রাহ্মণেরা বন্ধ্যা গাভী মনে করিয়া কসাই খানায় বিক্রয় করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন এবং ব্রহ্মণ্যদেবের প্রীতির জন্য বেদাক্ষরের প্রতি ক্ষণেকও নয়নতারা নিক্ষেপ করিতেছেন কিনা পাঠক ভায়ারা তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন। ব্রহ্মার গুণবান পুত্র ভগবান স্বয়ম্ভুব মনুর বংশধর ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে দেবী মহামায়ার চরণে এখন বর মাগিয়া থাকেন। ভ্রাতাগণ! ইহাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা, ইহাপেক্ষা শোকাবহ অশুভ কার্য্য এবং ইহাপেক্ষা পাশবিক অধঃপাত আর কি হইতে পারে? ধন্য কাল চক্রের অত্যাশ্চার্য্য অসীম অবনতি মুখে পরিবর্ত্তন!!

বন্ধ্যাগাভী, ক্ষারভূমি, সলিল সম্বন্ধ ব্যতীত সরোবর অথবা ফলচ্ছায়া বর্জ্জিত বনস্পতিকে যেমন কেহই আদর করিতে চায়না ইহারা যেমন সকলেরই উপেক্ষণীয়, দাসব্যবসায়ী যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি বিহীন (শূদ্রাচার যুক্ত) ব্রাহ্মণও দৈবাদি ক্রিয়ার তেমনি অথবা ততোধিক উপেক্ষণীয় কিংবা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। বলিতেকি দাসত্বজীবি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণত্ব হইতে সুবঞ্চিত সুতরাং ব্রহ্মতেজ বিবর্জ্জিত। শাস্ত্রকার ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, এইরূপ নিকৃষ্ট অথবা পতিত ব্রাহ্মণ (চাকুরীজীবি, চিকিৎসা ব্যবসায়ী ইত্যাদি) দ্বারা অনুষ্ঠিত দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং পুরাণাদি পাঠ অধিকন্তু দীক্ষাদান প্রভৃতি সংকার্য্য কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা কখনই সুফল প্রদ হইতে পারেনা।

কলিকালের ব্রাহ্মণ দিগের দেবপূজা অর্থাৎ পৌরহিত্য কার্য্য অতীব বিস্ময়কর বা অলৌকিক ব্যাপারই বটে। আমি এতৎ সম্বন্ধে সূত ঋষির বাক্য যতদূর জানিতে পারিয়াছি অথবা বহুশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি পাঠক ভায়াদের অবগতির জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও

উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না একপ কথা পাড়িতে ক্ষোভ, দুঃখ এবং লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। কারণ আমরা ভূদেব ব্রাহ্মণের পবিত্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এখন যে নীচশূদ্র অবস্থায় পলিয়া যাইতেছি। হায়! আমাদের ব্রাহ্মণ জাতির পরিণাম আরও যে কিরূপ অপকৃষ্ট হইবে তাহা বর্তমান অবস্থা ঘটিত ব্যপারে কিছুই নির্ণয় করা যায় না। বিষয়টি এতই আশঙ্কা জনক যে চিন্তা করিতে গেলে ধমনীর শোণিত প্রবাহ এক কালীন স্তম্ভিত বা বিকৃত হইয়া পড়ে। হায়! যে ব্রাহ্মণ জাতি একদিন ইন্দ্রাদি দেবতা গণের উপর আধিপত্য বা প্রভুত্ব করিতেন যে ব্রাহ্মণ জাতিকে ভগবান নারায়ণ একদিন স্বীয়তনু বলিয়া আনন্দিত হইতেন, যে ব্রাহ্মণ জাতীয় মনস্বী ভৃগুমুনির পদাঘাতকে পতিতপাবন বৈকুণ্ঠ নায়ক শ্রীহরি একদিন পরমানন্দময় বক্ষ ভূষণ বলিয়া স্বীকার করিয়া ছিলেন এবং যে ব্রাহ্মণ জাতির পবিত্রতা ব্যঞ্জক "শতপথ ব্রাহ্মণ" একদিন সনাতন বেদ সংহিতায় পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া ছিল; হায়, আজকিনা সেই ব্রাহ্মণ জাতি অন্ত্যজ জাতিনিচয়েরও নিতান্ত উপেক্ষণীয় হইয়া যাইতেছে। পাঠক! ইহাপেক্ষা আমাদের আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? কারিকদণ্ড বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ জাতি আজ সাধারণ অসভ্য বর্ব্বরেরন্যায় রাজদ্বারে দণ্ডার্হ! তাই অতি দুঃখে বলিতেছিলাম আমাদের কলিকালের ব্রাহ্মণদিগের এতৎপর কি উপায় হইবে! ভগবান শ্রী শ্রী কল্কি দেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, শুনিয়া সকলে স্ব স্ব অবস্থার জন্য সাবধান হইবেন বলিয়া আশা করিতেছি।

তথাহি (কল্কি পুং ৩য়াংশে ১৬।৩ শ্লোঃ);—

"নানা দেবাদি লিঙ্গেষু ভূষণৈ র্ভূষিতেষু চ।
ইন্দ্রজালিকবদ্ বৃত্তি কল্পকাঃ পূজকাজনাঃ ॥৪৪॥"

অর্থাৎ পূজক ব্রাহ্মণেরা নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত (রাংরাংতাদি দ্বারা অলঙ্কৃত) দেব বিগ্রহ সমূহে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন ॥৪৪॥

পাঠকগণ! ঐ শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে অর্থাৎ পৌরাণিক কালের ধারাবাহিক গণনামতে উল্লেখিত ঘটনার সময় এখনই উপস্থিত অথবা উক্ত ঘটনা বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। "ডাকের সাজ" বা রাং রাংতার

অলঙ্কারের বাহুল্য ব্যবহার, দুর্গোৎসবাদি পূজা অর্চ্চনায় আত্যান্তিক অধম রাজসিক আয়োজন এখন বহু বৎসর যাবতই বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে। যজমানেরা মাকে ডাকের গহণায় সাজাইয়া সং দেখিতে যেরূপ আনন্দ পায়, পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও আনন্দের সহিত ঐরূপ রাং রাংতার সাজে সুসজ্জিতা মৃন্ময়ীমার প্রতি মূর্ত্তির ধ্যান এবং মহারাজোপচারে পূজা করিয়া চারিতার্থ হন্। কোনও ঠাকুর মহাশয়ইতো ওরূপ অবৈধ কার্য্যকে পরিত্যাগ করেননা বা পরিত্যাগ করিবার আংশিক ভাবও কাহার হৃদয়ে জাগেনাই। মাঝে কয়েক দিন একটা অন্তঃসার বিহীন হুজুগে নাচিয়া কোন যজমান বা ২।১ জন পুরোহিত ঠাকুর একটু চেষ্টা করিয়া ছিলেন নয়কি?

প্রাচীন শাস্ত্র সংহিতাদি পাঠে আমরা জানিতে পারিয়াছি ব্রহ্মত্বের সম্পূর্ণ বোধশূন্য ঈদৃশ চিহ্নধারি ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বজাতি বা হিন্দুনামধারী জাতি মাত্রের নিকট কেবল জীবিকা অর্থাৎ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সামান্য ভোজ্য এবং অর্থ ভিক্ষা পাইবার অধিকারী মাত্র। এইরূপ অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজনাদি বৈদিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনোপযুক্ত। শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ বা ঋষিগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ জাতি উত্তম অধম যেরূপই হউকনা কেন জাতীয় মহামর্য্যাদার অনুরোধে "দুস্থ ব্রাহ্মণেরা" ব্রাহ্মণ বা তদিতর সঙ্গতি সম্পন্ন সকল জাতিরই প্রতিপাল্য বা পূজনীয়।

তথাহি (পং পুঃ ক্রিয়া যোসারে ২০ শতি অধ্যায়ে);—

সর্ব্বেঽপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠ পূজনীয়া সদৈবহি।
অবিদ্যা বা সবিদ্যা বা নাত্র কার্য্য বিচারণা॥৩৫॥
অনাচারা দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ নচ শূদ্রা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
অভক্ষ্যভক্ষকা গাবঃ কোলাঃ সুমতয়োন চ॥৩৬॥

(হরি শর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মার উক্তি) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাদের কি মূর্খ আর কি পণ্ডিত সকলেই পূজনীয়। সেহেতু অভক্ষ্য ভক্ষণ কারী গোগণ পূজনীয় এবং আদরণীয় কিন্তু শূকর সৎস্বভাব সম্পন্ন হইলেও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এজন্য আচারহীন ব্রাহ্মণও পূজনীয় কিন্তু জিতেন্দ্রিয় শূদ্র কখনই বর্ণসমূহের পূজনীয় হইতে পারেনা॥৩৫॥৩৬॥ মুনি সত্তম জাবালিকে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে,—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ব বর্ণানাং গুরুঃ শিষ্যাঃ পরেমতাঃ ॥৪৭॥

(বৃহদ্ধর্ম্ম পুঃ উঃ খং ১ম অং ৪৬শ্লোকার্দ্ধম্,)

ব্রাহ্মণই বর্ণ সমূহের (সর্ব্ব জাতির) গুরু বলিয়া কথিত এবং ক্ষত্রিয়াদি সকল জাতি তাঁহার শিষ্য তুল্য ॥৪৭॥ রাজা মান্ধাতার প্রতি নারদঋষি বলিতেছেন ;—

ব্রাহ্মণান্ ন পরীক্ষেরন্ নান্যবর্ণা স্তথানৃপ।

দৈবে কর্ম্মণি পিত্রে চ ন্যায্যমাহুঃ পরীক্ষণম্ ॥৪৮॥ (পদ্মপুরাণম্) ॥

অন্যান্য অপর জাতিগণ কখনও ব্রাহ্মণদিগের দোষ গুণের বিচার করিবেন না, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতি মাত্রেই অবিচার্য্য ভাবে পণ্ডিত কি মূর্খ সকল ব্রাহ্মণকেই প্রণাম করিবে, সম্মান দিবে এবং ভোজ্য, বস্ত্র ও দক্ষিণাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিবে। কিন্তু বেদবিহিত পিতৃকার্য্য কি দেবার্চ্চণাদিতে ব্রাহ্মণের ভালমন্দ বিচার পূর্ব্বক জ্ঞানী ও ক্রীয়াশীল সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই নিয়োগ করিবে ॥ ৮॥

ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞানী পাঠকবর্গের বুঝিতে কিছুই কষ্ট নাই, তবে সাধারণের জন্য বলিতে হইল ; সদাচার ও বেদবিহিত ক্রিয়ানভিজ্ঞ নিস্তেজ অপাঙ্‌ক্তেয় হীন ব্রাহ্মণের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবার্চ্চনা বা চণ্ডীপাঠাদি সদনুষ্ঠান করিলে তাহাতে অভীষ্ট ফলের পরিবর্ত্তে অনিষ্টোৎপত্তিই হইয়া থাকে। অধিকন্তু অর্থগুলির অপব্যবহার বা অপব্যয় করিয়া জগতের অপকারই মাত্র করা হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম্মণা ব্রাহ্মণোজাতঃ করোতি ব্রহ্ম ভাবনম্।

স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৪৯॥

(ব্রং গনেশ খণ্ড ৩৫। ৬৯)—

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম কৃত বহু তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করত স্বধর্ম্ম পরায়নতা ও সদাচার দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন বলিয়াই ইহাঁরা ব্রাহ্মণ নামে কথিত বা পরিচিত হন ॥৪৯॥

তথাহি (কল্কিপুঃ ১মাংশ২।৪২—৪৩ শ্লোং)—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাদ্ যাতো গর্ভাধানাদি সংস্কৃতঃ।

সন্ধ্যাত্রয়েণ সাবিত্রী পূজা জপ পরায়ণঃ ॥৫০॥

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি

ভক্তি।

১১শ বর্ষ | আশ্বিন মাস। ১৩১৯ সাল | ২য় সংখ্যা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

"নাহংযাচে তবপদকমলে নির্ব্বৃতিং মোক্ষসংজ্ঞাং
নাহংযাচে তবপদকমলে লৌকিকীং সুপ্রতিষ্ঠাম্।
নাহংযাচে ধনজনসুতাগার, দেহাদিবিত্তং
যাচেনিত্যং তবপদকমলে ভক্তিমেকান্তনিষ্ঠাম্" ॥

প্রভো! তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার নির্ব্বাণ মোক্ষের কিম্বা লৌকিক প্রতিষ্ঠার অথবা অনিত্য ধন জন দেহ গেহাদির সুখ প্রার্থনা নাই, কেবল এই প্রার্থনা যে, যে সুধা পান করিলে দুর্জ্জয় ভবক্ষুধা চিরদিনের জন্য নিবৃত্তি হইয়া যায় সেই ভক্তি সুধা পান করিবার শক্তি দাও। দয়াকরিয়া আমার মানস মধুপকে তোমার শ্রীচরণপদ্মে ঐকান্তিক ভাবে নিয়োজিত করিয়া রাখ ইহাই প্রার্থনা।

বাঞ্ছাকল্পতরু! সর্ব্বদাই, প্রত্যেককার্য্যে যখন তোমার পূর্ণানন্দময় মঙ্গল সত্বা বিশেষ ভাবে অনুভব হইতেছে, সর্ব্বদাই যখন দেখিতে পাইতেছি যে,

তোমাতে অকপট ভাবে নির্ভর করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তোমার কৃপাশক্তি অলক্ষিত ভাবে আসিয়া অমানুষিক শক্তিতে সেই কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়া দেয়, যখন দেখি মনে মনে কোন বিষয়ের কল্পনা করিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও অন্তর্য্যামী তুমি অন্তরের ভাব বুঝিয়া ভাবনানুযায়ী কার্য্যের শুভাশুভ, বুদ্ধিরূপশক্তি প্রদান করিয়া বুঝাইয়া দাও, যখন আরও দেখিতে পাওয়াযায় যে, অভিমান শূন্য হইয়া যাহা কিছু করিতে যাই আমার নিজ সাধ্যের অতীত হইলেও তোমার শক্তি বলে অনায়াসেই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া যায়, তখন আর না বলিয়া থাকিতে পারিনা যে তুমি মঙ্গল-স্বরূপ, তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তুমি সকল কার্য্যের সাক্ষী এবং তুমিই জীবের একমাত্র আশ্রয়দাতা বাঞ্ছাকল্পতরু। যখন এইভাব ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে উদয় হয় তখন সংসারের কোন প্রকার অশান্তি বা কোনরূপ অভাব যাতনা আমাকে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু প্রভো! অঘটন-ঘটন-পটিয়সী তোমার মায়ার এমনই প্রভাব যে ভাব লাভ করিয়া স্থির হইতে না হইতেই সে শান্তিময় ভাব কোথায় চলিয়া যায়, কিছুই বুঝিতে পারিনা। অনেক প্রার্থনা করিয়াছি আর চাহিবার কিছু নাই, তুমি মঙ্গলময় এক্ষণে যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, যাহাতে আমার সুখ শান্তি হয়, যাহাতে আমি সকল প্রকার সমুন্নতি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি তদনুযায়ী ভাব ও বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়া তোমার দীনবন্ধু নামের সার্থকতা বুঝাইয়া দাও, পরীক্ষা করিয়া দেখ আমার মতন দীন ত্রিভুবনে আর মিলিবে না।

সকল বিষয়েতেই তুমি অনন্ত শক্তিশালী, তোমার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার শান্তিসুখ বিধাতা, জীবের পরম হিতৈষী ইহপরকালের প্রকৃত বন্ধু আর কেহই নাই। তোমাকে অধিক বলিবার কিছু নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। মুখে বলিব না বলিলেও হৃদয়ের উদ্বেল তরঙ্গ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কতকি বলিয়া ফেলি, তুমি হৃদয়বল্লভ হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া যাহা হয় কর। কেবল এইটী প্রার্থনা যে, যখন যেখানে যে অবস্থাতেই রাখনা কেন, ধনজন গৃহাদিতে আশক্ত করাইয়া ভোগ্য বস্তুর সংযোগ বিয়োগ ঘটাইয়া যে ভাবেই রাখনা কেন যেন তোমাকে না ভুলি, যেন সকল অবস্থাই তোমার মঙ্গলময় বিধান বলিয়া অকপট প্রাণে তোমার ভালবাসা স্বীকার করিয়া লইতে পারি। তুমি যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর,

তুমি যে জগতের একমাত্র কর্ত্তা, তুমি যে আমার আরাধ্য বস্তু, সুখদুঃখ, লাভ অলাভ সকল অবস্থাই যে আমার জীবনের উন্নতির জন্য তোমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতেছে, ইহা যেন বেশ বুঝিতে পারি, অকপটে ভাবুক কবির সহিত সমস্বরে যেন বলিতে পারি, "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী" আজ দীনহীনের এইটী প্রার্থনা।

দীনহীন—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অভিনন্দন।

—:০:—

আজি গো তোমার জনম-বাসরে
গাহিবে কি শুভ-গান?
কোথাকার কোন্ দিব্য-বীণার
তুলিবে মেদুর-মধু-ঝঙ্কার?—
ভাসাবে শুনা'য়ে সে সুখ-নান্দী
নন্দন-কোটী-প্রাণ?—
(তখন) মরতে ছুটায়ে মন্দার-মঞ্জু
উঠিবে সে মধু-তান।

(২)

(আজি) খুলে গেছে দেবি! তব আহ্বানে
ভক্তের হৃদি দ্বার।
কত দিবসের কত সাধনায়
কত কথা ব'লে জাগায়েছ যায়,—
মঙ্গলময়ি! নন্দন-শিরে
ঢাল' মা আশীষ ধার!

* প্রবন্ধটী বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় ভাদ্রমাসে প্রকাশের অসুবিধা হইয়াছে ত্রুটী মার্জ্জনীয় "ভক্তি" সং।

(আর) হৃদয়-সাগর উছলি' উঠুক্
সুধাতে অনিবার !

(৩)

(আজ) ভাদরে বাদরে কূলে-কূলে ঢেউ
ভেঙ্গেছে নদীর বাঁধ।

আজি যে মা তোর মিটেছে গো সাধ,—
ক্ষমিতে জীবের সব অপরাধ—
নব্দ নিলয়ে "নদীয়া-ইন্দু"
সেজেছে "ব্রজের-চাঁদ!"

(তাই) অলখে ঝরিছে শতেক শীর্ষে
গোলোক-আশীর্ব্বাদ।

(৪)

নাহি আজি আর কলহ-বিবাদ
সব ক'রে দে'ছ দূর।

আজি সে মিলন ভ্রাতায় ভ্রাতায়
হে দেবি "ভক্তি"! তোমারি কৃপায়!

সার্থক আজ সাধনা তোমার—
সঙ্গীত সুমধুর।

আজি মা সে সুরে ভ্রান্তি বিষাদ
ভেঙ্গে ক'রে দে'ছে চূর্ণ।

(৫)

এস এস দেবি! ও চরণ সেবি'
ধন্য হ'ব গো আজ।

গা'ব দেশে-দেশে তব জয়-গান,—
জীবনে মরণে দিব 'মোরে' দান!
এস দেবি!—থাক চির-বিরাজিত
এ মম হৃদয়-মাঝ!

তুমি এলে হেথা—হৃদয়-রাজ্যে
আসিবে 'রাজাধিরাজ'।

(৬)

আজি গো তোমার নবীন জনম
জীবনে নবীন দিন;—
নবীন বরষে—নবীন আশায়—
নবীন হরষে—নবীন ভাষায়—
নবীন রাগিণী শুনাও—শুনাও,
হও মা হৃদয়াসীন!
(যেন) গৌর চরণ-মধু-লোভে মন
মধুপ রহে মা লীন!

শ্রীগোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

৫

লোক সমাজে

কোন ব্যক্তির জীবন চরিত লিখিতে গেলে তিনি, কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম পরিচালিত হইত, তিনি কেমন করিয়া লোকের নিকট মর্য্যাদা লাভ করিলেন এই সকল বাহ্যিক ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করাই অনেকের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। সে সকল বর্ণনায় যাহাতে একটুও ছাড় না যায় তজ্জন্য নানাভাবে তথ্য সংগ্রহের আয়োজন-উদ্যোগ হইয়া থাকে। সংবাদ

পত্রে বা মাসিক পত্রে সেই সকল কথা বহু আড়ম্বরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই জীবন-চরিতে, জীবনের পরিচয় বা কতটুকু পাওয়া যায় আর চরিত্র বিকাশই বা কতদূর পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায়, তাহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। যাঁহারা জীবন চরিত বর্ণনার ও পাঠের উদ্দেশ্য কি, ইহা ধীরভাবে আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই প্রশ্নটি স্বতঃই আসিতে পারে। আমরা দেখি, জগতে যে সকল ব্যক্তি সাহিত্যিক, ধর্ম্ম প্রচারক বা সাধকরূপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, অথবা অন্য কোন ঘটনায় দেশমান্য ও লোকপূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবনী কথা রচিত ও প্রচারিত হয়। ঐ সকল ব্যক্তির কেবল জয়ঘোষণা করিলে, বা তাঁহারা যাহা ছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও বড় আকারে তাঁহাদিগকে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইলে, সমাজের যে বিশেষ কোন মঙ্গলকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা মনে হয় না। সেই ব্যক্তির স্তাবক বা ভক্তগণ তাহাতে মোহিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু সে জীবন চরিত পাঠ করিয়া অপর সাধারণ কি শিক্ষা লাভ করিবে? তাহারা না হয় তাঁহাকে একজন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে বা সকৌতুকে তাঁহার কথা আলোচনা করিবে।

জীবন-চরিত পাঠ বা রচনার উদ্দেশ্য অন্যরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়। যে সকল ব্যক্তি জগতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কোথায় তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন, মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও গন্তব্য পথের সংবাদ বলিয়া দিয়া, সকলের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হয়েন, মানুষ যে আনন্দের অধিকারী, জগৎ যে আনন্দময়, জীবনে যে সেই আনন্দ প্রতিক্ষণে অনুভব করা যায়, ইহা স্বীয় আচারের দ্বারা, ভাবের দ্বারা, চিন্তাদ্বারা প্রকাশ করিয়া জন-সমাজে একটা উন্নত জীবনের চিত্র আঁকিয়া দেন—সেই সকল মহাপুরুষগণ একএকটি শক্তি-কেন্দ্র। তাঁহাদের আবির্ভাব কালে যে শক্তি সঞ্চার করেন, যে ভাব বিস্তার করেন, তাঁহাদের তিরোধানের পরে, পরবর্ত্তী কালের লোক সমাজে যাহাতে সেইটুকু জাগ্রত থাকে, তজ্জন্য সেই সকল মহাপুরুষের জীবনী লেখার একটা আবশ্যকতা আছে। আর, দ্বিতীয়ত সেই জীবনী পাঠ করিয়া লোকে যাহাতে আত্ম জীবন গঠিত করিতে পারে, যাহাতে জগতে মানব জন্ম লাভ করিয়া, মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দান করিতে পারে, যাহাতে আনন্দ ধামের পথে অগ্রসর হইয়া, আপনাকে ও আপনার পরিচিত বা অপরিচিত দশজনকে ধন্য করিতে পারে,—সেই ভাবে জীবন চরিত রচিত হওয়া উচিত।

সুতরাং সাধক, ভক্ত বা মহাপুরুষদিগের জীবনী প্রসঙ্গে, কেবল হৃদয়ের পরিচয় টুকু দেওয়া উচিত, ও কি ভাবে তাহা কোথায় কেমনে বিকাশিত হইয়াছিল তাহাই দেখান কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে যদি সাংসারিক কথা আসিয়া পড়ে তবে ততটুকু পরিমাণে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত, যতটুকু পাঠ করিলে, পাঠকের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠে। জীবনী পাঠ করিতে করিতে যে ভাবটিতে তাহার মর্ম্মের তন্ত্রীতে আঘাত লাগিল ও একটা ঝঙ্কার উথিত হইল সেই ভাবটি লইয়া সে তখন তোলা-পাড়া করিতে থাকিবে, তাহার প্রাণের আবেগ বৃদ্ধি পাইবে, সে তাহাতে মজিয়া যাইবে।

নিত্যধাম গত পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধুর জীবনী-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যথাযথ ভাবে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাইতেছি। সেই জন্য, তাঁহার সাংসারিক জীবনের ঘটনাগুলির সকল বিবরণ প্রকাশ করি নাই কেবল যে সকল কথা আলোচনা করিলে, জনসাধারণের মধ্যে উন্নত-জীবনের আদর্শটুকু ফুটিয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি মাত্র। ইহাতে ঐতিহাসিক সন, তারিখ বা ঘটনা বিবৃতির ত্রুটি হইতে পারে কিন্তু ভাব উদ্দীপনা ও বিকাশের ব্যাঘাত হইবেনা বলিয়াই মনে হয়।

পরিচারকের সঙ্গে দীনবন্ধু যখন সেই ভদ্রলোকের বাটীতে গমন করিলেন, তখন তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয়! আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাকে যে জন্য আহ্বান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। আমার পুত্রটির সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর অর্পণ করিলাম। ছেলেটির জন্য অন্যান্য অনেক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু উহার স্বভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। এই বাল্য কালে যদি ইহার চরিত্র গঠিত না হয়, তাহা হইলে আর কবে হইবে? দুঃখের বিষয় এদেশে পুঁথিগত বিদ্যাবান্ শিক্ষক অনেক পাওয়া যায়, তাঁহারা ছাত্রদিগকে মুখস্থ বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু শিক্ষকের চরিত্র যদি উন্নত না হয় তবে ছাত্রের চরিত্র উন্নত হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ বালকদিগের জন্য উন্নত চরিত্রবান্ শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য আমার বালকের ভার আপনার উপর অর্পণ করিলাম।"

পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এখানে এটুকু বলিয়া রাখা উচিত যে তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষার ফলে সেই ছাত্রের চরিত্র অতি

আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ছিল। যাহা হউক দীনবন্ধু লোক সমাজে শিক্ষক রূপে এই প্রথম দেখা দিলেন। ক্রমে তাঁহার পরিচয় ও চরিত্রের কথা ভবানীপুরের শিক্ষিত জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিয়া প্রীত হইতেন। ইংরাজী বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রগণ, আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য, দার্শনিক তত্ত্বগুলি জানিবার জন্য অনেক সময় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু উপযুক্ত লোক পান না বলিয়া বা সাধন-ভজন জ্ঞানহীন পণ্ডিতের জটিল ব্যাখ্যার ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়া, অনেক সময় হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। কিন্তু দীনবন্ধুর নিকটে আসিয়া তাহাদের সে অভাব পরিপূর্ণ হইতেছে দেখিয়া তাহারা প্রীতির আকর্ষণে তাঁহার নিকট আসিতেন। এইরূপে সমাজে একটা প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞান আলোচনায় দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারে, দীনবন্ধু কদাচ কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেমন উদার, হিন্দু শাস্ত্র যেমন উদার, তেমনি উদার ভাবে জ্ঞান পিপাসুকে জ্ঞান বিতরণ করিতেন। শুনিয়াছি বর্ত্তমান হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, এম এ বি এল, স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তাঁহার নিকটে বেদান্ততত্ত্ব, আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন।

এই সময় দীনবন্ধু, তাঁহার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ভবানীপুরের অভয় চরণ সরকারের লেনে, কোন বাটিতে বাস করিতে ছিলেন। বালক, যুবক ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া যাহা বুঝিতে পারিলেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি দেখিলেন, বঙ্গীয় সমাজে ধর্ম্ম জীবনের অবস্থা বিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুকে হিন্দু হইতে হইলে ধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তারের একান্ত আবশ্যক শুধু বিস্তার নয়, যাহাতে এই শিক্ষা জীবনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, হিন্দুর সংসারধর্ম্মও সাধনধর্ম্মে পরিণত হয়, তাহাই চরম লক্ষ্য রাখিতে হইবে; একথা তিনি স্পষ্ট ভাবে সকলকে বলিতেন। আরও বলিতেন যে, এই ভারত ধর্ম্মেরপ্রভাবে উন্নত হইয়াছিল, সুতরাং যদি প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে হয় তো ধর্ম্ম পথ ভিন্ন এদেশের আর কোন উপায় নাই।

তিনি দেখিলেন, যুবক ও শিক্ষিতদিগের মধ্যেই অধিকাংশ ব্যক্তি এই সকল তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন, কিন্তু যেমন দেহের একাঙ্গ পূর্ণ হইলে, দেহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না, সকল অবয়বের সম্যক পূর্ণতা আবশ্যক, সেইরূপ কেবল পুরুষেরা শিক্ষিত হইলেই হইবেনা, স্ত্রীলোক দিগকেও সংশিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভাবের সমতা হইবেনা, সমাজের উন্নতি সুসম্পন্ন হইবেনা। এই ভাব হৃদয়ে লইয়া পরলোকগত স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া তিনি "বালিকা বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠা করেন ও যাহাতে বালিকারা ভবিষ্যতে প্রকৃত হিন্দুরমণী,—অন্নপূর্ণা গৃহিনী, সতী সহধর্ম্মিণী, পতিব্রতা-ব্রতকারিণী, আনন্দময়ী জননী—হইতে পারেন সেই রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

আর জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ ভাগবৎ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিতেন। এই সময়, স্থানীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ দীনবন্ধুর প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি বা মর্য্যাদার ব্যতিক্রম হইবে মনে করিয়া, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য একটি গুপ্ত পরামর্শ করেন। সেই পরামর্শে স্থির হইল যে কোন প্রকাশ্য সভায় বহু লোকের সমক্ষে দীনবন্ধুকে পরাস্ত করিতে হইবে। সভা আহুত হইল, দীনবন্ধু সেই সভায় শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। তিনি পাঠ করিতে বসিলেন, কিন্তু যে পুঁথি খানি তাঁহাকে দেওয়া হইল, তাহার অক্ষর গুলি অস্পষ্ট ও স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। মন্ত্রণাকারী ভট্টাচার্য্য গণ মনে করিয়া ছিলেন বুঝি দীনবন্ধু কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিবেননা অথবা পুঁথির লেখা অস্পষ্ট বলিয়া যে স্থান পড়িতে দেওয়া হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে না পারিয়া, অন্যত্র পাঠ করিবেন অথবা অশুদ্ধ-পাঠ করিবেন। কিন্তু দীনবন্ধু শ্রীভগবানের নাম করিয়া যখন শ্রীভাগবতের যে স্থান পাঠ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, পুঁথির সেই স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন পুঁথির আদ্যক্ষরটি দেখিয়াই, শ্লোকগুলি অবিকৃত ভাবে আবৃত্তি করিলেন ও হৃদয় গ্রাহিনী ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। যাঁহার হৃদয়ের ভিতর শ্রীভাগবতের শ্লোকগুলি গাথা রহিয়াছে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য যাঁহারা মন্ত্রণা করিয়াছিল, তখন তাহাদের হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল। সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া তখন তাঁহাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধেরা দীনবন্ধুকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিয়া

সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "দীনবন্ধু তুমি আমাদের পণ্ডিত সমাজের গৌরব রবি।" এই বলিয়া তাঁহারা নিজেও শান্ত হইলেন ও তাঁহাদের পরামর্শ দাতাদিগের উত্তপ্তচিত্তকেও সান্ত্বনা দান করিলেন।

শুনিয়াছি, এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে, একদিন মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় দীনবন্ধুকে সংস্কৃত কলেজে, বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রয়াসপান্, এবং দীনবন্ধুকে এই জন্য একদিন তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে বলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্নেহের আকর্ষণে দীনবন্ধু তাঁহার নিকট গমন করিয়া ছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সংস্কৃত কলেজের আরও কয়েক জন অধ্যাপক তথায় বসিয়া আছেন। আলাপ পরিচয়ের, পর তন্মধ্যে কোন নাম জাদা অধ্যাপক বলিলেন —" দেখ দীন-বন্ধু ! তুমি বেদান্ত দর্শনে সুপণ্ডিত হইয়াছ বটে, কিন্তু শুনিতে পাই তুমি নাকি সাউ শুঁড়ীদের গ্রন্থ ভাগবতের ভক্ত হইয়াছ ?"

ইহা শুনিয়া দীনবন্ধু আর স্থির থাকিতে পারিলেননা। শ্রীগ্রন্থের অপমান তাঁহার সহ্য হইলনা, তিনি তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিলেন ও মনে মনে ভাবিলেন, যে অধ্যাপক মণ্ডলীর অন্তরে এমন ভাব আসে, তাহাদের সংশ্রবে যাইবনা। শ্রীমদ্ভাগবত কি "সাউ শুড়ির" গ্রন্থ ? হায় ! হায় ! বেদান্ত পড়িয়াও একথা শুনিতে হইল। শ্রীমদ্ভাগবত যে অমূল্য রত্ন তাহা কি এখনও লোকে বুঝিতে পারে নাই ?

দীনবন্ধু যখন এই চিন্তাকরিতে ছিলেন সেই সময় স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় একদিন দীনবন্ধুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয় ! আমার বড় ইচ্ছা হয় যে শ্রীমদ্ভাগবততত্ত্ব শ্রবণ করি, কিন্তু যে সকল ব্যাখ্যা সাধারণত শুনিতে পাই, তাহাতে প্রকৃত তত্ত্ব কথা কিছুই বুঝিতে পারিনা সে ব্যাখ্যাও হৃদয়ে প্রবেশ করেনা ! অতএব আপনি আমাকে শ্রীভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া দিন।"

দীনবন্ধু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি সেই তিনটি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, তাহাতে রমেশ বাবু অতিমাত্র প্রীত হইয়া বলিলেন, "এই ভাবে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা আপনি করুন। আমি তাহার প্রচারে

সহায়তা করিব। উক্ত শ্লোক ত্রয়ের ব্যাখ্যা, যথা যথ ভাবে, পরবর্ত্তী কালে দীনবন্ধু সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

—:০:—

জয় জয় দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু গৌররায়!
কৃপাকরি' এই দীনে রাখ তব রাঙ্গাপায়॥
দারুণ সংসার-তাপে প্রতপ্ত হৃদয় মম,
হয়েছে পাষাণ প্রায়, নাহি তাঁহে ভক্তি প্রেম।
লভিয়ে এ' সুদুর্ল্লভ জীব শ্রেষ্ঠ নরকায়;
দুরন্ত রিপুর বশে বিফলে হারানু হায়!!
সুধাভ্রমে বিষপান করিতেছি বারম্বার;
অনুতাপে দহে প্রাণ, গতি কি হবে আমার।
অনাথের নাথ তুমি সুদীন জনের গতি;
বারেক করুণানেত্রে হের এ' দীনের প্রতি।
হৃদয়ে উদয় হ'য়ে মনের মালিন্য হর;
প্রেমবিন্দু বিতরিয়ে হৃদয় সরস কর।
যত দিন রব ভবে এই কর কমলাখি
সদা যেন তব নাম গায় মম প্রাণপাখী॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

শ্রবণা দ্বাদশী।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"আকারো মহতঃ কার্য্যঃ তুল্যাধিকরণে পদে।"

ব্যাকরণ কারিকা।

এই মহাদ্বাদশী পারিভাষিকরূপে গ্রাহ্য অর্থাৎ "ভাস্বর্কোদয়মারভ্য প্রমাণের অধীন। তদ্ভিন্ন মহাদ্বাদশীর অপর [কোনও লক্ষণ হরিভক্তিবিলাসে উক্ত হয় নাই। টীকাতে [স্পষ্টতঃই] বলা হইয়াছে যে শ্রবণা দ্বাদশী] সংযোগে মহাদ্বাদশী হইলে মহাদ্বাদশী হেতু মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে।"

৫। অনুবাদ-কথনে একত্ব-প্রদর্শন।

ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকৃত্যে যে শ্রবণা দ্বাদশী যোগের কথা বলা হইয়াছে, অর্থবত্তা-বিশেষ-দ্যোতন-নিমিত্ত ১৫দশ বিলাশে ভাদ্রমাসে মাসকৃত্যে আবার তাহাই [বিশেষ ফলশ্রুতি সহকারে কথিত হইয়াছে। এইরূপ পুনরূপন্যাস ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনে অনুবাদ নামে কথিত হয়। বৈদিক যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এইরূপ অনুবাদ কথনের বহুল দৃষ্টান্ত আছে। এই নিমিত্ত ন্যায় ও মীমাংসায় শব্দশক্তি বিচারে অনুবাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন মুনি বলেন—"অর্থবানভ্যাসোঽনুবাদঃ।"

অর্থাৎ অর্থবান্ অভ্যাসই অনুবাদ। অভ্যাস অর্থ পুনরুল্লেখ বা পুনরুপন্যাস। শ্রবণা-দ্বাদশী-প্রকরণে শ্রবণনক্ষত্রসংযুক্তা দ্বাদশীর মহাদ্বাদশীত্বনিবন্ধনই ব্রতফল গৌরবাধিক্যে বিশেষরূপে পুনর্ব্বার বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে শ্রবণা দ্বাদশী নামের প্রসিদ্ধতা হেতু ১৫ বিলাসে এই মহাদ্বাদশী শ্রবণা দ্বাদশী নামেই সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোথাও ইহার পৃথকত্ব-অববোধের হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বোধের জন্য অভ্যাস বা একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যথা :—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ শাস্ত্রতাৎপর্য্যনিশ্চয়ে॥

অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে উহার উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, ফলশ্রুতি, অর্থবাদ ও উপপত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। অপিচ—

"মানান্তরেণ প্রাপ্তার্থস্য পুনশ্রবণমনুবাদঃ।

পক্ষকৃত্যে বিজয়া বা শ্রবণা দ্বাদশী যোগের যে অর্থ উপলব্ধ হইয়াছে, ভাদ্রের মাসকৃত্যে সেই শ্রবণা দ্বাদশীরই পুনঃশ্রবণ হইতেছে। সুতরাং পক্ষকৃত্যে ও

মাসাকৃত্যে একই শ্রবণা মহাদ্বাদশীর কথা আলোচিত হইতেছে। কেবল ফলগৌরবাধিক্য শ্রবণনিমিত্ত ভাদ্রকৃত্যে ইহার বিশিষ্টরূপে পুনরুপন্যাস করা হইয়াছে মাত্র।

৬। ফলশ্রুতি দ্বারা একত্ব-প্রদর্শন।

ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকৃত্যে—

অ। তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা।

অ। তত্র স্নাতঃ ইত্যাদিমারভ্য হোমস্তপোপবাসশ্চ সহস্র গুণিতো ভবেদিত্যন্তম্।

নারদীয় পুরাণান্তর্গত অষ্টমহাদ্বাদশী ব্রত কথনে:—

শ্রবণর্ক্ষযুতা চেৎস্যাৎ দ্বাদশী ধবলে দলে।
তদা সা বিজয়া নাম তস্যামর্চ্চেদ্‌গদাধরম্॥
সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং শশ্বৎ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কম্।
সর্ব্বতীর্থফলং বিপ্র তাং বোপোষ্যাপ্নুয়ান্নরঃ॥

পঞ্চদশ বিলাসে লিখিত আছে ভাদ্রমাসে এই যোগ সংঘট হইলে সহস্র গুণ স্থানে লক্ষগুণ ফল হয়। ইহা কেবল মাসযোগে ফলশ্রুতির আধিক্য বর্ণনা মাত্র। আবার যদি এই ভাদ্র মাসে শ্রবণা দ্বাদশী যোগে বুধবার ঘটে তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলজনক। এই ফলাধিক্যের কথা ভাদ্রকৃত্য শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দেখুন ত্রয়োদশ বিলাসে বর্ণিত বিজয়া মহাদ্বাদশীর ফলশ্রুতি বিবরণে পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়া রাখা হইয়াছে যথা:—

ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদিস্যাদ্বিজয়াব্রতম্।
তদা সর্ব্বব্রতেভ্যোঽস্যমাহাত্ম্যমতিরিচ্যতে॥

১৬০ ত্রয়োদশ বিলাস।

সুতরাং সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, বিজয়া দ্বাদশী ও শ্রবণায় কোনও বিভিন্নতা নাই। যদি বলিতে চাও যে ভাদ্রমাসে মহাদ্বাদশীর লক্ষণাক্রান্ত

হইলেই উহাকে বিজয়া বলিব, নচেৎ কেবল শ্রবণা দ্বাদশীই বলিব। হরিভক্তি-বিলাসের বচন বিন্যাস অনুসারে তাহাও বলিতে পার না। কেননা শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণয় প্রকরণের মধ্যেই এই দ্বাদশীকে বিজয়া সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে, যথা যমবচনম্—মহাপুণ্যা দ্বাদশী "বিজয়া" স্মৃতা। ফাল্গুনের শুক্লাদ্বাদশীতে পুষ্যা যোগে ব্রতফলাধিক্যনিবন্ধন ফাল্গুনে ইহার পুনরুপন্যাস হইলেও উহা পুষ্যা শুক্লদ্বাদশীযোগজনিত মহাদ্বাদশী হইতে পৃথক্ ব্রত নহে—একই ব্রত এবং সেই "ভান্যর্কোদয়" প্রমাণের অধীন। ত্রয়োদশ বিলাসের ১৭৪ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

কথা এই যে, শুক্লাদ্বাদশী তিথি "ভান্যর্কোদয়" বচনানুসারে শ্রবণ সংযুক্ত হইলেই উহা মহাদ্বাদশীত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিজয়া নামে অভিহিত হয়, তাদৃ উহার ফলাধিক্য হয়। যথাঃ—

১। যদাতু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথি প্রোক্তা তিথিনামুত্তমা তিথিঃ ॥

২। যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা ॥

১৫।১৩ বিলাস।

ভাদ্রকৃত্যেও ঠিক এই শেষ-বচনই গৃহীত হইয়াছে। ইহার নিষ্কর্ষ এই যে শুক্লদ্বাদশীতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হইলেই উহা বিজয়া তিথি নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহা পারিভাষিক নাম। পুরাণে ইহাকে বিজয়া ব্রত ও শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত উভয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং বিজয়া ও শ্রবণা দ্বাদশীতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ভাদ্র মাস যোগে এবং ভাদ্রে বুধবার যোগে এই ব্রতের অত্যন্ত ফলাধিক্য হয় এইজন্য ভাদ্রমাসে মাসকৃত্যে ইহার পুনরুল্লেখ হইয়াছে মাত্র।

বেতিলা নিবাসী শ্রীমান্ মধুসূদন গোস্বামীর আর একটি কথা এই যে "জয়াদি নক্ষত্রযুক্ত মহাদ্বাদশীর ঘটকত্বে "ভান্যর্কোদয়" বচন আছে, তাহাতে অধিক, সম ও উনের নিয়ম আছে, তাহা স্বীকারকরা কর্ত্তব্য। কেন না নিয়মের এক

অংশ স্বীকার করিলে অপর অংশও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে "দ্বিকলো যদি লভ্যেত" বাক্যের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়।"

আমরা বলি বিশেষ বিধিবশতঃ "বৈয়র্থ্যাপত্তি" হয় না। বিশেষ বিধিদ্বারা সামান্য বিধির সাঙ্কোচ হয়, ইহা সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ নিয়ম। ভাদ্র মাসের শ্রবণা দ্বাদশীতে কেবল যোগের নিয়মই দ্রষ্টব্য। ভগবৎপার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এখানে নারদীয় পুরাণের মর্ম্মানুসারে নৃসিংহ পরিচর্য্যার বিধানানুসারে যোগের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও নক্ষত্র পরিমাণের বিধান সঙ্কোচ করিয়া বলিয়াছেন "তথাচ শ্রবণা দ্বাদশীং প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তং তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগঃ" ইত্যাদি ইহা বিশেষ বিধি। ইহাতে মহাদ্বাদশীর যোগের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে, অথচ নক্ষত্রাদির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে শ্রবণা দ্বাদশীতে বিশেষ বিধান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে ইহাই শাস্ত্রীয় সামঞ্জস্য ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্রীয় সমাধান। শ্রীপাদ সনাতনের স্মৃতিগ্রন্থে আমরা এইরূপে সর্ব্বশাস্ত্রের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি।

নক্ষত্রযুক্ত অপর তিন মহাদ্বাদশীর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, "ভান্যর্কোদয়মারভ্য" বচনানুসারে শ্রবণা ও দ্বাদশীর অতি অল্প যোগ হইলেও শ্রবণদ্বাদশী বা বিজয়া ব্রত সিদ্ধ হয়। এতাদৃশ স্থলে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগ না হইলে শ্রবণা নক্ষত্র একাদশী সংযুক্ত থাকিয়াই পরদিন দ্বাদশীতে নিঃসৃত হয়। যেমন অরুণোদয়ে কণামাত্র দশমী থাকিলেও একাদশী বিদ্ধা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ উক্তনিয়মে ভাদ্র শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতেও শ্রবণার দ্বিকলামাত্র সংযোগ হইলেই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েন। "দ্বিকল" শব্দের শক্তি লক্ষণা দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে। অনন্ত পুণ্যজনক অর্দ্ধোদয় যোগ ঘটনা যেমন অতি বিরল, তেমনি অনন্ত পুণ্যজনক শ্রবণা-দ্বাদশী-যোগ-সংঘটনও অতি বিরল। প্রতি বর্ষে শ্রবণদ্বাদশীযোগ, বিজয়াএকাদশীযোগ বা বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ ঘটে না। তবে রঘুনন্দন স্মৃতির কাম্য শ্রবণদ্বাদশীব্রত বিরল সংঘট্য নহে; বিদ্ধা বা ক্ষীণা একদশীতে শ্রবণা প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন বর্দ্ধিত হইয়া শ্রবণা দ্বাদশীর স্থল করিয়া দেয় ইহাই প্রায়িক নিয়ম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনভিজ্ঞ ও শাস্ত্রশ্রমবিমুখ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা প্রতি বর্ষেই ইহা লইয়া অকারণ বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

কামনা।

—:০:—

কাম বা কামনা শব্দের অর্থ ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা কামনা মনুষ্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে শুভ বা অশুভের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কামনার শেষ নাই, ইহা অনবরত আমাদের মনকে লইয়া খেলা করিতেছে। কামনা মনের সঙ্গি, মন কখন কামনা শূন্য থাকেনা। একটীর পর একটী কামনার ঢেউ মনের মধ্যে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সেই ঢেউগুলি স্তরে স্তরে জমা হইয়া মানুষের অদৃষ্ট রচনা করিতেছে সুখ, দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে ও স্বর্গ ও নরকের রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছে। যে যেপ্রকার কামনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে সে সেইপ্রকার ফল পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

"কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথা কামো ভবতি তৎক্রতুভবতি যৎক্রতু ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে যৎকর্ম্ম কুরুতে, তদভি সম্পদ্যতে।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ মানুষ কামনাময়। যে যেরূপ কামনা করে, তাহার চিন্তা সেই প্রকার হয়, এবং যে প্রকার চিন্তা করা যায় সেইপ্রকার কার্য্যও হইয়া থাকে। কার্য্যানুসারে ফল হইয়া থাকে।

আরও দেখা যায়—

"অথ খলু ক্রতু ময়ঃপুরুষো যথা ক্রতুরস্মিন্‌লোকে পুরুষো ভবতি,— তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।" ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

অর্থাৎ মানুষ চিন্তাময়। পৃথিবীতে যে যেপ্রকার চিন্তা করিয়া থাকে, পরলোকে সেই প্রকার ফল পাইয়া থাকে।

শ্রীভগবান এই কামনাকে দুষ্পূর অর্থাৎ কিছুতেই উহার উদর পূর্ণ হয় না বলিয়াছেন। এবং ইহা মুক্তি মার্গের বৈরী বলিয়া উক্ত হইতেছে:—

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।

গীতা ৩।৩৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিতেছেন যে, কামনাই মানুষকে বল পূর্ব্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করিয়া থাকে, অতএব এই মহাশত্রুকে সর্ব্বপ্রথমে জয় করা আবশ্যক।

"জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্"।

গীতা, ৪।৪৩

মুক্তি মার্গের বৈরী এই কাম কিপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহা একবার দেখা আবশ্যক।

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ" অর্থাৎ আশক্তি হইতে কামনা জন্মে। "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে।"

গীতা ২।৬২

যে পুরুষ গুণ বুদ্ধিতে যে সকল বিষয় চিন্তা করে চিন্তা করিতে করিতে তাহার সেই সকল বিষয়ে আসক্তি জন্মে। যেমন সদা সর্ব্বদা তুমি অর্থ চিন্তা করিতেছ, অর্থের মোহিনী শক্তি হৃদয়ে কল্পনা করিতেছ। অর্থে গাড়ী ঘোড়া বাগান বাড়ী ইত্যাদি সুখ ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে। অর্থের দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়। ভোগ বিলাস সমস্তই অর্থের অধীন। এইরূপ চিন্তার দ্বারা অর্থের প্রতি তোমার আসক্তি জন্মিবামাত্র অর্থ পাইবার কামনা হইবে এই কামনা পরিতোষ করিবার জন্য বিবিধ পাপে নিযুক্ত হইতে হইবে। বিবিধ পাপ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা একবার দেখা আবশ্যক। কামনার সহায় হইবা মাত্র অর্থ পাইবার চেষ্টা হইবে। সে চেষ্টায় বিঘ্ন ঘটিলে কামনা প্রতিহত হইল। কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ হইতে হিতাহিত বিবেকাভাব হয়। ইহা হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট বিষয়ের বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে। স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধি নাশ, এবং বুদ্ধি নাশ হইতে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। ধূম দ্বারা যেমন অগ্নি, মল দ্বারা যেমন দর্পণ, জরায়ু দ্বারা যেমন গর্ভ আবৃত থাকে, কামনার দ্বারা সেইরূপ বিবেক জ্ঞান আবৃত থাকে। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয় স্থান। কাম ইহাদের দ্বারাই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মনুষ্যকে বিমোহিত করে তজ্জন্য শ্রী ভগবান বলিতেছেন :—

"তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্ ॥"

গীতা ৩।৪১।

অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ! তুমি মোহোৎপাদনের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক এই পাপ কামকে জয় কর। ইন্দ্রিয়গণ (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) সদা সর্ব্বদা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, তজ্জন্য মনে সদা বিষয় বাসনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই বিষয় ভোগের জন্য মানুষ বিবিধ পাপ কার্য্যে রত হইতেছে। এই পাপ নাশ করিতে হইলে মন স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক।

মন সম্বন্ধে যোগবাশিষ্টে উক্ত হইয়াছে :—

"মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মনঃ কৃতং কৃতং লোকে শরীর কৃতং কৃতং॥"

অর্থাৎ মনই জগতের কর্ত্তৃ স্বরূপ, মনই পুরুষ বলিয়া গণ্য, সংসারে মন যে কার্য্য করিয়া থাকে শরীর তাহা করিতে পারেনা।

"রাম বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্ব্বাসনং মনঃ।"
যোগবাশিষ্ট।

রাম বাসনায় জড়ীভূত হওয়ায় মনের কার্য্য, ইহাতেই বন্ধন ঘটিয়া থাকে। মনের বাসনা বিলীন হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মনের চঞ্চলতা সম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে :—

"ঘোরং জাগময়ং চিত্তং মূঢ়ং স্বপ্নে ব্যবস্থিতং।
শান্তং সুষুপ্তি ভাবস্থং ত্রিভির্হীনং মৃতং ভবেৎ॥"
যোগবাশিষ্ট।

মন জাগ্রতাবস্থায় অতিশয় কষ্ট দায়ক, স্বপ্নাবস্থায়ও যন্ত্রণা দায়ক, সুষুপ্তি সময়েও শান্তি দিয়া থাকে, কিন্তু এই তিন অবস্থার পর তুরীয় ভাব প্রাপ্ত হইলে মন বিলীন হইয়া থাকে। এ ভাব পাওয়া সহজ নয়। মন দেবতাকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এই মনোজয় ভিন্ন কোন প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

"এক এব মনো দেবোজিতঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদঃ।
অন্যেন বিফল ক্লেশঃ সর্ব্বেষাং তজ্জয়ং বিনা॥"
যোগবাশিষ্ট।

অতএব মনকে জয় করিয়া কামনা সকল বর্জ্জন না করিতে পারিলে কেহ শান্তির অধিকারী হইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥"

গীতা ২৭১।

অর্থাৎ যিনি সমস্ত কামনা বর্জ্জন করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও বিষয়ে মমতা শূন্য হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কামনা বর্জ্জন ও মনস্থির করা ভিন্ন মনুষ্যের ভাগ্যে শান্তি লাভ হয় না। কিন্তু মোক্ষার্থ লাভমান বিবেকী পুরুষেরও মনকে ইন্দ্রিয়গণ বল পূর্ব্বক হরণ করিতে সমর্থ হয় কারণ ইন্দ্রিয়গণ অতি প্রমাথী।

"যততোহ্যপি কৌন্তেয়! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥"

গীতা ২।৬০।

এবং অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথী বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥"

গীতা ৬।৩৪।

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, প্রমথন শীল (দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর) বিচারেও উহা জয় করা দুষ্কর ও দৃঢ়। আমি তাহার নিরোধ করা বায়ুর নিরোধের ন্যায় অসাধ্য মনে করিতেছি।

উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

"অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।"

অর্থাৎ হে মহাবাহো! তুমি মনের চঞ্চলত্বাদি যাহা বলিলে সকলই সত্য কিন্তু

"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে"

গীতা, ৬.৩৫।

হে অর্জ্জুন! কর্ম্মযোগ অভ্যাস দ্বারা এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয় বিতৃষ্ণা দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

সৎসঙ্গ, বাসনা ত্যাগ, অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিচার, প্রাণস্পন্দনাবরোধ, চিত্তকে বশীভূত করিবার এই চারিটী উপায় যোগবাশিষ্ঠ সারে উক্ত হইয়াছে। বিষয়াভিলাষী ইন্দ্রিয়গণ যখন মনকে বিষয়ে রত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে তখন মানুষের উচিত যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনের গতিরোধ করা। শাস্ত্রে দেহাদি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা সঙ্কল্পাত্মক মনশ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সঙ্কল্পের নিশ্চয় কারক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা নামে অবিহিত। মনের গতি নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে নিশ্চয় কারক বুদ্ধির দ্বারা দেখা আবশ্যক যে মন ঠিক পথে যাইতেছে কিনা, যদি উহা বক্র পথ অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহার গতিপরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি না নষ্ট হয় মনের গতি পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি মনুষ্যের আয়ত্তে থাকে, এবং শক্তি আয়ত্তে থাকিতে মনের গতি পরিবর্ত্তন করা সহজ। যেমন চক্ষুর দ্বারা একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখা হইল। চক্ষুর স্বভাব অবলোকন করা উহা পুনঃ পুনঃ সুন্দরীর প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কটাক্ষপাত করিতে করিতে সেই সুন্দরীর যৌবন মনোরাজ্যের বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। এখনও সর্ব্বনাশের সীমায় পদার্পণ করা হয় নাই, এখনও চিত্তের গতি পরিবর্ত্তন করা সহজ। কি উপায়ে পরিবর্ত্তন হইতে পারে? অভ্যাস দ্বারা। কি প্রকার অভ্যাস করিতে হইবে?

(ক) প্রথম দর্শন করিবার পর চক্ষুকে আর সে পথে না যাইতে দেওয়া, ইহা করিলে কোন কামনা হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না।

(খ) যদি চক্ষু পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া কামনার সহিত চিত্তকে বিমোহিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সুন্দরীর রূপ ভুলিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। কি প্রকার চেষ্টা করিলে ভুলিতে পারা যায়? সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে কিম্বা অপবিত্র প্রেমের পরিণাম, লোক নিন্দা, উৎকট ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি। কল্পনা ও চিন্তা করিলে কামনা শিথিল হইয়া সে পাত্রী হইতে মন সরিয়া পড়িবে। তখন মনকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর চিন্তায় নিযুক্ত করিলে মানুষ আর সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

মনের গতি ফিরাইবার জন্য, চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য সাধুসেবা, সদগ্রন্থ পাঠ, শ্রীহরির নাম শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা সদাসর্ব্বদা আবশ্যক। ভক্তি সহকারে শ্রীহরির নাম করিলে মহাপাপি তাপিও তরিয়া যায় তাঁহার নাম অভ্যাস করিয়া চোর রত্নাকর, জগাই মাধাই প্রভৃতি সকলে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, এমনই এ নামের প্রভাব ইহা অভ্যাস করিতে শিখিলে চিত্ত কলুষিত হইতে পারে না। মন সর্ব্বদা চিন্তা করে কিন্তু সে সব অলস চিন্তা, সে চিন্তায় আত্মা'র অধোগতি হয় কিন্তু মনে মনে হরিনাম, রামনাম জপ করিলে অপর চিন্তা মনের মধ্যে স্থান পায় না, অতএব মনকে সর্ব্বদা হরিনামে, কিম্বা কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। যাহারা এই দুয়ের মধ্যে কিছুই করে না, তাহারা আলস্যের অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়াশক্ত হইয়া পড়ে এবং ইন্দ্রিয়গণ মনকে নিশ্চয় বিষয় সুখের প্রতি টানিয়া লইয়া যাইবে। আলস্যে কুচিন্তা ও ইন্দ্রিয় সুখ চিন্তা বলবতী হয়। মনকে কর্ম্মে ও হরিনামে নিযুক্ত রাখিলে ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ থাকে এবং অল্প অল্প সৎকর্ম্মের অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞানের উদয়ে কামনা নষ্ট হইয়া যায় তখন মানুষ মোক্ষ পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

দেব-সঙ্কেত।

—:০:—

হৃদয় কদম্ব মূলে—
একবার দাঁড়াবে এসে বাঁকা বংশীধারী,
প্রেমের ভাণ্ডারী রাধা, লয়ে সঙ্গে প্রাণ আধা,
প্রাণ মন আলোকরি আসিবে শ্রীহরি,
(তাই) দাঁড়ায়ে ভবের কুলে।
তাই বসে আছি ভবে।
নবীন নীরদ শ্যাম প্রণবের বীণা ধরি,
হৃদয় কুটস্থ পাশে, চৈতন্যের হাসি হেসে,

ওঁকার ঝঙ্কার দিবে দিগন্ত প্রসারি,
ধরা দিয়ে "আমি" রবে ॥
মধুর মিলন কিবা।
মানব জনম মোর সফল হইবে,
সফল মুহূর্ত্তে আজি, কৃষ্ণ মোর বর সাজি ;
পরাণের অন্ধকার নাশ করি দিবে,
বিতরি পুণ্যের বিভা ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ধর্ম্মোপাসনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

আমাদের গ্রামের কানাই লাল মৈত্র স্বাভাবতই কোমল হৃদয় ছিলেন। একদিন মহারাজার বাটীতে রামের রাজ্যাভিষেক যাত্রা গান হইতেছিল। মৈত্র মহাশয় গান শুনিতে শুনিতে করুণ রসের ভাবে একেবারে বিমোহিত হন। কৈকেয়ী যখন লক্ষণের গাত্রাভরণ কাড়িয়া লইল তখন আবাল বৃদ্ধ কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। মৈত্র মহাশয় একেবারে চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া ছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মণ কৈকেয়ীকে বলিল "বড়ই পিপাসা হইয়াছে একটু জল দিন।" লক্ষণের কাতরোক্তি শুনিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। তখন কৈকেয়ী বলিলেন বাপু, এ ভরতের রাজ্য, এখানে জল পাইবেনা, বনে যাইয়া জল খাইও"। মৈত্র মহাশয় আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন "এহেন সোণার চাঁদ লক্ষণের বসন ভূষণ কাড়িয়া লইলি, একটু জল খাইতেও দিবি না" এই বলিয়া হস্তস্থিত যষ্ঠীদ্বারা কৈকেয়ীকে প্রহার করিলেন"।

"এই ঘটনা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে প্রকৃত ঘটনা। আমরা শুনিয়াছি পাশ্চাত্য দেশও অনেকে এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। থিয়েটার অভিনয় দেখিতে দেখিতে একজন দর্শক উত্তেজিত হইয়া অভিনেতাকে গুলি করিয়াছিল।

যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে মন ঐরূপ বিমোহিত হইয়া তদ্‌গত চিত্ত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে চিত্তশুদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে।

কোন কোন মহাত্মা প্রহ্লাদাদির মত শৈশব কাল হইতেই হরিনামে মত্ত হইয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। যাহারা পূর্ব্ব জন্মে সেরূপ কর্ম্ম করেন নাই, তাঁহাদিগকে ইহ জন্মেই নাম কীর্ত্তন অভ্যাস করিতে হইবে। কোন কার্য্য বেশী অভ্যাস হইলে তাহা স্বভাবের মত হইয়া পড়ে। শুনিয়াছি পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহাত্মাগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক কঠোর নিয়মাদিও অভ্যাস করিতেন। অভ্যাস করিলে কঠিন কাজও সহজ সাধ্য হয়। আমাদের যখন জীবলীলার অবসান হইবে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত পদাদি কোন কর্ম্মেরই আর শক্তি থাকিবে না, অসাড় হইয়া যাইবে। তখন জিহ্বা হরিনাম বলিতে পারিবে না কর্ণের হরিনাম শুনিবার ক্ষমতা রহিত হইবে, করের হরিনাম জপিবার শক্তি থাকিবে না। কিন্তু যদি এখন হইতে আমরা কায়মনচিত্তে হরিনাম জপ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে অভ্যাস করি তাহা হইলে মৃত্যু সময়েও অভ্যাসের গুণে কর, হরিনাম জপিতে সক্ষম থাকিবে। অভ্যাসের গুণে জিহ্বাতেও আপনা আপনি হরিনামের কীর্ত্তন হইবে।

মৃত্যুকালে জীবের যেরূপ চিন্তা হয় পরকালেও ঠিক সেইরূপ প্রাপ্ত হয়। ভরতোপাখ্যান অনেকেই জানেন। তিনি চরম সময়ে হরিণ শাবক ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরজন্মে হরিণ যোনি প্রাপ্ত হন। তাই বলিতেছি মৃত্যু সময়ের জন্য আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হওয়া উচিত। এখন যদি বৃথা কাজে সময় হরণ করি, সময় থাকিতে যদি হরিনাম কীর্ত্তন অভ্যাস না করি, তাহা হইলে মৃত্যু কালে হরিনাম জপিবার, বা হরিনাম বলিবার এমনকি হরিনাম শুনিবারও শক্তি থাকিবে না। একটী গল্প মনে পড়িল।

"একজন মুদি উচিত দরে জিনিষ বিক্রয় করিত। কাহাকেও কিছু ফাউ দিত না। সাধারণ লোকে ফাউ লওয়াই বেশী ভাল বাসে। সকলেই মুদির নিকট ফাউ চাহিত। সে বলিত "একতোলা দিব না"। অর্থাৎ সে উচিত দরের উপর এক তোলা ফাউ দিবে না। বহুদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবহারে মুদীর ঐ বোল অভ্যাসে দাড়াইয়াছিল। মৃত্যুকালে যখন তাহার ইন্দ্রিয় সকল অসাড় হইতে লাগিল, জ্ঞানের লোপ হইল, তখন আসন্ন মৃত্যু জানিয়া আত্মীয় বন্ধু

সকলে তাহার কাণের কাছে বলিতে লাগিল "হরি বল, কৃষ্ণ বল" মুদি তাহা শুনিতে পাইল না। অভ্যাস বশে বলিয়া উঠিল "এক তোলা দিব না" বন্ধুগণ কৃষ্ণনাম, হরিনাম বলাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কোন ফল হইল না মুদী বারম্বার সেই এক ঘেয়ে বোল বলিতে লাগিল, "এক তোলা দিব না।"

আবার এরূপ দেখা গিয়াছে যে বাক্‌রোধ হইয়াছে, জ্ঞান নাই তথাপি অভ্যাসের গুণে করে "কৃষ্ণনাম" জপিতেছে।

চরম সময়ে মনুষ্যগণ যেরূপ দশা প্রাপ্ত হয় তাহা আমরা চর্ম্ম চক্ষে দেখিয়াও চৈতন্য লাভ করিতে পারিতেছি না।

হরিনাম জপ ও হরিনাম কীর্ত্তন অভ্যাস করা বিশেষ কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি আমরা এতই উদাসীন যে ভ্রমেও হরিনাম করি না। অনেকে বলেন সংসারের আবিলে হরিনাম জপিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমরা সংসার মায়াতে এতই বিমুগ্ধ যে নশ্বর বস্তুর প্রলোভনে অবিনশ্বর বস্তুর আদর করি না। সংসারে থাকিয়া সংসারের আবিল্য হইতে মুক্ত হওয়া দুরাশা মাত্র।

সাগর তরঙ্গের বিরাম হইলে স্নান করিবার আশায় যাঁহারা সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করে তাহাদের সমুদ্র স্নান ঘটে না। আমার বাসনা থাকুক আর নাই থাকুক সমুদ্র তরঙ্গ থাকে না। সেইরূপ সংসারের আবিল্য থামিলে হরিনাম করিব যাহারা মনে করে তাহাদের ইহ জন্মে হরিনাম করা ঘটে না। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংসারের আবিল্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কাজেই এই কোলাহল পূর্ণ অশান্তিময় সংসারে থাকিয়াই আমাদিগকে হরিনামের অভ্যাস করিতে হইবে। মন যদি শুদ্ধ হয়, ভগবানে যদি প্রেম থাকে তাহা হইলে সংসারে থাকিলেও হরিনাম কীর্ত্তনের বাধা হয় না।

হরিনাম কীর্ত্তনের অনেক উপায় আছে। দশজনে মিলিয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় নামসংকীর্ত্তন করা যাইতে পারে। আবার দশজনে একত্রে বসিয়াও হরিগুণ গান করা যায়। আমার বোধ হয় হরিনামের মালা ধারণ করাই নামকীর্ত্তনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। যদি মালা হাতে থাকে তবে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে করিতেও নামকীর্ত্তন হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন সংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া হরিনামের মালা হাতে রাখা ভণ্ডামী মাত্র।

যাঁহারা ওরূপ বলেন তাঁহাদের সহিত আমি একমত হইতে পারি না। যদি হরিনাম করিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকা সত্বেও হরিনাম জপিতে বাধা জন্মায় না। যতদিন অভ্যাস না হয় ততদিন একটু একটু অসুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু অভ্যাস হইলে আর কোনই অসুবিধা থাকে না। আপনারা বোধ হয় দেখিয়াছেন নর্ত্তকী মাথায় কলসী লইয়া নাচে। সুধু কলসী নয়, কলসীর উপর প্রদীপ, নর্ত্তকী হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে, একবার অগ্রসর হইতেছে আবার পশ্চাতে ফিরিতেছে, কখন বা উভয় হস্তের ভাব ভঙ্গি করিতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার মাথার কলস পড়িয়া যায় না। তাহার মন মস্তকের দিকেই নিবিষ্ট থাকে, তাই তাহার কলসী বা প্রদীপ পড়েনা। ঐরূপ যাহাদের মন হরিনামে নিবিষ্ট থাকে তাহার সংসারের কার্য্যে যতই কেন ব্যস্ত থাকুক না, করে জপমালা থাকিলে অভ্যাসের গুণে আপনা আপনি হরিনাম কীর্ত্তন হইয়া যায়। সংসারী মানবের পক্ষে হরিনামের জপ অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিষম বিষময় বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া চরমের পরমার্থ ধন হরিকে ভুলিও না। ঐদেখ দুরাত্মা শমন তোমার কেশাকর্ষণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। আর সময় নাই, এই সময় প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাণবল্লভ হরিকে স্মরণ কর:—'হরিবল' 'হরিবল' 'হরিবল'॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।

অথ শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত নির্ণয়ঃ।

—:o:—

"দ্বাদশ্যেকাদশী বাস্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা।
বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগশ্চ তৎত্রয়ং মিশ্রিতং যদি" ॥

২৫১॥ টীকা "দ্বাদশীতি শ্রবণনক্ষত্রযুক্তা যদি দ্বাদশী স্যাৎ তদা শক্তৈর-শক্তৈশ্চ সর্ব্বৈরেব দ্বাদশ্যেব উপোষ্যা। যদি চ তিথিদ্বয়াৎ তৎত্রয় দ্বাদশী, একাদশী, শ্রবণঞ্চ মিশ্রিতং একস্মিন্নেব দিনে অন্যোন্যং মিলিতং স্যাৎ, তদা বিষ্ণুশৃঙ্খলোনাম যোগঃ। বিষ্ণুদৈবতানাং ত্রয়াণামেষু চৈষামেকত্র শৃঙ্খলবং

গ্রথিতত্বাৎ। ততশ্চ স এবোপোষ্যাঃ ইত্যর্থঃ। তদ্বিশেষশ্চ উদাহরিষ্যমাণ বচনতোঽগ্রেব্যক্তোভাবী"। ২৫।১ ইতি অর্থঃ—শ্রবণ নক্ষত্র যুক্তা ইতি দ্বাদশী পূর্ব্বোক্তভান্যর্কোদয়মারভ্য ইত্যাদি নিয়মানুসারেণ শ্রবণ নক্ষত্র-যুক্তা যদি স্যাৎ তদৈব সর্ব্বৈঃ শক্তৈরশক্তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সৈবোপোষ্যা ইত্যর্থঃ। অত্রতু একাদশ্যাং শ্রবণাভাবে দ্বাদশ্যাং শ্রবণাযোগে শক্তস্য উপবাস দ্বয়ং ইতি অন্যকল্পিতমতমুদ্ভবয়তি। "একাদশ্যাং বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যাং তু পরেঽহনি শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥" কিন্তু "অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্ ব্রতান্তরং। ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং নবিদ্যতে"। ইতি—

অর্থঃ। একাদশ্যাবিশুদ্ধত্বে ইতি। যদা একাদশ্যাং শ্রবণ যোগোনাস্তি দ্বাদশ্যাং তদ্ যোগোবিদ্যতে তদা শক্তস্য উপবাসদ্বয়ং। অত্রতু "অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাৎ ব্রতান্তরং ইত্যাদিনা দ্বাদশ্যাং পারণাভাবে একাদশী ব্রত লোপ প্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যাশঙ্কাং বারয়তি ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ্যতে" ইতি—

প্রমাণঞ্চাত্র ভবিষ্য পুরাণীয় বচনম্ "একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমু-পোষয়েৎ। ন চাত্র বিধি লোপঃ স্যাৎ উভয়োর্দেবতাহরিঃ।" ইতি (সম্বাদশাতি চ)

অশক্তস্ত্ব ব্রতদ্বন্দ্বে ভুংক্তে একাদশী দিনে"।

(নিরাকরোতিচ)

উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাৎ শ্রবণদ্বাদশী দিনে"॥ ইতি

তথাচ নারদীয়ে—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণু ঋক্ষেণ সংযুতাং।

একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্"॥ ইতি

টীকা। নচৈবং শুদ্ধাবিশেষ পরিত্যাগেন দোষঃ স্যাদিতি লিখতি উপোষ্যেতি ত্রিভিঃ। বিষ্ণুঋক্ষেণ শ্রবণেন। কেচিদেবমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থ বিষয়ক মিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তং। বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ। তথাচ নারদীয়াদি বচনেষত্র শক্তাশক্তাদি বিশেষ পরিত্যাগেন "নরঃ" ইতি সামান্য নির্দ্দেশাচ্চ। ইতি ১৫২॥ নচৈবমিতি—এবং দ্বাদশ্যাং যথোক্তলক্ষণানুসারেণ শ্রবণযোগে একাদশ্যাংতদ্‌যোগাভাবে,

দ্বাদশ্যামুপবাসে শুদ্ধৈকাদশীত্যাগেন দোষো ন স্যাৎ। ইত্যাদি নারদীয় বচনং প্রমাণয়তি "উপোষ্যেত্যাদি ত্রিভিঃ। অন্যে তু কেচিদেবং বদন্তি যদা একাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি দ্বাদশ্যাং যথোক্ত শ্রবণ যোগঃ স্যাৎ, তদা শক্তস্য উপবাসদ্বয়ং,—অশক্তস্য দ্বাদশ্যামুপবাসং কুর্য্যাৎ ইতি শক্তাশক্তকল্পনয়া ব্যবস্থাপয়ন্তি। তন্মতং নিরাকরোতি "কেচিত্তেদং"। তদযুক্তমিত্যাদিনা তু "দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে" মহাদ্বাদশীত্বেন বৈষ্ণবানাং তত্রৈবোপবাসাৎ। অত্র তু "দ্বাদশ্যাং শ্রবণ যোগে" ইতি পূর্ব্বোক্ত "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" ইত্যাদি নক্ষত্রযোগে "ইত্যেবার্থঃ করণীয়ঃ। তথোক্ত লক্ষণানুসারেণ নক্ষত্রযোগেন মহাদ্বাদশীত্বনিয়মাৎ। একাদশ্যাং শ্রবণ-যোগাভাবে দ্বাদশ্যাং যথোক্তলক্ষণানুসারেণ শ্রবণযোগে সত্যপি অল্পমাত্রাপি দ্বাদশী যদি অস্তমনাৎ প্রাগেব সমাপ্ততাং গচ্ছতি, তদাত্র কর্ত্তব্যতা স্যান্নবা? ইত্যাশঙ্ক্য সমাদধাতি—'অল্পাহপি অনয়োর্যোগো ভবেৎ তিথিভয়োর্যদি। উপাদেয়ঃ স এবস্যাদিত্যত্রোপবাসে দ্রুবঃ। অত্রপ্রমাণং যথা। তথৈব তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে যদা চৈব নরাধিপ। দ্বিকলো যদি লভ্যেত সজ্ঞেয়োহষ্টযামিকঃ। ইতি মাৎস্যে চ।

"দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা কৃৎস্না পুণ্যতমা তিথিঃ। নতু সা তেনযুক্তাচ তাবত্যেব প্রশস্যতে॥" ইতি অর্থঃ—অল্পোহপি ইতি। পূর্ব্বদিনে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগাভাবে পরদিনে অল্পমাত্রায়াং অস্তমানাৎ প্রাগেব দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং গতায়াং দ্বিকল-মাত্রায়াং স্থিতায়ামপি যথোক্তনিয়মানুসারেণ নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন অষ্টযামিকতা স্বীকৃতা, মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রৈবোপবাসঃ স্যাৎ। ভান্যর্কোদয় ইত্যাদিষু "শ্রবণেত্বস্তমনতঃ প্রাগদ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং। গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেদিতি "নিয়মাৎ॥ অতএব প্রমাণানি "তিথিনক্ষত্রযোগে,—দ্বদশী শ্রবণাযুক্তাকৃৎস্না" ইত্যাদীনি॥ ২৫২॥

আমাদিগের নিকট "শ্রবণাদ্বাদশী" সম্বন্ধে বৃথাতর্ক সমন্বিত নানা পত্র এবং প্রশ্ন আসিতেছে, তাহার জন্য পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যুক্তি প্রমাণসহ প্রতিউত্তর দেওয়া একরূপ অসম্ভব। সেই কারণ উপরি উক্ত "শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত নির্ণয় "প্রকাশিত হইল। ইহা স্বধামগত, স্বনামখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কোনও শীর্ষস্থানীয় মহাত্মার দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। বহুপূর্ব্বে কোন সময়ে ঠিক এইরূপ বৃথাতর্ক এবং অন্যায় প্রশ্নোত্তরের নাশ-সাধনে ইহার সৃষ্টি।

অধুনাতন বঙ্গীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত সমাজের মধ্যে প্রথিত নামা অধিকাংশ পণ্ডিতগণ ইঁহারই নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আমাদিগের পরম সৌভাগ্যবশতঃ হঠাৎ তাঁহার নিজহস্ত লিখিত পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটী প্রাপ্ত হইয়াছি। আশাকরা যায় ইহাদ্বারা শাস্ত্রার্থ-গ্রহণ-সমর্থ প্রতিব্যক্তিই উপকৃত হইবেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী, (সম্পাদক ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল।)

চিত্র পরিচয়।

(চিত্র প্রথমে দ্রষ্টব্য)

"প্রাতরাগতম্ অন্য কান্তা সম্ভোগ চিহ্ন যুক্ত কৃষ্ণং
রোষেণ পশ্যতি যা সা খণ্ডিতা।"

("উজ্জলনীল মনি কিরণঃ।")

জোছনা মুরছা গেছে সুনীল গগন গায়।
নীরজা নিরবে কাঁদে নিহার ঝরিছে তায়॥
ঘুম ঘোরে নিহারিকা মুদিয়াছে আঁখি তারা।
আকুল পঞ্চমে পিক দিগন্তে দিতেছে সাড়া॥
স্নিগ্ধ সুবাস ভরা, ধীরে বহে সমিরণ।
সূচনা করিছে, বিশ্বে উষা ক'রে আগমন॥
যমুনার তটোপরি নিকুঞ্জ বিহারী আসে।
শিলাসনে বসি রাধা ললিতা বিশাখা পাশে॥
শ্যামল মঞ্জুল দ্বারে ; আশায় আশায় শত।
জাগিয়া কাটিয়া গেছে চাহি পথ অবিরত॥
ঢুলু ঢুলু দু'নয়ন অবসাদে ম্লান মুখ।
বিষাদে, আবেগে আহা! ঘনঘন কাঁপে বুক॥
বিফল বাসক সাজ! ক্ষীণআশা হ'ল ক্রমে।
আলু থালু কেশ বেশ, অঞ্চল লুটায় ভূমে॥

দাঁড়ায়ে সখিরা বলে—"চল রাধে গৃহে ফিরি।
হের ওই আসে উষা, আর কি আসিবে হরি" ?
চরণ বাড়ায়ে ধনি উঠিতে করিছে মন।
সেকালে, মাধব আসি কুঞ্জে দিলা দরশন ॥
রিণিকী, ঝিনিকী, ঝিনি, কনক মঞ্জীর বাজে।
চলিতে চরণ বাধে, নত মুখ যেন লাজে ॥
নিশা জাগরন রেখা, নয়নে বদনে মাখা।
দলিত গলিত মালা, স্থান হারা শিখি পাখা ॥
ঈর্ষ্যা, ক্ষোভ হৃদে রাখি, শ্লেষ বাক্যে বলে ধনি!
"পথ ভুলে এলে বুঝি ওহে শঠ চূড়ামণি ?
তুমি না বলিয়াছিলে এই কুঞ্জে দিবে দেখা!
সে কথা রাখিতে বুঝি উষাকালে এলে সখা ?
ভাল, ভাল, ভালহ'ল বিশাখা ললিতা ছিল।
তোমার এ সত্য রক্ষা এরাও দেখিয়া গেল ॥
কি কথা বলিছ ?—ছিঃ ছিঃ লাজ মাত্র নাই!
রমণীর বাস হরি! পরিয়াছ তাই!
ললাটে সিন্দুর চিহ্ন কপোলে কাজল।
আহা হা, কেমন বঁধু! কেবা দিল বল!
অতি ভাগ্যবতী মোরা, প্রভাতে পেলাম দেখা।
ছাড় পথ আর কেন? গৃহে যাই ওহে সখা ॥"
শুনিয়া এভাষা শ্যাম বলিছে মিনতি করি।
"ক্ষমলো ক্ষমলো রাধে! প্রেমময়ী পায় ধরি" ॥
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর বলে—"আমি ক্রীত দাস।
কেনলো নয়নে বারি কেন বৃথা দীর্ঘ শ্বাস ?"

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।

বৃন্দাবন ভ্রমণ।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীগোবিন্দদেব দর্শন।

না ডাকিলেও দুইজন ব্রজবাসী আমাদের সঙ্গ লইলেন। ইহাঁরা কিন্তু খুব ভদ্র, বিশেষ কিছু প্রার্থী ছিলেন না। একজনের নাম মুরারি ব্রজবাসী। অন্যজন ললিত দাদার সাবেক ব্রজবাসী নিত্যধামগত "রংছোড়ের" আত্মীয়। দুইজনেই লাঠি হাতে লইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আমার ইচ্ছা হইল যখন মায়ের কৃপাতেই এই অসম্ভব সম্ভাবিত হইয়াছে, আমরা ব্রজধামে আসিয়াছি, তখন সর্ব্বাগ্রে সেই কাত্যায়নী মহামায়িকে দেখিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লওয়াই প্রয়োজন, নচেৎ অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে। প্রভুপাদের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলাম "কাত্যায়নী" বলিয়া এখানে কোন অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহ নাই। ব্রজবালাগণ শ্রীযমুনা পুলিনে বালু মধ্যে কাত্যায়নী মূর্ত্তি গঠন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া ছিলেন, যে স্থানে পূজা করিয়াছিলেন, সে স্থানটী এখান হইতে ১০।১২ মাইল দূরে। এখানে গোপেশ্বর (শিব) ও পার্ব্বতী আছেন। তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে দর্শন করিতে চলিলাম। এই গোপেশ্বরই কৃষ্ণসঙ্গে সখ্যভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, ইহার দর্শনে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। দেখিলাম দুইজনে সুমুখে সুমুখে রহিয়াছেন, পৃথক পৃথক মন্দির। সেরূপ ভাবে দেখিয়া বড় সুখ হইল না; একত্রে একাসনে থাকিলে যেন মিষ্ট লাগিত। মায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা সূচক আত্মকাহিনী জানাইলাম "তোমার কৃপাই মূল তুমিই কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী যোগমায়ার বিনাশমূর্ত্তি, যখন দয়া করিয়া আনিয়াছ তখন আসল বস্তু মিলাইয়া দিও।" যথা সম্ভব প্রণামী দিয়া পূজারির আশীর্ব্বাদী লইয়া অভীষ্ট দর্শনে বাহির হইলাম। নিকটেই শ্রীবংশীবট, ব্রজবাসীরা তথায় লইয়া গেলেন। অতি রমণীয় স্থান যমুনা পুলিনের ঠিক উপরে;—

ওই শ্রীল বংশীবট পরম মহিমা।
যাঁর গুণ কীর্ত্তনে নাহিক হয় সীমা॥ ভক্তমাল॥

এইখানে একটী শ্রীবট আছেন, শ্রীবটটী তত প্রবীন নহে। ব্রজবাসীরা বলিলেন মূল কল্পবৃক্ষ অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহার মূল শিকড় হইতে বর্ত্তমান বংশীবট উদ্ভূত হইয়াছেন। নিকটেই মণিকর্ণিকার ঘাট তথায় একজন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রস্তরাঙ্কিক শ্রীচরণ পদ্ম লইয়া বসিয়া আছেন। সেখানেও ফুল জল তুলসী দেওয়া হইতেছে, তিনিও এক এক পয়সা প্রণামী পান। স্থানটী এরূপ মনোরম এবং মধুর ভাববিমিশ্র যে দেখিতে দেখিতে আমরা যেন সেই দ্বাপর যুগে চলিয়া গেলাম। আহা এই বংশীবট ফুল্লমল্লিকা শোভিত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না পুলকিত শারদ পূর্ণিমা রজনীতে নটবর শ্যাম সুন্দর ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া কি এইখানেই মোহনমুরলীতে মধুর রাসগান করিয়া ব্রজভুবনকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। শ্যামের বেণুরবে ত্রিভুবন যেন স্তম্ভিত হইয়াছিল। সে মধুর বেণুগীত শুনিতে মলয় পবন স্তম্ভীভূত হইয়াছিল শ্রীযমুনা উজান ছুটিয়া ছিলেন.—গোবর্দ্ধন শিলা দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, গোপাঙ্গনা কুল; কুল শীল লাজ ভয় ছাড়িয়া উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়া ছিলেন। কোন অধীরা এক নয়নে কাজর দিয়াছেন কেহবা এককর্ণে কুণ্ডল লাগাইছেন আবার কেহবা নয়নের কাজর পায়ে পরিয়াছেন পায়ের বঙ্করাজ বক্ষে পরিয়াছেন। রসগানে সকলেরই নীবিবন্ধ খসিয়া পড়িতেছে; এতাদৃশ দুর্গতী দেখিয়াও ধৃষ্ট বাঁশীর করুণা হইতেছেনা। যে নাগরীকে যে ভাবে পাইতেছে তাহাকে তদবস্থায়ই টানিয়া আনিতেছে তাই ভক্ত কবি গোবিন্দ দাস ব্রজগোপীগণের ঐ দুর্গতির চিত্র আঁকিয়াছেন—

বিছুরি গেহ নিজহি দেহ এক নয়নে কাজররেহ
বাঁহে কঙ্কণ রঞ্জিত এক এককুণ্ডল দোলনী।
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ
খসল বসন রসন চেলি গলিত বেণী দোলনী ॥

কল বেণু বাদন পরায়ণ কানুর মোহন মুরলী আজ সৃষ্টি বিপর্য্যয় আরম্ভ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎ বেণুরবে সমাকৃষ্ট হইয়া আলু থালু হইয়া সেই সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বানন্দ ধামের দিকে ছুটিতেছে। তবু পঞ্চমতানে মুরলী বাজিতেছে আজ মুরলী থামিতেছেনা।

মুরলী গান পরম তান যমুনা উজান ধাইলরে।
অন্তরে, সরল, উগারে গরল, কুলবতীর কুল নাশিলরে॥
ধ্বনি শুনি ধরণী, ধরণীধর পুলকিত শিলাগলি বহত নীর।
নীর ত্যজি মীনকুলে উথড়িয়া পড়ত কোইনাহি হোয়ত থির॥

বেণুরবে উন্মাদিনী গোপবধূগণ সকলেই ছুটিয়া আসিয়া বংশীধারীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন।

যথা কৃষ্ণচন্দ্র রহে বংশীবট তটে।
ঘেরিল যাইয়া সবে তাহার নিকটে॥

ভক্তমান প্রেম কল্পতরু গোপীনাথ গোপীগণ সহ বিবিধ রঙ্গে রাস বিলাস আরম্ভ করিলেন। লীলা প্রচ্ছন্ন হইলেও স্থান মহিমার সহিত কবির সরস সঙ্গীত মাধুরী মিশ্রিত এই জড় হৃদয়েও যেন উহা জাগিয়া উঠিল। আমরা কিছুক্ষণ বিবশের ন্যায় সেই অপূর্ব্ব মধুর লীলাস্বাদন করিলাম, হঠাৎ পাণ্ডাজী বলিলেন "মহারাজ গোবিন্দজিকো আগাড়ি দেখনা চাহিয়ে।" পাণ্ডাজীর ধমকে চমক ভাঙ্গিলে তখন বংশীবটমূলে সভক্তি প্রণাম রাখিয়া মুরারীর পশ্চাতে পশ্চাতে আমরা বাহির হইলাম।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট তটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈ র্গোপী গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

যিনি সর্ব্বার্থপরিপূর্ণ রাসপ্রবর্ত্তক, বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত এবং যিনি বেণুধ্বনি দ্বারা গোপসুন্দরীকুলকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই গোপীনাথ আমাদের কুশলের নিমিত্ত হউন।

শ্রীল গোবিন্দের মন্দিরে যাইতে পথে ব্রহ্মকুণ্ড আমাদিগকে দর্শন দিলেন। এই স্থানেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা কৃষ্ণ কৃপা পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের লতা গুল্ম হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ডের সবুজ বর্ণ জলও একটু মস্তকে দিলাম। এই কুণ্ডতীরে পরমা ভক্তিমতী করমেতি বাইজীর কুঠীর অদ্যাপিও ভগ্নাবস্থায় সেই ভক্তিরূপিণী দেবীর অসামান্য কৃষ্ণ ভক্তির মহিমা প্রচার করিতেছে। ব্রহ্মকুণ্ডের মহিমা বর্ণনাতীত। এই ব্রহ্মকুণ্ড হইতে পরমাসুন্দরী শুদ্ধ কাঞ্চন বর্ণা শ্রীবৃন্দাদেবী প্রকট হইয়াছিলেন যিনি এক্ষণে শ্রীকাম্যবনে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীল বৃন্দারাণী এই কুণ্ডের উত্তরে

শ্রীঅশোক তরুমূলে মহামহিমা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। জয়-পুরাধিপতি জয়সিংহ যখন শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধা গোপীনাথ লইয়া জয়পুরে স্থাপন করেন তখন তথায় নববৃন্দাবন স্থাপনাভিলাষে শ্রীবৃন্দাজীকে লইতে আসিলেন; ব্রহ্মকুণ্ডতীর হইতে মহামহিমান্বিত বৃন্দারাণীকে বিবিধ বাদ্য ভাণ্ড করিয়া উঠাইয়া লইলেন কিন্তু রাত্রি হওয়ায় শ্রীকাম্যবনে সেই রাত্রি অবস্থিতি করিলেন। পরদিন এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। পূর্ব্বদিনে চারিজনে শ্রীবৃন্দারাণীর যে সিংহাসন ধরিয়া আনিয়াছিল পরদিন শতজনেও তাহা নাড়িতে পারিলনা। কিছুতেই বৃন্দারাণী উঠিলেননা। শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দারাণীর মন যাইতে চাহিবে কেন? তাই বোধহয় রাত্রিতেই শ্রীরাধারাণীর আদেশ পাইয়া তিনি কাম্যবনেই থাকিয়া গেলেন।

আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল।
তথায় মন্দির আদি বনাইয়া দিল॥
সেই হৈতে বৃন্দাজী রহে কাম্যবনে।
গোরাঙ্গী সুন্দরী চাঁদ ঝলকে বদনে॥ ভক্তমাল।

"জয় রাধে গোবিন্দ" বলিয়া আমরা গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইবার কটক মধ্যে প্রবেশ করিলাম। শ্রীগোবিন্দের মন্দির অতি অপূর্ব্ব ইহার গঠন ও শিল্পকার্য্য বড়ই সুন্দর অথচ বেশ পরিষ্কার ও মজবুদ্। যুগযুগান্তর গিয়াছে তবু কোথায়ও চুলের মতও ফাটে নাই তবে হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হিংসা পরায়ণ আওরঙ্গজেব এই অপূর্ব্ব অট্টালিকাকে একেবারে শ্রীহীন করিয়াছে। ইহার উপরে অতিউচ্চ চূড়াছিল, তাহা দিল্লী হইতে নাকি দেখা যাইত। হিন্দুর মন্দিরের চূড়া অত উচ্চ, তাহা আওরঙ্গজেবের অসহ্য হইল, তিনি ঐ মন্দির চূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন! ডাকাতের চেলা যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বরং কৃপা করিয়া কেবল চূড়া গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মন্দিরটী তবু অনেকটা ঠিক আছে। এই মন্দির শুনা যায় জয়পুরের রাজা মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত; তাই বুঝি গোবিন্দ দেব স্বদেশদ্রোহির মন্দিরে বাস করিলেননা। গোবিন্দদেব এখন পার্শ্বের ছোট মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। লর্ডকর্জ্জন এই প্রাচীন মন্দিরের গঠন ও কারুকার্য্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন জগতে অন্য কুত্রাপিও এরূপ সুন্দর সুরম্য সুদৃঢ়

শর্ম্ম্য দৃষ্টি গোচর হয় না, সেই জন্য প্রভু দয়া করিয়া এই মন্দিরটী ও অপর ৩টী মন্দির গবর্ণমেণ্টের খাস করিয়া গিয়াছেন।

নূতন মন্দির দ্বারে স্ত্রীলোকেরা ফুলের মালা লইয়া আছে, যুঁই, চাঁপা গোলাপ, করবী প্রভৃতির মালা ২।৩ গাছ এক পয়সায়, আমরা দুই পয়সার মালা লইয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীল গোবিন্দদেব দর্শনে চলিলাম। তখন সন্ধ্যা আরতির সময় মালা ও কিঞ্চিৎ প্রণামী পূজারির হাতে দিলাম, পূজারিরা তাহাদের প্রাপ্য পৃথক একটী পয়সা চাহিয়া লইলেন। প্রকাণ্ড রৌপ্য দরজা উদ্ঘাটিত হইল, একটী নীল পরদা বাহির হইল। শত শত নরনারী ব্যাকুল ভাবে নির্নিমেষ নয়নে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনেচ্ছায় তাকাইয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া "জয়রাধে গোবিন্দ" ধ্বনি হইতেছে। আমরা আশার আশে প্রাণ বঁধু দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছি হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। চকিতে নীল যবনিকা যেমন অন্তর্হিত হইল, অমনি নীল মেঘের কোলে স্থির বিজুরীর অত্যুজ্জ্বল রূপ মাধুরী নয়ন ঝলসিয়া দিল, দেখিলাম—

"রতন সিংহাসনে, বসি আছেন দুঁহু জনে,
শ্যাম সনে সুন্দরী রাধিকা॥

হেম গৌরী পিয়ারী জিউর ঢল ঢল মুখ শোভা যেন অমৃত ক্ষরণ করিতেছে, যেন লাবণ্য উথলিয়া পড়িতেছে, তখন প্রসন্ন হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম।

দীব্যৎ বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দ দেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্য মানৌ স্মরামি॥

পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্প বৃক্ষের মূলে বিচিত্র রত্নময় মণি মন্দির মধ্যস্থ রত্ন সিংহাসনে বিরাজিত এবং পরম প্রিয় সখিগণ কর্ত্তৃক সেবিত শ্রীরাধিকা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি।

বৃন্দাবনে যোগ্ পীঠ কল্পতরু বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রতন সিংহাসনে॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত মোহন॥

রাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদির লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥

অপূর্ব্ব সুগন্ধে সমস্ত মন্দির ভরিয়া গেল, আরতির সঙ্গে সঙ্গে আমিও আনন্দে গাহিতে লাগিলাম—

"জয় জয় রাধারাণী জয় নন্দলালা।
শ্যাম সুন্দর জয় জয় জয় ব্রজবালা"॥

আমি যোগাড় করিয়া একেবারে শ্রীমূর্ত্তির অতি নিকটে স্থান করিয়া লইলাম। দেখিলাম দুঁহু জনে কৃপা কটাক্ষে যেন এই দীনহীনের দিকে তাকাইয়া আছেন। ব্রজেশ্বরীর চক্ষে যেন আরো বেশী করুণা! অধরে খুব আনন্দ ভরা সুমিষ্ট হাসি! মনে যাহা আসিল কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা কাতরে নিবেদন করিলাম "বলিহারি করুণা অযাচিত কৃপা, এরূপ না হইলে তোমাকে ভক্তচিত্তবিহারিণী দয়াময়ী বলবে কেন? মনে হইল আমরা যেন শ্রীরাধারাণীর প্রিয় রাজ্যে আসিয়াছি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার রাজ্য হইলেও তবু মধুর বৃন্দাবন তাঁহার অতিপ্রিয় নিজস্ব ধাম, নচেৎ কুরুক্ষেত্রে প্রাণেশ্বরের সহিত বহু বিরহের পর মিলিত হইয়া বলিবেন কেন, "মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।" বিশেষতঃ এই অধমকে যে তিনিই জোর ক'রে ধ'রে এনেছেন, কাজেই এখন আবদার বাড়িয়া গেল। মনের কথা সব বলিয়া ফেলিলাম, "জয় ভানুরাজ নন্দিনী" "জয় বৃন্দাবনেশ্বরী" আজ তোমাকে বিশেষ ভাবে কৃপা করিতে হইবে শুধুমুখে ফিরাইলে চলিবেনা: তোমার ব্রজরস মাধুরী আস্বাদন করাইতেই হইবে!"

ক্রমশঃ
শ্রীবামাচরণ বসু।

তত্ত্ব-কথালাপ।

—:০:—

[প্রেমরাজ্যের প্রিয় সখা, আমার প্রেমময় দাদা শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাগর মহাশয়কে, আমার সন্দেহ ভঞ্জন জন্য কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া ছিলাম; দাদা, সে

সকলের উত্তর যেরূপ ভাবে প্রদান করিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক এবং পরম কল্যাণকর। ভক্ত মাত্রেই পরম আস্বাদ্য জ্ঞানে প্রশ্ন সহ উপাদেয় উত্তর গুলি ক্রমে ক্রমে "ভক্তি"র শ্রীঅঙ্গ সমলঙ্কৃত করিবে ; অদ্য একাংশ মাত্র প্রকাশিত হইল। এবিষয়ে, কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে এদীন হীনকে অথবা কাঙ্গালীহর দাদাকে লিখিয়া পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। (দীন—শ্রী—)

১। রসিক।—"জ্ঞানবিশেষের নাম প্রেম।" (শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক, ১ম সংখ্যা—২)—ইহাই কি ঠিক্? একটু খুলিয়া লিখিবেন।

১। কাঙ্গালীহর।—ভাই রসিক, তুমি দেখতেছি তত্ত্বখনিতে বড়ই নামিয়া পড়িলে। তুমি যে সব নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনা করিতেছ, এসবে তোমার অধিকার ও সূক্ষ্মদর্শিতা ব্যক্ত হইতেছে। এসবের মীমাংসা সাধারণে প্রচারিত হইলে জগতের কল্যাণ ঘটিবে। তোমার প্রশ্নাবলী পাঠে আমি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু অবমকে কেন? এরণ্ড মূলে আম্রফলের আশায় তাকাইলে বঞ্চিত হইতে হয়। যিনি কেবল শাস্ত্রবলে সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন এমন পণ্ডিত মূর্খ। যিনি স্বতন্ত্র ভাবে মীমাংসা করিতে চাহেন তিনিও মূর্খ। পণ্ডিত এবং মীমাংসক এক তিনি, যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান-তণ্ডুল ফোঁয়ারার জলে সিদ্ধ হইয়াছে। এমন নিরভিমান, কাঙ্গাল বা গুপ্ত ধনের ধনী মিলে কৈ? তাই তত্ত্বাদিকোবিদ শ্রীগৌরাঙ্গের পাদসরোজদল প্রান্তে বসিয়া কাঁদ, কাঁদ। তিনিই সকল মীমাংসার একমাত্র মীমাংসক। সেই ফোঁয়ারার জলে সত্য সুবর্ণরেণু সব অবতীর্ণ হয়। ফোঁয়ারার মূলোৎস জগদ্গুরু শ্রীভগবান্। তবে তিনি নিজ করুণাগুণে কাহার কণ্ঠে কখন কতক্ষণ বসেন সে তত্ত্ব জীবের অনধিগম্য। উত্তর দিবার আমার ওরূপ কোনটি নাই ; তবে ভক্ত মুখপদ্মনিঃসৃত প্রশ্নমধু শ্রোতার প্রাণে অমৃতসেক দেয় অর্থাৎ প্রশ্ন নিজেই কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যাশক্তি দ্বারা শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করে। এই ভাগ্যবলে বলীয়ান্ ও উৎসাহিত হইয়া উত্তরচ্ছলে দুচারি কথা বলিবার পিপাসা জন্মিয়াছে।—

জ্ঞানবিশেষের নাম প্রেম নয়, জ্ঞানবিশেষের পরিমাণ প্রেম। "নাম" স্থলে "পরিণাম" বলিলে যেন ঠিক হইত। "জ্ঞা" ধাতু হইতে জ্ঞান ; জানা। "জ্ঞানবিশেষ" শব্দে অধ্যাত্ম জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্বার গতি বুঝায়। এই অবগতির পর ভগবৎ সম্বন্ধ বটে। সম্বন্ধ বাড়িলে প্রেম দাঁড়ায়। সুতরাং

প্রেম জ্ঞান বিশেষের নাম নয়, পরিণাম। সেই পরিণামকে জ্ঞান অভিহিত করিলে, ও কথা মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহাতে দোষস্পর্শ দৃষ্ট হয়। কারণ, জ্ঞানের আস্বাদন স্বানুভাবানন্দ মাত্র। কিরণামৃত সমুদ্রে হারাইয়া যাওয়ার নাম জ্ঞান। এই অবস্থাকেও প্রেম বলা যাইতে পারে। কারণ, এই মধুময় আত্মস্রোতে পড়িলে মানুষ আর উঠিতে চাহে না, অতঃপর পারেনা। তথাপি ত্রুটি বিভাগ করা আবশ্যক। জ্যোতির সাক্ষাৎকার (as they appear) জ্ঞান। জ্যোতির স্বরূপের (মনুষ্যের) সহ জ্যোতির স্বরূপের (মনুষ্যের) সাক্ষাৎকার (as they are) প্রেম। মানুষে মানুষে যে সাক্ষাৎকার তাহা এক বিশিষ্ট জ্ঞান বা প্রেম। প্রেমকে জ্ঞান উপাধি দিলে দোষ থাকে কি? "জ্ঞান" শব্দের অর্থ বাড়াইয়া দাও বাড়িবে। এতো মানুষের হাতে। তবে যে ভাবে জ্ঞান সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়, তাতে জ্ঞানে স্বানুভাবানন্দের অতিরিক্ত উজ্জ্বল রস সম্ভোগাদি অভিব্যক্ত হয় না।

২। রসিক।—পতির সেবা ছাড়া পত্নীর অপর কোন সেবার প্রয়োজন আছে কিনা? পতি সেবিকার গতি কতদূর পর্য্যন্ত?

২। কালীহর।—বহু পূর্ব্বে নিবেদন পত্রিকায় এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলাম। পতির সেবা করিতে করিতে পত্নীর বুকে এক অপার্থিব ভালবাসা বা প্রেম জন্মে। পরস্পরে সম্মানের ভাব আসে। পত্নী তো পতিকে পূজার চক্ষে দেখেন। তখন ইতর ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়, ইতর ভাবের কথা মনে করিতেও লজ্জা আসে। দাম্পত্য প্রেমফলে মানুষ এই ভাবে নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানে পৌঁছে অর্থাৎ পতিও পত্নী হইয়া দাঁড়ায়, পত্নীতো পত্নী আছেই। বিবাহের উদ্দেশ্য ইতর প্রেম নয়। অতঃপর উভয়ে সখিভাবে কৃষ্ণ সেবায় নিরত হন। এ গেল অতি বড় উচ্চ কথা।—রাধার রাজ্য। পতিকে পতিজ্ঞানে পূজা করিয়া পত্নী পরজন্মেও তাঁহাকে সেই ধ্যানসূত্রে পতি পান। কিন্তু পতিতে জগৎপতি কৃষ্ণবোধ থাকিলে, পতি সেবায় কৃষ্ণসেবা হয়। সুতরাং পত্নী পরজন্মেও কৃষ্ণভার্য্যা লক্ষ্মীগণে প্রবেশ করেন। পতিসেবা কৃষ্ণসেবার দীক্ষা শিক্ষা। পতিকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিতে গেলেই, পতির অতীত অপর একজন উত্তম পুরুষের ধারণা থাকে। এই ধারণা দ্বারা কৃষ্ণরতি জন্মে।

পত্নীর প্রাণ তখন উভয়কে এক করিয়া ফেলে। কৃষ্ণ পতিতে, পতি কৃষ্ণে স্ফূর্ত্তি পায়। বিধবার পক্ষে পতি কৃষ্ণে। লক্ষ্মীর রাজ্য।

৩। রসিক।—"স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—এখানে স্বধর্ম্ম ও পর ধর্ম্ম কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে?

৩। কালীহর। অমুক শিষ্যটিকে প্রহার করা তোমার ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য তখন তুমি যদি হরিদাস ঠাকুর হইয়া বস, চলিবেনা। হরিদাসের জন্য যে ব্যবস্থা তোমার জন্য তা নয়। শিষ্যটিকে দণ্ড দিলে তুমি কালে হরিদাস হইতে পার. কিন্তু ওরূপ অকর্ম্ম দ্বারা হইতে পারিবেনা। ফুলদলে ঠাকুর পূজা করা তোমার ধর্ম্ম কারণ এতাধিক তোমার অধিকার জন্মে নাই, এমতস্থলে এক মহাত্মাকে তুমি দেখিলে তিনি ওরূপ করেন না বরং ফুলদলে কি হবে উক্তি করেন। তখনই তুমি সেই দৃষ্টান্তবলে ঠাকুর পূজা বন্ধ করিলে এবং মনে করিলে আমি একজন হয়েছি! এতে তোমার সর্ব্বনাশ হলো যে। তুমি ঠাকুর পূজা ছাড়িয়া সে মহাত্মার মত উঠিতে পারিবেনা। ফুলদলে ঠাকুর পূজা করিয়াই উনি মহান্ হইয়াছেন. অবসর হইয়াছেন। দেখ, ফুলেদলে পূজা তোমার স্বধর্ম্ম, কারণ তুমি এই অবস্থারই জীব, ফুলেদলে পূজা না করা সেই মহাত্মার স্বধর্ম্ম। ফুলেদলে পূজা ছেড়ে দিয়ে তুমি যা একটা আরম্ভ করিলে এইটা তোমার পরধর্ম্ম, পরের বা অন্যের ধর্ম্ম। উহা তোমার নিজ ধর্ম্ম নয়। প্রত্যেকের স্বধর্ম্ম প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন যেটি পরধর্ম্ম কালের গতিতে সেইটি স্বধর্ম্ম হয়। আবার এখন যেটি স্বধর্ম্ম কালে সেটি পরধর্ম্ম হয়। তোমার দেশে এখন ভোর, ক্রমে সন্ধ্যা আসিবে। অন্যত্র সন্ধ্যা, ভোর হইবে। তুমি এখন এমনি অধিকারী যে তুমি শ্রীগৌরনামে পাগলপারা উন্মাদগ্রস্থ আছ, তখন তুমি যদি সেই ভাবের নেশায় থাকিয়াও প্রাণ বল্লভকে প্রাণে পাইয়াও লোকসঙ্গে অন্যদেবতা দেখিয়া প্রণাম কর, তখন এই প্রণাম তোমার পরধর্ম্ম, ঐ শ্রীমূর্ত্তি অন্য দেবতা গণ্য। এই তোমার অধোগতি, ভাবের ছুট, সুতরাং ভয়াবহ। কারণ ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক শিখেছিলে, তা ভুলিয়া আবার তোমাকে যোগ কসিতে হইল। ভয়াবহ নয় কি? স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম কোন ধর্ম্ম বিশেষের সংযুক্ত নয়, অধিকার ও অনধিকার সূচনা মর্ম্ম।

এই বাড়ীতে যখন আমার জ্ঞান আছে, তখন অতিথি আসিলে আদর অভ্যর্থনা আমার স্বধর্ম্ম, না করা পরধর্ম্ম। কারণ মনে কর এমন ব্যক্তি আছেন তাঁহার বড়ীতে অতিথি আগমন হইল, কিন্তু তাঁহার আমার জ্ঞান নাই। সুতরাং তিনি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিলেন না। সকলেই, একটা না একটা স্থানে আসে যায়। অভ্যর্থনা কেন? না, আমার জ্ঞানে। এব্যক্তি অভ্যর্থনা করিলেন না বলিয়া তাঁহার প্রত্যবায় নাই। কারণ, এই বাড়ীতে তাঁহার আমার জ্ঞান নাই। দেখ অতিথিকে আদর না করা তাহার স্বধর্ম্ম কিন্তু এইটা আমার পরধর্ম্ম। তাহার ধর্ম্ম আমি আচরণ করিলে ভয়াবহ পরধর্ম্মে ডুবিব ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা সব ব্যক্তিগত। ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত যাহা তাহা সর্ব্বগত।

৪। রসিক।—পাপ কি?

৫। কলাইহর।—স্বধর্ম্মই পুণ্য, পরধর্ম্মই পাপ অর্থাৎ অনধিকার চর্চ্চাকে পাপ বলা যায়। পুণ্য কর বা পাপ কর যাহাই কর, "আমি করি" এই বিশ্বাসই পাপ। কারণ ইহাই পাপপুণ্য বন্ধহেতু। এর চেয়ে সংক্ষেপ বলা যাউক:— "নিজের সুখের জন্য যা করি পাপ কৃষ্ণ সুখের লাগি যা করি তা পাপের (পাপপুণ্য) অতীত পুণ্য।" নিজ সুখের জন্য দানও পাপ, কৃষ্ণ সুখ লাগি চুরিও পুণ্য। পাপ শব্দে পাপপুণ্য বুঝায়।

শ্রী—

অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি।

——:০:——

জয় দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী শুভঙ্করী,
দীনের কুটীরে মাগো এস দয়া করি।
দেবতা বাঞ্ছিত দু'টী চরণ তোমার,
পূজিতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।

কিন্তু মা অভাগা আমি অতি দীনহীন।
ভক্তিহীন হিয়া মোর পাপে বিমলিন;
কি দিয়া পূজিব তব চরণ রাতুল,
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে তার নাহি পাই কূল।
এ হৃদয় একদিন ভক্তসঙ্গ গুণে,
ছিল গো মা সুশোভিত ভকতিপ্রসূনে।
খেলিত অন্তরে ধীরে শান্তির পবন,
সতত আনন্দ-নীরে ভাসিত জীবন।
হায়! এবে ভাগ্যদোষে সে হৃদয় মম;
হয়েছে সংসার তাপে মরুভূমি সম;
এখন এ অভাগার নেত্র সার বিনা,
অন্য কোন সম্বল নাহি ত্রিনয়না।
দয়াময়ি! দয়াকরি' দাও দরশন,
অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব চরণ।
কাতর কিঙ্করে মাগো কৃপানেত্রে চাও,
হিয়ার অনল মোর নিভাইয়ে দাও;
নাহি চাই ধন, জন, মা চাহি সামর্থ্য,
"কৃষ্ণভক্তি" দিয়ে মোরে করগো কৃতার্থ।
পরমা প্রকৃতি, তুমি বিশ্বপ্রসবিনী,
কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী অশুভ নাশিনী।
কৃষ্ণধন দিতে মাগো বড় তুমি বল,
তার সাক্ষী বৃন্দাবনে গোপিকা সকল।
কাত্যায়নী ব্রত করি পূজিয়া তোমারে,
পেয়েছিল পতিরূপে ব্রজেন্দ্রকুমারে।
তাই আজি তব ঠাঁই করি এ প্রার্থন,
পাই যেন অন্তকালে গোবিন্দ চরণ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার, সোণামুখী।

শ্রীগৌর-তত্ত্ব।

—:০:—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের নাম গানে ও গৌরলীলামৃত পানে হৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একই। শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর শ্রীভগবান। শ্রীভগবানের নাম গানে ও লীলামৃত পানে জীবের আনন্দানুভব স্বাভাবিক। জীব মাত্রেই দুঃখী এবং ত্রিতাপে সদা সর্ব্বদা দগ্ধ! সকলেরই ইচ্ছা কিসে দুঃখ দূর হয়, সকলেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত? কি করিলে শান্তি পাওয়া যায়, কোথায় যাইলে তাপিত প্রাণ শীতল হয়, চিত্ত প্রফুল্ল হয়, এই ভাবনায় ত্রিতাপ দগ্ধ জীব সতত ভবারণ্যে ছুটাছুটী করিতেছে। আকাঙ্খার জিনিস্ না পাইয়া সর্ব্বদা হাহাকার করিতেছে। জীবের মনে এরূপ একটা প্রবল আকাঙ্খা হইলেই শ্রীভগবান কোন না কোন একটা পথ দেখাইয়া দেন। কেননা তিনি জীবের পিতা এবং মঙ্গলাকাঙ্খী। জীবের দুঃখ তিনি সহিতে পারেন না। দুঃখী, তাপী ও পতিত শরণাগতের উপর আমার শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের চিররালই বড় দয়া। আমার শ্রীগৌরসুন্দর জীবের দোষ গ্রহণ করেন না। এটী তাঁহার বিশেষ গুণ। এই গুণেই তিনি জগতের সর্ব্ব জীবকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি জীবের দোষ গ্রহণ করেন না, এই বিশ্বাসটী মনে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া একবার আমার প্রাণগৌরকে প্রাণ ভরিয়া হৃদয় খুলিয়া ডাকিতে পারিলে তিনি জীবের সকল দুঃখ দূর করিয়া দিয়া অনাথনাথ ও পতিত পাবন নামের সার্থকতা করেন। আমি পাপী আমি বিষম নারকী আমার আর উদ্ধার নাই, আমি এজনমের মত অধঃপাতে গিয়াছি শ্রীভগবানের দয়ার পাত্র আমি নহি, এই ভাবিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে কোন ফল নাই। আমার শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর জীবের দোষ গ্রহণ করেন না। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গকে লিখিত আছেঃ—

অহং কনক কেতকী কুসুম গৌর দুষ্টঃ ক্ষিতৌঃ,
ন দোষ লব দর্শিতা বিবিধ দোষ পূর্ণেঽপিতে।

"অতঃ প্রবণয়াখিন্না কৃপণ বৎসল ত্বাং ভজে,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং

অর্থ হে কনক কেতকী কুসুম গৌর! হে ত্রিভুবন মন নয়ন চৌর! তোমার গুণে ত্রিভুবন বিভোর। কিন্তু আমি নানাবিধ দোষে পরিপূর্ণ। অথচ তুমি দোষীজনের দোষ দর্শন করনা। তোমার এই গুণে আমি তোমার শরণ লইয়াছি।

একথা যেন বেশ মনে থাকে যে অকপট ভক্তিতে শ্রীভগবানের চরণে পতিত না হইলে তিনি দয়া করেন না। তিনি দোষ দর্শন করেন না সত্য, কিন্তু কপটতা শূন্য হইয়া নিজের দোষ তাঁহার নিকটে স্বীকার করিতে হইবে। সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। পেটে কিছু মুখে কিছু রাখিলে চলিবে না। নিষ্কপট এবং প্রসন্ন হইয়া একটীবার তাঁহার নিকট আত্মদোষ বলিয়া অন্তর নির্ম্মল কর, দেখিবে আমার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর তোমার চিত্ত শুদ্ধি একদিনেই করিয়া দিবেন। যে কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ সাধকগণ কঠোর ব্রত নিয়মাদি বহুকাল ব্যাপিয়া নিয়মিত পালন করিয়াও সকল মনোরম হন নাই, তাহা, শ্রীভগবান আমার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর একদিনে তোমাকে দিবেন তাঁহার নামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ গৌরের শ্রীচরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ কর দেখিবে তুমি যাহা চাও তাহা পাইবে। বহু পুণ্যফলে শ্রীভগবানে বিশ্বাস জন্মে। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে পূর্ণ বিশ্বাস না হইলে তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও লীলানুশীলনে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। এই বিশ্বাস পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল। অল্প পুণ্যবলে এই সুকৃতি লাভ হয় না।

মহা প্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
অল্প পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

ভাগ্যবান জীবেরই শ্রীভগবানে বিশ্বাসরূপ সুকৃতি লাভ হয়। সকলের ভাগ্যে এ সুকৃতি লাভ ঘটেনা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলা পাঠ ও অনুশীলন করিলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শ্রীগৌর লীলামৃত এমনি হৃদয়গ্রাহী, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা এমনি মধুর, যে একবার যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে তাহার হৃদয় নির্ম্মল হইবেই হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
নির্ম্মল হ'লো হৃদয় তাহার।

পয়ার ছন্দে লিখিত প্রাচীন ভক্তি শাস্ত্র সকল আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল ছিল। এখন আর তাহা নাই। সে দিন গিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপায় তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। এই সকল প্রাচীন অমূল্য নিধির প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতে সুকৃতির প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপা না হইলে এ সুকৃতির সঞ্চার হইবেনা। শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব যতই অনুশীলন করিবে, শ্রীভগবানের লীলা ততই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইবে। কিছু সৎসঙ্গ, বেশী আকাঙ্খা, আর সরল বিশ্বাস হইলেই আমার দয়াল ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অপার দয়ার প্রকাশ দেখিতে যাওয়া যায়। আর এককথা গৌর ভক্তের কৃপা লাভ ব্যতিত আমার শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের দয়া লাভ দুষ্কর। সাধুসঙ্গের মহিমা শাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। প্রকৃত সাধুসঙ্গ হওয়ায় ও বহু সুকৃতির ফল। আর সাধুসঙ্গ না হইলেও কোন কাজই হইতে পারে না। সাধুসঙ্গ দুই প্রকার। ভক্তি শাস্ত্র ও ভগবদ্ভক্ত। একের অভাবে অপরকে আশ্রয় লইতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয় চর্চ্চা করিতে করিতে জানিতে পারিয়াছি এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ কঠিন হইলেও ভক্তি শাস্ত্রানুশীলন জীবের পক্ষে কথঞ্চিত সহজ সাধ্য। কিন্তু অধিকারী হওয়া বড় কঠিন। শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি যে পরিমাণে উদয় হয় সেই পরিমাণে দুঃখ ও মৃত্যু ভয় হ্রাস হয়। শ্রীভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র জীব দুঃখ নিবারণের জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। যদি ত্রিতাপের শান্তি চাও, তাপিত প্রাণ শীতল করিতে চাও, শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শরণাগত হও। তিনি দয়ার অবতার, করুণাময় পতিত পাবন, অনাথের নাথ, দীন শরণ। তিনি সর্ব্বদা তোমাদের নিকটেই থাকেন। অল্প চেষ্টায় তাঁহাকে পাওয়া যায়। হে ত্রিতাপ দগ্ধ দুঃখীজীব! একবার তাহাকে হা গৌরাঙ্গ! প্রাণ গৌরাঙ্গ! বলিয়া ডাক! একটু তাহার অনুসন্ধান কর। কুতর্কে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া সংশয় কূপে পতিত হইয়া অমূল্য মানব জীবন বৃথায় নষ্ট করিও না। এখনও সময় আছে। সময় থাকিতে, এস সকলে মিলিয়া অনাথ নাথ প্রাণ গৌরকে ডাকি। জয় গৌর!!

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

পতিতের উক্তি।

—:০:—

জন মুখে শুনে থাকি কত সাধু জন,
আপন মঙ্গলে সদা হইয়ে বিরত,
মেদিনীর শোক, তাপ করিতে হরণ,
কঠোর কর্ত্তব্য-ব্রতে নিরত নিয়ত।
এ হেন সাধুর সঙ্গ লভিবার তরে,
মানব উন্মনা চিতে ধায় দলে দলে;
অজ্ঞান, পতিত জনে নাহি চাহে ফিরে,
নিত্য সাধু-গুণ-গান গাহে গো সকলে।
অধর্ম্মী, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট, অপরাধী ব'লে,
সমগ্র ধরণী মোরে ঘৃণায় ত্যজিলে,
দলিত, মথিত হৃদে "কোথা নাথ" বলি,
উৰ্দ্ধ মুখে উৰ্দ্ধ বাহু কাঁদিব যখন,
তুমি ত বক্ষের 'পরে ল'বে মোরে তুলি,
স্বর্গ হ'তে নেমে এসে মুছা'য়ে নয়ন।

শ্রীচুণীলাল চন্দ্র।

কাঙ্গালের মনের কথা

—:০:—

(১৩১৯ সালের ৫ই শ্রাবণ রবিবার;—দিবামান, ৩৩ দণ্ডের ও কিছু উপরে।) সময় সুদীর্ঘ হইলেও সারাটা দিন সাংসারের বাজে কোলাহলে কাটিয়া গেল। একটুকু হরিনাম কি পরিণাম চিন্তা করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, দিনতো

বৃথাই গেল, দেখি যদি পারি সন্ধ্যার সময় একটুকু স্মরণ মনন করিব,—একটুকু সন্ধ্যা বন্দনাদি করিব।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাও সমাগত, আমিও হাত মুখ ধুইয়া, ধূপ-দীপ, মালা ঝোলা লইয়া তুলসী তলায় উপবিষ্ট। কিন্তু যাহা করিতে বসিলাম তাহার কিছুই করা হইল না। সাধ্য কি যে একটুকু তপ-জপ করি, একটুকু কৃষ্ণ চিন্তা করি!! সেই সকল সাংসারিক বাজে গণ্ডগোল আসিয়া মনটারে অস্থির করিয়া লইল। যাহা করিতে কল্পনা ছিল,—তাহার কিছুই করা হইল না। দুশ্চিন্তা গুলিকে দু'হাতে ঠেলিয়াও একটুকু সরাইতে পারিতেছিনা। আমাকে অবসর দেখিয়া যেন আরোও সজোরে আক্রমণ করিয়া বসিল।

আমিতো হাত নাড়ি,—ঠোট নাড়ি সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করি,—কিন্তু কোথায় থাকিয়া কি করিতেছি, কিছুই বুঝি না। সমস্ত কার্য্যই মন লইয়া,—মনতো সংসার চিন্তার অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত। মনকেতো আর খুজিয়া পাইতেছি না। যদিও কোন সময় বহু চেষ্টায় মনের নিকটস্থ হই, কি মনকে নিকটস্থ করিয়া লই, দেখি, মন আর মনের মত নাই! উহার পরতে পরতে অসংখ্য অগ্নিশিখা কুচিন্তার কোলাহলময় ঝঞ্ঝাবাতে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে;—নিভে না।

হায়! হায়!! আমার কি দুর্দ্দশারে!! সারাটা দিন কাটিয়া সন্ধ্যা সময়েও একটুক্ নিস্তার নাই।

উপাসনায় বসিয়া বাহিরে কর ফিরাইতেছি, জিহ্বা নাড়িতেছি, সংযত চিত্ত তপস্বী ঠাকুরের মত বসিয়া তপ জপ করিতেছি; আর ভিতরে মনে মনে কত যে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতেছি, মামলা মোকদ্দমার মন্ত্রনা করিতেছি তাহার সংখ্যা নাই।

তুলসী তলাতে থাকিয়াই; বাজারে যাইতেছি, চাউল খরিদ করিতেছি,—মহাজনের দেনার জন্য বাড়ী ঘর বিক্রয় করিতেছি, ঝগড়া করিতেছি, শত্রুর ঘরে আগুন দিয়া চুপে চুপে পলাইতেছি, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যাইতেছি, কত কিছু করিতেছি কি বলিব।

সান্ধ্যোপাসনার তো এই পর্য্যন্তই শেষ। স্মরণ মনন সারা!! আর বসিয়া থাকিলে কি হইবে? মনোদুঃখে উঠিয়া পড়িলাম। যা'ক্ এখন আর কিছুই হইবে না, রাত্রি খাওয়া দাওয়ার পর যা' হয় একটুক্ কৃষ্ণ চিন্তা করিব।

রাত্রি হইল, খাইলাম, শুইলাম, এখন আর কি? স্মরণ মনন? হায়! হায়!! সাধ্য কি যে মনকে আমার করিয়া লইয়া, কুচিন্তা কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া একবার ভগবানের লীলা চিন্তনে নিযুক্ত করিয়া দেই। যেই শুইলাম, অমনি সংসারের বাজে গণ্ডগোলে হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া গেল।

এখন ঘুমাইলে বাঁচি। কিন্তু ঘুম নাই। শয্যা কণ্টক উপস্থিত। কেবল এপাশ ওপাশ করিয়া বিছানায় গড়াগড়ি খাইতে লাগিলাম। বায়ুর প্রকোপে ঘন ঘন হাই উঠিতে লাগিল। আর হাই ফেলিব কত?

ভাগ্যের গতিক বুঝিয়া লইতে আর বিলম্ব হইল না, অগত্যা বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে একটা ময়দান মধ্যে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলাম। বর্ষাকাল হইলেও বৃষ্টি বাদল নাই।

যখন আমি শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে, রাত্রি তখন ১২টা বাজে বাজে। অষ্টমীর আধখানা চাঁদ ডুবু ডুবু, না, দেখিতে দেখিতে ডুবিয়াই গেল।

এতক্ষণ বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার রাশি চন্দ্রালোক তাড়ণে গাছ, পালা, ঝাড়, জঙ্গলের আড়ালে লুকাইয়াছিল; চন্দ্র অস্তমিত হইবামাত্র পৃথিবীটা অসীমান্ধকারের কুক্ষিগত হইয়া পড়িল।

আমি গা মোড়া দিয়া উপরের দিকে চাইয়া দেখি,—তারা গুলি ও গা ঝাড়া দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবতী হইয়া উঠিয়াছে।

এখন আমি আকাশের দিকেই চাহিয়া আছি। আর নক্ষত্র সমূহের গতি বিধি চিন্তা করিতেছি।

না,—একটা কৌতুহলের বশীভূত হইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, কলপনার সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে থাকি। উঠিয়া এই তারা গুলির উপরে কি আছে, দেখি যত দূর পারিলাম উঠিলাম। উঠিয়া উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, ও বাবা!! একি? আরোও কত অসংখ্য নক্ষত্র মালা যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে!! উপরের শেষ কোথায়?

তখন বোধ হইল, তবে কিবা আরোও কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত পৃথিবী আছে। অসীম আকাশের কোন্দিকে কোথা যাইব?

কল্পনার শক্তি হ্রাস হইয়া গেল। কল্পনা আর উঠিতে পারে না। অবসন্না হইয়া পড়িল। তবে আর আমিই যাই কোথায়? আর যাইবার উপায় কি?

এযে অনন্ত! অনন্তের অন্ত পাইব কি? এখন পাছের দিকে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।

অগত্যা কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া পিছাইতে লাগিলাম। পিছাইতে পিছাইতে বহু নক্ষত্রলোক অতিক্রম করিয়া সাবেক জায়গায় আসিয়া বসিলাম। এখন আমি যেন নাই, কেবল কল্পনা আছে। অনন্তের তরঙ্গে পড়িয়া আমি আর আমাকে খুজিয়া পাইতেছি না।

আমি অনন্তের অনন্ত চিন্তায় অভিভূত। চাহিয়া দেখি, কেবলি অনন্ত!! যে পৃথিবী পৃষ্ঠে উপবিষ্ট আছি, তাহাও অনন্ত।

গাছের দিকে চাই, গাছ অনন্ত! লতা পাতা অনন্ত! পশু, পক্ষী, জীব জন্তু অনন্ত!! কীট পতঙ্গ অনন্ত!! অনন্ত আকাশ, অনন্ত পাতাল, অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র, অনন্ত চন্দ্র সূর্য্য!! সকলি অনন্ত!!!

এখন আমি এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাকে আর দেখা যায় না। অনন্তের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখি, আমার অস্তিত্বই অনুভবে আসে না। কতক্ষণ নিঝুম ভাবে বসিয়া রহিলাম। আবার পৃথিবী পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া অপর পৃষ্ঠে যাইবার ইচ্ছা হইল। কল্পনার কোলে উঠিলাম। কল্পনা আমাকে লইয়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত!

চাহিয়া দেখি সেই অনন্তের উল্লাসময় অনন্ত তরঙ্গ! সেই অনন্ত আকাশ, অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গাছ পালা, তৃণ গুল্ম, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি অনন্তের বৈভব রাশি।

প্রিয় পাঠক মহাশয়। এখন আর আমার সংসার চিন্তা নাই। সংসার হারাইয়া গিয়াছে। আমি বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল হাবু ডুবু খাইতেছি।

হরি! হরি!! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি তো একটা কিছুই না। আমার অস্তিত্বই অনুভবে আনিতে পারিতেছি না। হা কৃষ্ণ! তোমার কি ইচ্ছা কে জানে?

মানুষ! তোমার যে জ্ঞানের গর্ব্ব, মানের গর্ব্ব, রূপ যৌবনের গর্ব্ব, বিদ্যা বুদ্ধির গর্ব্ব কি ধন জনের গর্ব্ব কেবল অনন্তের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই তাহার মূল। যদি অনন্তের দিকে একটুকু চাহিয়া দেখ, তবে তোমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে;—তোমার গরিমার অত্যুচ্চ প্রাসাদ চূর্ণাতিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া পড়িবে।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে "আমি" একটা কিছুই না। তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্রত্ব বুঝিয়া লইতে ও অহঙ্কার অভিমানের দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে। মানুষের কর্ত্তব্য সাধনে সুদৃঢ় মনঃ সংযোগ করিতে পারিবে।

দেখ,—এই যে অতবড় মহারাজটা, এই যে দেশ বিখ্যাত অতবড় পণ্ডিতটা, এই যে অতবড় ধনীটা, এই যে অতবড় বীর পুরুষটা অনন্তের নিকট লইয়া গেলে আর কাহাকেও দেখা যায়না।

হা ধিক্! তুমি এমন একটা নগণ্য হইয়াও অজ্ঞানতা বশতঃ তোমার এত অহঙ্কার? এত আস্ফালন? এত অভিমান? তুমি যতক্ষণ অনন্তের বিষয় অনবগত থাক,—ততক্ষণই তুমি একটা, বড় লোক, তুমি একটা ধনী, তুমি একটা মানী, তুমি একটা পণ্ডিত বা একটা যা ইচ্ছা তা'ই।

ও কুলীন ঠাকুর! তুমি যে দিন রাত কুলের গৌরব করিয়া মর,—ভাবিয়া দেখতো তুমি একটা ধূলি কণা হইতে কত ক্ষুদ্র?

ও যুবতী সুন্দরি! তোমার আর রূপ যৌবনের গৌরব গায় ধরেনা? হায়রে! এই রক্ত মাংসে গড়া নশ্বর দেহের পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া তোমার কি দুর্দ্দশাই না ঘটিয়াছে! সুন্দরি! একটুকু অনন্তের দিকে চাও,—একটুকু সৃষ্টি প্রণয়ের দিকে কটাক্ষপাত কর। তোমার রূপের গৌরব চূর্ণ হইয়া যাক্। যৌবনের দেমাক ভাঙ্গিয়া চূরিয়া অনন্তের গায় মিশিয়া পড়ুক।

ও ভাই মহাবলী,—তোমার বলের ওজন লইবার জন্য আর দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করিওনা। একটী বার অনন্তের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াও, বুঝিবে তোমার বল কত?

হরি হরি!! মানুষ! তুমি অনন্ত বিশ্বক্ষেত্রের কোন্ কোণে বসিয়া এত আস্পর্দ্ধা করিতেছ বুঝ কি? হায় হায়! সামান্য স্বার্থের জন্য পরের মাথায় বাড়ী দিতে, পরের সর্ব্বনাশ করিতে তুমি এক বিন্দু লজ্জা বোধ করনা। প্রকৃতি চক্রের নিষ্পেষণে তোমার যথা সর্ব্বস্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে বিধ্বংস হইয়া যাইবে বলিয়াও আর তোমার বিবেচনায় আসিতেছেনা! তুমি কেবল জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি দেখিতেছ,—লয় দেখিতেছনা?

এইরূপে কতক্ষণ মর জগতের ভাব গতিক চিন্তা করিতে করিতে আবার সেই ঘাসের উপর আসিয়া বসিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,—এই বিপুল বিশ্ব-রাজ্যের স্রষ্টা কে? এই অনন্তের অধিনায়ক কে? সে কোথায়? আঃ! মরি মরি!! এখন কি অনন্তের চিন্তা করিব, না সেই অনন্ত স্রষ্টার চিন্তাই করিব? হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

এখন মনে ভাবিতেছি, হায়রে!—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তার অপার মহিমার কথা চিন্তা না করিয়া,—তাঁহার ভুবনারাধ্য পাদ-পদ্মে আত্মোৎসর্গ না করিয়া এতদিন আমি কি ছাই ভস্ম করিলাম! মানব জন্ম ধারণ করিয়া কেবল পশুর মত আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদির বশীভূত হইয়া, সময় কর্ত্তন করিলাম। এত সাধের মানব জীবনটাকে মাটি করিয়া দিলাম। এক বারও এই অনন্ত বিশ্বের সৃজন, পালন, ও লয় কর্ত্তার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময় লীলা চরিত্রের অনুসন্ধান লইতে মনকে নিযুক্ত করিতে পারিলামনা। হরিবোল!—সে কে? এই নিখিল বিশ্বের রচয়িতা, অনন্ত জীবের আহার দাতা রক্ষা কর্ত্তা সে কে? সে কোথায়?

হায়! আমি একবিন্দু জ্ঞান কণিকা লইয়া,—শাস্ত্রবুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র জীব হইয়া সেই অনন্তেশ্বরের তত্ত্ব লইব কেমনে? তাঁহার নাম কি? অনন্ত স্রষ্টার নামও তো অনন্ত! তবে আমি কোন্ নামে ডাকিব? "অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।" অর্থাৎ অনন্ত, অন্ত না পাইয়া "অনন্ত" নাম রাখিল। আমি তাঁরে কোন্ নামে ডাকিব! কৃষ্ণ, রাম, হরি, গৌর, গোবিন্দ, কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি তাঁহার অসংখ্য নাম। এখন কোন্ নাম ধরি আর কোন্ নামটাই বা ছাড়ি!! সকল নামেগুলিই মধুমাখা। কিছুই যে স্থির করিতে পারিতেছিনা।

আবার ভাবিতেছি,—তিনি কি স্বয়ংই এই বিপুল বিশ্বের রচক, না তাঁহার কোন শক্তি কণিকার প্রভাবে এই জগৎযন্ত্র সৃষ্ট হইয়া পরিচালিত হইতেছে?

ক্রমশঃ—শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

রাধাষ্টমী।

—:০:—

সিন্ধু খাম্বাজ তাল যৎ।

এস সবে দেখ্‌তে যাই।
বৃকভানু রাজপুরে এত আলো কেন ভাই ॥
কালো রূপে করে আলো, এই জানি চিরকাল।
এমন রূপ কোথা ছিল, আহা বলিহারি যাই ॥
আহা মরি কি রূপরাশি, শীতল করে প্রাণ পিপাসী।
(পাছে) ঢাকা পড়ে কালশশী, (আমি) মনে মনে ভাবি তাই ॥
হয়েছে কন্যা সন্তান, বলিছে তনয় রতন,
বিনা সেই নীলরতন, (আর) রতন ব'লে জানি নাই ॥
গঠনের কি মাধুরী, নয়ন পালটিতে নারি,
(এবে) পেয়ে সবে প্রেমের হরি, কি করেন আজ দেখতে চাই ॥
চরণে কত চিহ্ন বাঁকা, দেখলে মনে হয় সেই বাঁকা।
ভাগ্যের থাকেনা লেখা জোকা, যদি আমি ঐ চরণ পাই ॥
কাল ভেবে প্রাণ গেল, এখন হ'লাম সুশীতল।
হৃদকমলে পাব সেই কাল, যদি দয়া করেন প্রেমময়ী ॥
তনয়া সুন্দরী হ'ল, নয়ন কেন না খুলিল।
বিষাদিত সবে বল, আনন্দ প্রাণে কার নাই ॥
শুন ওলো রাজরাণী, কন্যা তোর কৃষ্ণমোহিনী।
চাহিবেন তখন ধনী, (যখন) আসিবেন তাঁর প্রাণ কানাই ?
নয়ন মুদে শ্যাম হেরিছ, হরিদাসের উপায় কি করেছ ॥
কৃপা দৃষ্টি না করিছ, প্রাণেতে আর বাঁচি কই।
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে, ভাস সবে প্রেম হিল্লোলে ॥
রাধারাণীর দয়া হ'লে, জুড়াবে প্রাণে সবাই ॥

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

আমি কে?

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই বিনশ্বর দেহের সুখ দুঃখ কেন আসে কেন যায় ইহার কি কোন হেতু নাই, না ইহা আপনার স্বভাবে হইয়া থাকে। কণ্টকে যে তীক্ষ্ণতা উৎপন্ন হয় উহাতো শান দ্বারা করা হয় না। উহা যেমন তাহার নিজের স্বভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ যদি এই শুক্র শোণিত সঞ্জাত অন্নাদির রস সংপুষ্ট দেহের নিজের স্বভাবে সুখ দুঃখের উৎপত্তি বলা হয়, তাহা হইলেই বুঝিব কেমন করিয়া, যাঁহারা "অকস্মাদেব ভবতি নকিঞ্চিদপেক্ষং কার্য্যং" একথা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের এই আকস্মিক শব্দের কি অর্থবোধ করিব, যদি কারণ পরিহার করিয়া কেবল স্বভাব মাত্রই আকস্মিক শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে এই সসীম বিচিত্র জগতে আকস্মিক উৎপন্নের সম্ভাবনা কোথায়? যে স্বভাব হইতে উৎপন্নের কথা বলিতেছ ঐ স্বভাব কি? উহা যদি উপাদানের ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে আমার দেহে যে উপাদান আছে অপরের দেহেও সেই উপদান বর্ত্তমান, তবে কার্য্যের তারতম্য হয় কেন? যে মৃত্তিকাতে আম্র বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে সেই মৃত্তিকাতে জম্বীর বৃক্ষের উদ্ভব হয় কেন? এক মৃত্তিকা এমন বিষম স্বভাব কিরূপে ধারণ করে, এবং ঐ স্বভাব এক কিম্বা বহু, যদি স্বভাব এক হয়, তাহা হইলে জলের শীতত্ব অগ্নিতে সংক্রমিত হয় না কেন এবং অগ্নির উষ্ণতা জলেই বা আইসেনা কেন? অথবা জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক কার্য্যের যদি পৃথক পৃথক স্বভাব স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও এই সমস্ত বিশ্বের অনন্ত কার্য্যের ও জীবের জন্য অনন্ত স্বভাব স্বীকার করিতে হয়। এই সমস্ত স্বভাব স্বীকারে বিষম গৌরব ও অসমাবস্থা আপতিত হয়। সুতরাং স্বভাব কিপ্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে। এবং এই জগতের আস্বাদাদি কৃত কার্য্যে পরস্পরকে যখন কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় তখন কার্য্য কারণ ভাবকেই বা পরিত্যাগ করি কি করিয়া। যদ্যপি ঘটপটাদি কার্য্যের কারণ থাকিলেও অদৃশ্য সুখ দুঃখাদির কারণ নাই বলা হয়, তাহারও সম্ভব হয় না, কারণ দৃশ্য বস্তুর স্বীকার ও

অদৃশ্য বস্তু পরিহারে অদৃশ্য বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে গৃহ বহির্গত আমার তৎকালীন অদৃশ্য পুত্রাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে এখন আমার দুঃখের কারণ কি? ইহার কি সীমা নাই? আমি কি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতেই থাকিব, পাপ বা পুণ্য বলিয়া কি কোন পদার্থ আছে? আমি কি মহাপাপ করিয়াছিলাম যাহার ফলে 'আমার দুঃখের পর দুঃখই ভোগ করিয়া যাইতে হইতেছে।

কৈ ভাইবা কবে করিলাম, আমার বাল্য জীবনের যে কাল হইতে স্মৃতি জাগরিত আছে, তাহার মধ্যেতো আমি কোন অসৎকর্ম্ম করি নাই, তবে আমার এদুঃখ ভোগের হেতুভূত কারণ সমূদয় কোথা হইতে আসিল! এবং কেনইবা আমার সুখময় জীবন পথে কণ্টক হইয়া নিরন্তর অতৃপ্তির তীব্র জ্বালায় দাহ করিতেছে, সে নিরন্তর আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে আমায় লইয়া যাইতেছে, সুখের বদলে দুঃখই প্রদান করিতেছে, তবে কি এ দৃষ্ট দেহ হইতে অতিরিক্ত কিছু আছে, ঐ অদৃশ্য বস্তুকে কি অদৃষ্ট আখ্যায় অভিহিত করা হয়, তাহাই যদি হইল তবে অদৃষ্টই বা আমায় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ ভোগ করায় কেন, ঐ অদৃষ্ট কোথা হইতে আসিল। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এজীবনের স্মৃতি কালের মধ্যে কোন পাপ তো করি নাই, তবে কি অজ্ঞান অবস্থায় অতি শৈশবে কোন অসৎ কর্ম্ম করিয়াছিলাম যাহার ফলে জীবন ব্যাপী দুঃখ আসিল তাহারও তো সম্ভব হয় না, বাল্যে এমন কিছু করি নাই, ঐ কার্য্যের বা ঐ কর্ম্মের অনুপাতে জীবনব্যাপী দুঃখ আসিতে পারে না, তবে এ অদৃষ্ট কোথা হইতে আসিল। মাতৃ-গর্ভে উৎপন্ন হইলাম, কাল পূর্ণে ভূমিষ্ঠ হইলাম, যত্নে লালিত হইলাম, বিদ্যাভ্যাস করিলাম, দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারের বিচিত্র কার্য্যের সহিত সম্মিলিত হইলাম, ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল শরীর শিথিল হইল দেহ অবসন্ন হইল দেহের চৈতন্য লোপ হইল, তখন সকলে দেহকে মৃত আখ্যায় অবিহিত করিয়া উহাকে ত্যাগ করিল জগতের সহিত যাহাদিগকে আত্মীয় স্বজন বলিয়া জানিতাম তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইল, ঐ চেতনা শূন্য দেহের ত্রিবিধ পরিণাম হইল, কোথাও অগ্নি সংযোগে দেহকে ভস্মে পরিণত করিল। কোথাও মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া দেহ গলিত হইয়া কৃমিতে পরিণত হইল আবার ইহার অভাবে পশাদি দ্বারা ভক্ষিত হইয়া দেহ বিষ্ঠায় পরিণত হইল একপ্রকারে বিবদৃশ

পরিণাম দেহের জন্ম কেন লালায়িত হই, কেনই বা এ দেহকে আমার বলিয়া যত্ন করি, কেনইবা দেহের সুখের জন্য ব্যস্ত থাকি। কিন্তু দেহের যদি এই পরিণাম, তখন অদৃষ্ট কোথা হইতে আসিল, এ দেহে অদৃষ্টের সম্ভব কি করিয়া হইতে পারে? অদৃষ্ট কি নিরালম্বে উৎপন্ন হয়, তাহাইবা কেমন করিয়া হয় অদৃষ্ট যদি সৎ অর্থাৎ কর্ম্মের ফল জন্য হয়, তবে উহা ধর্ম্ম বিশেষ, ধর্ম্মতো ধর্ম্মীকে অপেক্ষা করিবেই, তবে কি আমার স্বরূপ বলিতে আর কিছু আছে? অদৃষ্টের আধার এই দৃষ্ট দেহ হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু কি আমার বলিবার আছে? কারণ দেহাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, এমন বৈষম্য দোষ কেন, আমার দেহ সবল পুষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু হটাৎ দেহের চৈতন্য চলিয়া গেল, দেহ মৃত হইল, আর যে অশীতিপর বৃদ্ধ জরাজীর্ণ বিশীর্ণ দেহ কোনরূপে যষ্টি অবলম্বনে দাঁড়াইতে সক্ষম হইতেছে তাহার দেহে ও চৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং অদৃষ্টের আধার ভূত চৈতন্য স্বরূপ কোন বস্তু যে আছে তাহা এই দেহে আসে বা সময়ে অপসারিত হইয়া যায় তাহা বলিতেই হইবে, নচেৎ ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র স্তনপানের সংস্কার কোথা হইতে আসিল কেহ তো তখন শিক্ষা প্রদান করে নাই, দেহ তৎপূর্ব্ব-ক্ষণে মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, উহাকে দেহের সংস্কার বলা যাইতেই পারে না। সুতরাং অদৃষ্টের ও সংস্কারের আশ্রয়ীভূত চেতন কোন বস্তু যে আমার বলিতে আছে তাহা দেখা যাইতেছে সেই বস্তুটী কি? ঐ বস্তু কি দেহের সহিত নষ্ট হয়, না উহা দেহের মধ্যে আসে আবার চলিয়া যায়, উহা কি তাড়িৎ শক্তির ন্যায় বস্তুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, আবার বিশ্লেষণে অপসারিত হয় এমন বস্তুই বা কি? এবং তাহা হইলেই বা উহাতে সুখ দুঃখ ভোগের নিদান ভূত অদৃষ্টের সম্ভবই বা কিরূপে হইতে পারে। তবে ঐ বস্তুটী কি উহার স্বরূপ কি? উহা কি আত্মা? আত্মা কাহাকে বলে যাহা ব্যাপক বস্তু উহাই আত্মা; দেহত ক্ষুদ্র তাহার অভ্যন্তরে যাহা অবস্থান করে উহা ব্যাপক কিরূপে হইবে, তবে আমি কে আমার স্বরূপের কি কোন নিশ্চয়তা নাই, আমি কি একটা অনির্দ্দিষ্ট দুঃখ ভোগকারী মাত্র, না আমি সেই ব্যাপক আত্মার অংশ, ব্যাপক আত্মা কি ক্ষুদ্র হইতে পারেন না, শাস্ত্র তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ বলিয়া থাকেন, তবে কি তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকার

ধারণ করিয়া আমাদিগের শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন তাহা হইলে ব্যাপক ব্রহ্ম চলেন। তবে আমি কে আমার স্বরূপ কি? আত্মা তো জন্মেন মরেণওনা, কিন্তু আমি মরি ও জন্মাইয়া থাকি, ব্যাপক আত্মা কেন আমার জন্ম মরণের দুঃখ ভাগী হইবেন। তিনি কেন অশ্মৎ শরীরে আসিবেন আমার শরীর বলিয়া কোন বস্তুই নাই এ সমুদায় অজ্ঞান, অজ্ঞান বশে আমি ও আমার ভ্রম মাত্র আমার দেহ কিছুই নহে এ প্রপঞ্চের খেলা জগতে কিছুই নাই কেবল মাত্র সেই ব্যাপক আত্মাই আছেন আমরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে না দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমি ও আমার বলিয়া ক্রমিক দুঃখ ভোগ করিতেছি, যখন পরব্রহ্ম স্বরূপ আমার অজ্ঞান জন্যই সংসার অজ্ঞানে আবৃত হইয়া আমি আমার স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা, সূর্য্য প্রকাশমান থাকিলেও যেমন মেঘমধ্য ব্যবধান হওয়ায় আমার চক্ষু সূর্য্যের দর্শনে অক্ষম হইলে সূর্য্য মেঘাবৃত হইয়াছেন বলিয়া থাকি কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হন না ভিন্ন দেশীয় দ্রষ্টা তৎকালীন সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পরব্রহ্ম স্বরূপ আমি আমার জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ সকলই অজ্ঞানের কার্য্য, সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আবার আমার নিজের স্বরূপে অবস্থিত হইবে। যেমন কোন ব্যক্তির অন্ধকার গৃহভ্যন্তরে পতিত রজ্জুখণ্ড দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে এবং যেকাল পর্য্যন্ত সেই ভ্রম বিদূরিত না হয় সেকাল পর্য্যন্ত সে সেই গৃহস্থিত সর্প জন্য নানাবিধ আশঙ্কার কল্পনা করিয়া ক্রমিক ভীতি বিজড়িত হইয়া নানাবিধ কষ্টের অনুভব করিতে থাকে, কিন্তু যৎকালে আলোকের সাহায্যে সেই ভ্রম বিদূরিত হয় তৎকালেই তাহার তাবৎ কষ্টের অবসান হইয়া থাকে। তদ্রূপ কোন প্রকারে অজ্ঞান অপসারিত হইলেই সুখ-দুঃখ জন্ম মৃত্যু আদি করিয়া যাবৎ কিছু ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া সেই পরব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী।

জন্মাষ্টমী।

— :০: —

জন্মাষ্টমী তিথিরাজে যশোদা কোলে বিরাজে
জগতের জীবনের জীবন।
সেরূপ মাধুরী হেরে ভাসেন সুখ সাগরে
নন্দরাণী অতি হৃষ্ট মন॥
কিবা নীলোৎপল আভা গৃহ করিয়াছে শোভা
মুখে হাসি বিদ্যুত ঝলক।
মা যশোদা আনন্দিত সুত হেরি পুলকিত
দুনয়নে নাহিক পলক॥
স্নেহে স্তনে ক্ষীর ক্ষরে তুলি দেন সে অধরে
পান করান প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে।
দুনয়নে প্রেমধার বহে মাতার অনিবার
জ্ঞান শূন্যা পুত্র কোলে ল'য়ে॥
বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা মা যশোদার ভক্তি নিষ্ঠা
কোথা নাহি দেখি যে এমন।
কি তপস্যা করেছিলে যে পুণ্যে এ পুত্র পেলে
কিবা কৈলে মঙ্গলাচরণ॥
তব স্নেহে অবতরি জগতের প্রাণ হরি
জগতের কৈলা পরিত্রাণ।
যেই তব অঙ্কগত যোগীজন শত শত
তাঁরে সদা সঁপিছে পরাণ॥
রাতুল চরণ তল কোটী চন্দ্র সুশীতল
রক্তপদ্ম জিনি তার শোভা।
সুবর্ণ নুপুর সাজে রতনে খচিত, বাজে
রুনু ঝুনু মুনি মন লোভা॥

---

* বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় ভাদ্রমাসে প্রকাশের সুবিধা হয় নাই॥ "ভক্তি সং।"

কটি-তটে কিঙ্কিনী জলদে তড়িত জিনি
শোভা করে কি সুন্দর হায়।
করপদ্ম পদ্মবর্ণ অরুণাভাযুত স্বর্ণ
মণিময় বলয় শোভে তায়॥
বাহুতে অনন্ত রাজে ক্ষীর সাগরের মাঝে
বিষ্ণু যেন অনন্তে বেষ্টিত।
নীল বক্ষে রত্ন হার নীলাকাশে তারা হার
মুখ চন্দ্রে করেছে বেষ্টিত॥
প্রস্ফুটিত পঙ্কানন পদ্ম পত্র দুনয়ন
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভা পায়।
তাহে শোভে হাসি রাশী জিনি কোটী পূর্ণ শশী
অলকা তিলকা শোভে তায়॥
তাহে কুঞ্চিত কুন্তল গণ্ড স্থলে ঝল্ ঝল্
মুখ শোভা বাড়ে চমৎকার।
কেশ গুছাইয়া আনি চূড়া বান্ধে নন্দরাণী
শিখি পুচ্ছ দেন মাঝে তার॥
কোলেতে করি নন্দন দেন শত চুম্বন
সহস্রেক করেন যতন।
দেখরে জগৎবাসী নন্দের আগয়ে আসি
প্রকাশিল গোলকের ধন॥
জয় জয় বৃন্দাবন জয় যশোদা নন্দন
জয় জয় নন্দ নন্দরাণী!
জয় ব্রজবালাগণ তোমাদেরই প্রেম ধন
কৃষ্ণ প্রেমে তোমরাই ধনী॥

শ্রীঅনাদিনাথ দে।

শ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১১শ বর্ষ	অগ্রহায়ণ মাস। ১৩১৯ সাল	৪র্থ সংখ্যা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

"দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক! প্রকামম্।
অবধীরিত শারদার বিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥"

হে শমন-ভয়-নাশন শ্রীহরে! স্বর্গে অথবা মর্ত্ত্যে এমন কি দুরন্ত কুম্ভিপাক নরকেও যদি আমার বসতি হয় তাহাতেও দুঃখ নাই, যেখানেই যাইনা কেন, তোমার যে রাতুল চরণের নখ-কীরণ শরতের শত শত চন্দ্রমাকেও তিরস্কার করে সেই চরণ কমলে যেন ঐকান্তিক ভক্তি থাকে ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

হে কালরূপিন্! পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই যে নিমেষাবধি করিয়া বৎসরান্ত কাল পর্য্যন্ত, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর গত হইতেছে, ইহাতো তোমারই ইচ্ছা শক্তি, আর তুমিইতো এই ইচ্ছা শক্তি দ্বারা কালের পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের এই পাঞ্চভৌতিক দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের নানা প্রকারে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, কখন ভাব, কখন অভাব, কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন আনন্দ কখনও বা নিরানন্দ উপভোগ করাইয়া জগতের নশ্বরতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছ। যে ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নরনারী তোমারই করুণাবলে সৎসঙ্গ লাভে ধন্য হইয়া জগতের কোন বস্তুতেই অত্যাসক্ত না হইয়া যে শক্তিময়ের অপার শক্তি বলে এই জগত চালিত, যে পালনী শক্তিতে জগত প্রতিপালিত হইতেছে সেই মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা যে তুমি, তোমার প্রতি অকপট ভক্তি স্থাপন করিয়া, তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব তোমার বিশ্বনিয়ন্তৃত্ব বিশেষভাবে অবগত হইতে পারেন তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ,—তাঁহারই জীবন সার্থক।

হে ভগবন্! মোহ মদিরা পানে মত্ত হইয়া এমন দেব-দুর্লভ মনুষ্য জীবনের সুদীর্ঘকাল যে তোমাকে ভুলিয়া, তোমার ভাবে বঞ্চিত থাকিয়া নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছি, ইহার কি পরিবর্ত্তন করিবেনা? জগতের প্রত্যেক বস্তুরই যখন পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছ এমন কি জগতই যখন পরিবর্ত্তনশীল তখন আমার এই অসদ্‌ভাবের পরিবর্ত্তন কেন ঘটাইবেনা? পাপের পরিবর্ত্তে তোমার সমুজ্জ্বল পুণ্যময়ভাব, দুঃখের পরিবর্ত্তে তোমার অবিমিশ্র সুখ, অভাবের পরিবর্ত্তে -অশান্তির পরিবর্ত্তে তোমার প্রেমপূর্ণ আনন্দময় শান্তিপ্রদ ভাব প্রদান কেন করিবেনা? প্রভো! দুর্দান্ত বিষয়াসক্ত চঞ্চল মনকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া আনন্দঘন ভাব লাভে কৃতার্থ হইব এমন দিনকি জীবনে হইবেনা? সারাটা জীবনই কি আমার অজ্ঞানান্ধকারে মায়ার দাসত্ব করিয়া কাটিবে, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার অজ্ঞানভাব আমার বিষয়াশক্তি আমার ইন্দ্রিয় পরতার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দাও। হে কৃষ্ণ! হে সঙ্কর্ষণ! কালের গতির সহিত উহাদিগের গতিও পরিবর্ত্তন করাইয়া তোমার পাদপদ্মের দিকে টানিয়া লও। আমার এই ঘোর অজ্ঞানের পরিবর্ত্তে তোমার আনন্দপূর্ণ অমৃতোপম জ্ঞানদান কর, আমার এই ঘৃণ্যবিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে জগন্মঙ্গল তোমার মধুর নামে আসক্তি জন্মাইয়া দাও, আমার চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের অনিত্য কামনাপূর্ণভাব সকল দূর করিয়া তোমার ভুবন ভুলান আনন্দকন্দ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি দর্শনের লালসা বৃদ্ধি করিয়া দাও। আমার হৃদয়স্থিত যাবতীয় অভাবেরই অভাব হউক।

নাথ! আর কতদিন। কতদিন আর তোমার দর্শন সুখে বঞ্চিত থাকিব, আর তো পারিনা! দয়া করিয়া একবার দেখা দাও। প্রভো আমিতো তোমারই; ত্রিজগত সংসারে আমার বলিতে তোমার ন্যায় প্রকৃত প্রাণের বন্ধু আর কে আছে? আমাকে প্রেমদানে কৃতার্থ করিয়া আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখ, আমি তোমার কৃপায় সংসারের পাপতাপ জ্বালা যন্ত্রণা অভাব অশান্তি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া প্রেমভরে প্রাণখুলিয়া তোমার নামের জয় দিয়া বেড়াই। আর ভুলাইয়া রাখিওনা প্রভো! আজ দীনের এইটীই প্রার্থনা।

"বল আর কতদিন এম্‌নি ক'রে;
আমি দেখিবনা প্রাণ ভ'রে॥

থাকিয়া থাকিয়া তোমারে দেখিয়া
মনের সাধ মেটেনা;—
তাই দাও দরশন হে মনোমোহন
আমার বাহিরে হৃদয় মাঝারে॥

পরের মতন থাকিব ক'দিন
আসিয়া তোমার সংসারে;—
তাই প্রাণনাথ কর আত্মসাৎ
আমায় রাখ হে আপন ক'রে॥

আপনা ভেবেছি প্রাণ স'পেছি
আমি তোমার হয়েছি দেখনা;—
আমার তোমারি মতন এমন আপন
নাহিক ত্রিজগ মাঝারে॥

অন্ধের মতন সারাটী জীবন
ঘুরে ঘুরে মরি বাহিরে;—
ওহে প্রাণগোবিন্দ দাও প্রেমানন্দ
আমি ডুবিব আনন্দ নীরে॥

সকল ভুলিব তোমারে ভাবিব
সে দিন পাইব কবে;—

আমি কাহার বারণ আর শুনিবনা
তোমায় রাখিব হৃদয় মাঝারে ॥
দুঃখ দাও প্রভো সহিয়ে আমি
(তবু) ভাবি যেন সদা তোমারে ;—
(ভবে) আসি যাই প্রভো তাতে দুঃখ নাই
পাই যেন সদা তোমারে ॥"

দীনহীন—দীনেশচন্দ্র শর্ম্মা।

বৃন্দাবন ভ্রমণ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপ আব্দার চলিতেছে এমন সময় দর্শকগণের অতৃপ্তি হইতে না হইতেই আরতি সমাপন হইল আর ঝাঁ করিয়া পরদা আসিয়া সকলের নয়ন মন হইতে শ্রীরাধা গোবিন্দকে সরাইয়া লইয়া গেল মনে বেদনা লাগিল অনঙ্গ দাদাতো পূজারির উপর বেজায় চটীয়া গেলেন। তখনও নাট মন্দিরে কয়েক জন উচ্ছ্বাসের সহিত আরতি কীর্ত্তন করিতেছিলেন, আমি করতাল লইয়া তাঁহাদের সহিত যোগদিলাম। শ্রীতুলসী আরতি হইতেছিল আর বৃন্দাজী পরিক্রমা হইতেছিল। আমিও কৃতজ্ঞ প্রাণে পরমানন্দে সেই কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম ; আর বৃন্দা মহারাণীর অধিকতর কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। "যে তোমার শরণ লয়, তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কৃপা করি কর তাঁরে বৃন্দাবনবাসী "এই চরণটী বড়ই মিঠা লাগিতে লাগিল। মনে হইল এইত সুযোগ ; ইহা ছাড়া হইবেনা। মহামহিমাময়ীর অপূর্ব্ব কৃপা মহিমায় ঠিক এই সময়ে এক অপূর্ব্ব ঘটনার সম্পাত হইল। চিরাভিপ্সীত নিকুঞ্জ বিলাসের এক চিত্র আসিয়া মনোনেত্রকে আকর্ষণ করিল। নয়ন মনাভিরাম মধুর নিকুঞ্জে রসবতী রুক্মিণীগণ দামোদর-রতিবর্দ্ধনবেশে সজ্জিত হইয়া আছেন, প্রিয় সঙ্গিণীগণ ব্রজ নব যুবদ্বন্দকে

বেড়িয়া নানাবিধ রঙ্গরস করিতেছেন, হাস্য পরিহাসের প্রস্রবন ছুটিয়াছে। যুগল কিশোর কিশোরীকে লইয়া ব্রজ নব যুবতীরা দ্যূত ক্রীড়ায় মাতিয়াছেন। কুন্দলতা প্রভৃতি কয়েক জন কৃষ্ণ পক্ষে, আর বিশাখাদি বহু সঙ্গিণী শ্রীরাধার পক্ষে। জয় পরাজয় লইয়া উভয় পক্ষে খুব বচসা চলিতেছে কিন্তু ললিতা দেবীর মুখের কাছে কেহই লাগিতেছে না। চতুরিণী ললিতা চতুর কানাইকে আজ নানা রকমে লাঞ্ছিত করিতে ছিলেন। শেষে নাগরেন্দ্র চূড়ামণি চতুর শেখরের ইচ্ছায় উভয় পক্ষেই কণ্ঠহার পণ রহিল। যুগপৎ উভয় পক্ষ হইতে অচিরে জয়োল্লাস সমুত্থিত হইল; "জয় রাধার জয়, জয় শ্যামের জয়" ধ্বনিতে কুঞ্জবন মুখরিত হইয়া উঠিল। বিদগ্ধ নাগর বল পূর্ব্বক রাধারাণীর কণ্ঠহার অধিকার করিয়া বসিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর ইষ্ট দর্শনের কথা মনে পড়িল।* সেই অপূর্ব্ব মধুর লীলারস তরঙ্গ উচ্ছ্বাসিত হইয়া যেন সমগ্র বৃন্দাবন ভাসাইয়া দিতেছে। আত্মহারা লীলা মুগ্ধ আমরাও সে দলে পড়িয়া "জয় রাধে জয়" গাহিতেছি আর পুলকে পুরিতঅঙ্গে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত অঙ্কে প্রেমানন্দে গড়াগড়ি দিতেছি; এমন অপূর্ব্ব মধুর আনন্দ জীবনে পাইনাই আর কখনও পাইব কিনা তাহা সেই আনন্দময়ী শ্রীরাধারাণীই জানেন।

এই খানেই সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া সকলে † "জয় রাধে জয়" গাহিতে

* পণীকৃত মিতোহার লুণ্ঠন ব্যগ্র হস্তয়োঃ
কলিং দ্যূত বিনোকিষ্যে কদা বদ জিতকাশিনোঃ।

† জয় রাধে জয়, ও দুই বাহু তুলি আনন্দে গাওরে
জয় রাধে জয় বলি, মন প্রাণ কর সরল রে।
ও তোর পাপতাপ যাবে দূরে হইবি শীতল রে ॥
জয় রাধে জয় বলে গোরা আমার প'লো ঢলে রে।
সর্ব্বশক্তিমান গোরা (রাধা) প্রেমে ভেসে যায় রে ॥
(আবার) রাধে দয়া কর বলে, নিতাই প'লো ঢলে রে।
অনন্ত শকতি নিতাই হাবু ডুবু খায় রে ॥
রাধে জয় জয় বলে সদানন্দ (সীতানাথ) হুহুঙ্কারে রে।
পাগল খেপিয়া বুঝি (প্রেমে) জগত ভাসায় রে ॥

গাহিতে পূর্ণ মনোরথ হইয়া ভোমরাসি কুঞ্জে ফিরিলাম। পরম দয়াবতী প্রেমময়ী রাধা রাণীর করুণা আর কি বলিব।

কি আর বলিব তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম পামরে চড়াইল উর্দ্ধ সীমা॥
বেদ গুহ্য কথা এই অযোগ্য লিখিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।
জয় রাধা রাণী মোর ক্ষম অপরাধ॥

শ্রীগোবিন্দ জীউর প্রাকট্য বিবরণ।

যখন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন মায়াদেবী বেগতিক দেখিয়া অতিদূরে সরিয়া থাকেন, কিন্তু অবতারের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রবল প্রতাপে আসিয়া আবার বেদখলী রাজ্য দখল করিয়া বসেন। দেখিতে দেখিতে নানা প্রকার ধর্ম্ম বিপ্লব, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, উপধর্ম্মাদি উদ্ভব হইয়া দেশকে পুনরায় ঘোর মোহান্ধকারে ডুবাইয়া ফেলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অসুরের উপদ্রব খুব বাড়িয়া উঠে। কাজেই, কীর্ত্তিলোপ, তীর্থনাশ, এবং শ্রীবিগ্রহের অপ্রকটতা সংঘটিত হয়। কালক্রমে চিন্ময় কৃষ্ণলীলা-ভূমি শ্রীবৃন্দাবনের অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। অসুরের উপদ্রবে লীলাস্থলী বা শ্রীবিগ্রহাদির কোন চিহ্নই ছিলনা কাজেই শ্রীবৃন্দাবন বিহারী শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন কে আবার নিজে আসিয়া নিজের কীর্ত্তি কলাপকে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যাবতারের ইহাই একটী মুখ্য উদ্দেশ্য; লোকপাবন পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন সমস্ত কীর্ত্তি লুপ্ত, সমস্ত বিগ্রহ লোক নয়নের অগোচর, তখন তিনি তাঁহার দুইজন প্রধান পারিষদকে কৃপা শক্তি সঞ্চার করিয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার জন্য শ্রীধামে পাঠাইলেন,—

ব্রহ্ম হরিদাস এল রাধাপ্রেমে ভাসিগেল রে।
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে সবে (রাধা) প্রেমেতে ডুবায় রে॥
দেবর্ষি নারদ (শ্রীবাস) আসি রাধাপ্রেমে গেল ভাসি রে।
বীণার ঝঙ্কারে কেবল রাধা গুণ গায় রে॥

কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

কালক্রমে বৃন্দাবন মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হওয়ায় তাহা পুনরায় আবিষ্কার জন্য শ্রীমন্ গৌরাঙ্গদেব শ্রীরূপ সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়া তথায় পাঠাইয়া ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীল গোবিন্দদেব মৃত্তিকা গর্ভে একটী টিলার মধ্যে অপ্রকট ছিলেন, সেথায় লতা গুল্ম জঙ্গল হইয়াছিল। প্রত্যহ একটী কাম ধেনু ঐ টিলার উপরে যাইয়া ক্ষীর প্রদান করিত, তাহার স্তন ক্ষীরে শ্রীগোবিন্দের সেবা হইত। গৌড়-নবাবের দবির খাষ যখন স্কন্ধে ঝুলি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে কিএক অপূর্ব্ব বস্তুর লোভে হরিনাম করিয়া বেড়ান আর মহাপ্রভুর কৃপাদেশে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, যখন—

অনিকেতন দোঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থুল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চাবনা চাবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অর্দ্ধ প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নাম সংকীর্ত্তনে সেহ নহে কোন দিনে॥

১৪৪৪ শকে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের এই খেলা আরম্ভ হইল।

ভক্তেচ্ছায় ইচ্ছাময়ের আবার স্ব প্রকাশ হইবার ইচ্ছা হইল। তাই একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী স্বপ্নাবেশে দর্শন করিলেন যে শ্রীগোবিন্দ দেব অপূর্ব্ব মাধুরী বিস্তার করিয়া বলিতেছেন,—

শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞাদিলা শ্রীমদ্রূপেরে।
যোগ পীঠে হই গুপ্ত মৃত্তিকা ভিতরে॥

এক গাউনিতি আসি দাণ্ডায় যথায়।
স্তনহৈতে দুগ্ধক্ষরে আমার মাথায়॥
মোরে লক্ষ্য করি সেই স্থান যে খুদিয়া।
উঠাও আমারে সেব তথাই স্থাপিয়া॥ ভক্তমাল॥

প্রভাতে এই আনন্দ বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। মহামান্য ছোট গোসাঞি স্থান নিরূপন করিয়া দিলেন, গ্রাম্য লোকদিগকে লইয়া জঙ্গল কাটিয়া সাবধানে মৃত্তিকা খনন করিতে থাকিলেন। চারিদিকে নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইল নব জলধরের দর্শন আশে পিপাসিত চাতকের ন্যায় দুই গোস্বামী পলক বিহীন নেত্রে তাকাইয়া আছেন। হঠাৎ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল লীলা বিহারী শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীল গোবিন্দদেব সপরিকরে যোগপীঠে সমাসীন অবস্থায় প্রকাশ পাইলেন। শঙ্খ ঘণ্টা রোলে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত হইল। রত্ন বেদিকা পরি মার্জ্জিত করিয়া গোস্বামীরা অভিষেকাদি ক্রিয়া সমাধান করিলেন। ভুবন মোহনের অসমোর্দ্ধ রূপ লাবণ্যে শ্রীবৃন্দাবন আলোকিত হইয়া উঠিল। সুর নর কিন্নর শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের এই অপার কৃপায় বিমুগ্ধ হইল। চতুর্দ্দশ ভুবনে একতানে জয় গান উত্থিত হইল—

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন্।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর॥
যাঁর ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাশন।
অষ্টদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন॥
চৌদ্দ ভুবনে যাঁরে সবে করে ধ্যান্।
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর লীলা গুণগান॥

শ্রীরূপ গোস্বামির আজ আনন্দ ধরিতেছেনা, যে প্রাণ বল্লভের খোঁজে রাজ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ঝুলি কাঁথা লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের বনেবনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিলেন যে মধুর মাধুরী জন-নেত্রের গোচরীভূত করাইবার জন্য তিনি প্রভুপদে কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন আজ তাঁহার সেই চিরাভিপ্সীত চিন্তামনিরত্ন পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। সেই গোপী মনোচরা নটবর শ্যাম সুন্দরও পরম

প্রেষ্ঠালি প্রকট শ্রীরূপ মঞ্জরীকে নিকটে পাইয়া বুঝি একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন তাই তিন বৎসর পরেও শ্রীরূপ মঞ্জরী তদীয়া প্রিয় সখি গুণমঞ্জরীকে (শ্রীগোপাল ভট্ট) সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন হে সখি! "যদি তোমার স্বজন বন্ধুগণের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ও অনুরাগ থাকে তবে কেশিতীর্থ সমীপে কদাচ যাইওনা, যাইলেও তথায় অধর কিশলয়ে মোহন মুরলী ধরিয়া শিখিপুচ্ছ শিরোভূষণে বিভূষিত হইয়া ললিত ত্রিভঙ্গ বেশে গোবিন্দের যে ভুবন ভুলান মধুর হাস্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি রহিয়াছেন কদাচ তাঁহাকে দেখিওনা" ন্যুনাধিক ১৭শ বর্ষ পরে গৌর-প্রেমময়-তনু শ্রীলশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ঐ কোটী কন্দর্প লাঞ্ছিত অনুপম বদন মাধুরী দেখিয়া প্রেম গদ্গদ স্বরে গাহিয়াছেন আর বুঝিয়াছেন—

"কোন কুন্দারে কুন্দিলরে" ইত্যাদি।

মহৎ কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয় তাই সেই বৃন্দাবনে পুরন্দর শ্রীরাধা গোবিন্দকে আমি অধম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। সেই যোগপীঠস্থ কৃপাময়ের অলৌকিকরূপে প্রকট কালীন সেই অপার করুণার কথা যতই স্মৃতির পথে উদিত হইতেছিল ততই মধুর শ্রীমূর্ত্তি যেন আরো মধুরতর লাগিতেছিল উচ্ছ্বাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলাম "গোবিন্দ তুমি নাকি বৃন্দাবনের রাজা তোমাকে প্রণাম করি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও।" ইহাতে কি অপরাধ হইল জানিনা তম্মুহূর্ত্তে দুইটী পৌঢ়া ব্রজ যুবতী আসিয়া সুমিষ্ট কর্ণ মর্দ্দন দ্বারা আমার জ্ঞান জন্মাইয়া দিলেন। "বাপু হে গোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবনের রাজা নহেন, আমাদের শ্রীমতি রাধারাণীই শ্রীবৃন্দাবনের ঈশ্বরী।

গোবিন্দ নিজে থাকিয়াই শ্রীমতিকে রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন তা জান না? আবার অপরা রমণী নয়ন কোণে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন "জাননা গোবিন্দ যে এখানে কোটাল।" তাড়া খাইয়া আমিত একেবারে বেয়াকুব। মহাপরাধীর ন্যায় তটস্থ হইয়া শ্রীমতির উক্ত সঙ্গিনীদের প্রণত হইলাম, তাঁহারা হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। "রাধারাণীর কৃপা হউক।" মনের মত আশীর্ব্বাদ লাভে আমার সমধিক আনন্দ হইল। নিধুবনের লীলা কাহিনী মনে পড়িল এবং শ্রীবৃন্দাবনে রাজ্যাভিষেকের কথাও তখন স্মরণ হইল। আকাশ বাণীর আদেশে মহাযোগেশ্বরী পৌর্ণমাসী এই রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন

বটে। পৌর্ণমাসীর ইঙ্গিতে একানাংসা. সংজ্ঞা, ছায়া, গৌরী, গঙ্গা এই পঞ্চ দেবকন্যা ব্রাহ্মণী ইন্দ্রাণী প্রভৃতির নিকট হইতে কমল মালিকা, স্বর্ণ সিংহাসন রত্নালঙ্কার, স্বর্ণছত্র, চামর, পট্টবস্ত্রাদি লইয়া শ্রীবৃন্দারণ্যে সমুপস্থিত হইলেন। স্বর্গে দেবদেবী সমবেত হইলেন দেব দুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদের মধুরস্রাবিনী বীণা ধ্বনিতে সভামণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠীল। গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণগণ শ্রীরাধা মঙ্গল গাহিতে লাগিলেন। উর্ব্বসী, মেনকাদি স্বর্গের অপ্সরা নৃত্য করিতে লাগিল। বহুরত্ন খচিত পট্টবস্ত্র পরিহিতা শ্রীভানুকুল চন্দ্রমাকে রত্ন বেদীতে সমাসীনা করা হইল। তখন পঞ্চকন্যা আসিয়া মণিকুম্ভ হইতে দিব্যৌষধী রস দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। বাক্‌দেবী পৌরহিত্য করিলেন। অভিষেকান্তে স্বর্গ লক্ষ্মীগণের প্রেরিত দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া সকলে জয় ধ্বনি করিতে করিতে বিচিত্র রত্নসিংহাসনে শ্রমতীকে বিরাজিত লাগিলেন। পৌর্ণমাসী রাজ রাজেশ্বরীর সুচারু ললাটে রাজ চক্রবর্ত্তী লক্ষণান্বিত সুচারু তিলক রচনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রত্নালঙ্কার ভূষিতা অনিন্দ্য সুন্দরী শ্রীবৃন্দাবন রাণী আসিয়া রাজদণ্ড অর্পণ করিলেন। অমনি স্বর্ণ চামর হস্তে অতুলন রূপলাবন্যবতী ললিতা বিশাখা দুই পার্শ্বে ব্যজন আরম্ভ করিলেন, ইন্দুরেখা ছত্র ধারণ করিলেন অপরা সখিগণ নানাবিধ মঙ্গল বাদ্য করিতে লাগিলেন। এই রাজরাজেশ্বরীর দরবারে আমাদের ব্রজেন্দ্র নন্দন নাকি প্রথমে একেবারেই উপেক্ষিত হইয়া ছিলেন; শেষে বৃন্দারাণীর বিশেষ সুপারিষে দ্বিতীয় আদেশ সাপেক্ষে শ্রীবৃন্দাবণ রাজ্যাধিশ্বরীর মন্ত্রীত্ব পদ পাইলেন। (মাধবমিত্রসহায়াং বৃন্দাবণ রাজ্যাধিশ্বরীম্ অর্চ্চয়ামি।) কিন্তু আমরা বিশস্ত সূত্রে শুনিয়াছি শ্রীনন্দের দুলাল চাঁদের পৌণ্য পূণিক কার্য্য শিথিলতায় রাজ্যের অসৌষ্ঠব হইবার সূচনা হওয়ায় শ্রীমতী ললিতা দেবীর অভিযোগে তিনি মন্ত্রীত্ব পদ হইতে পদচ্যুত হইয়া ছিলেন, কিন্তু বিশাখা প্রভৃতি সকলের বিশেষ ধরা ধরিতে একণে কেটোলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাই স্বর্ণছড়ি হস্তে "রাধারাণীকি-জয়" বলিয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে ডাকিতে শুনি। সে চাকুরীতেও লাঞ্ছনা নাকি দিবারাত্র হইতেছে সুতরাং তাহাও যে কতদিন টিকিবে বলা যায়না। পূর্ব্ব কাহিনী স্মরণ হওয়ায় শ্রীগোবিন্দের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম গোবিন্দ সপ্রতিভ, তাঁহার সুবঙ্কিম নয়নে সেই তেরছ চাহনি, আর অধরে সেই সিলাজ হাসি

দেখিয়া বুঝিলাম তোমার এই মোহন বাঁশী, আর মধুর হাসি, আর ঐ তেরছ চাহনি বজায় থাকিতে শত ললিতা বাদী হইলেও তোমার এই চাকুরি কে লইবে?

ক্রমশঃ—শ্রীবামাচরণ বসু।

গোরা—অনুরাগ।

—:০:—

সই! পরেরে কহিতে ভয়!
কে জানে এমন, ঘাটে গেলে মন,
হারা'য়ে আসিতে হয়॥
গিয়াছিনু জলে, কা'লের বিকালে,
একলা কেবল আমি।
সচকিতে মন, ঘরে গুরু জন,
আরো তো দারুণ স্বামী॥
তাড়াতাড়ি করি, ভরি গঙ্গা বারি,
বাড়ীতে যখন আসি।
কামিণীর কাল, শচীর দুলাল,
সুমুখে দাঁড়াল আসি॥
হঠাৎ হেরিয়া, দাঁড়ানু সরিয়া,
মরমে মরিয়া সই!
বিপাক বুঝিয়া, নয়ন মুদিয়া,
খনেক দাঁড়ায়ে রই॥
পাছে কেহ শুনে, বুঁজা চোক কোণে,
ঝরিল দু'ফোটা জল।
পিরীতি পিয়াসে, অতনু আবেশে,
তনু মন ঢুরবল॥

নয়ন মেলিয়া, দেখিনু চাহিয়া,
জগত গৌরাঙ্গময়।
চাহিলেও গোরা, বুজিলেও গোরা,
সঙ্কট সামান্য নয়॥
ঘরে যেতে চাই, পথ কোথা পাই,
গোরা যে দাঁড়ায়ে আগে?
অতটা হইলে, তবে কি গো চলে,
কহত কেমন লাগে।
"গুরু গুরু" ক'রে, কোন মতে পরে,
ঘরে আসিনু যখন;—
দেহ আর প্রাণ, আছে দুই খান,
খুজিয়া না পাই মন॥
কহিছে বিজয়, হেন মনে কয়,
নাটুয়া গোরার নাটে।
হয়ে বিস্মরণ, তোমারও এ, "মন"
হারায়ে এসেছ ঘাটে॥

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

কাঙ্গালের মনের কথা।

——:০:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শুনিয়াছি তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব শক্তিমান। তবে এই সর্ব্বব্যাপীর রূপ চিন্তা তো হয় না। আমি কি ঘোর পাগল যে সসীম, হইয়া অসীমের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইব? আমি তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে নিরাকার করিয়া ফেলিয়া রাখিব না, তা' কখনই না। আমি এরূপ

নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া মাধুর্য্যময় ভগবানের মধুর ভজন হারাইয়া ফেলিব ?

তিনি আমার হৃদয়েশ্বর। আমার প্রাণনাথ, প্রাণপতি। লীলা বিলাসময়ী পরা প্রকৃতির সহ সংযুক্ত। তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর, শ্যাম সুন্দর বংশীবদন। লীলাময় নটবর। আমি তাঁহাকে এরূপে না লইয়া ঝাড়ে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে মিশায়ে দিতে যাইব কেন ? আর এরূপে তাঁহাকে সর্ব্বভূতে মিশাইয়া দিলে, আমার আর পৃথগস্তিত্ব থাকে কৈ ? তবে বুঝি আমিও ঈশ্বর হইয়া ভগবদ্ সেবা সুখে বঞ্চিত হইব নাকি? ছি। এমন অন্ধকারময় নীরস ভজনের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিব না।

সৃষ্টি তো তাঁহার শক্তির ক্রীড়া। তাঁহার সৃজন শক্তি, পালন শক্তি, বিনাশ শক্তি অনন্তের গায় সর্ব্বদা মিশাইয়া আছে। যত কিছু ভাঙ্গাগড়া, সেই শক্তিত্রয় কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংঘটিত হইয়া এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে, ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়মে পরিচালিত হইতেছে ও অনন্ত কাল হইতেই মহেশ্বরের অপার মহিমার জয় ঘোষণা করিয়া আসিতেছে।

আর চিদানন্দময়ী, হ্লাদিনী শক্তি, মহা ভাবময়ী শ্রীরাধিকা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সংযোজিত। আমি এই যুগল রূপের মধুর মিলন চিন্তা না করিয়া, মাধুর্য্যময় ভজনরাজ্যে প্রবেশ না করিয়া কোথায় কি করিব ?

আমি সেই রসিক রসিকার সেই শক্তি শক্তিমানের সেই মহাভাব রস রাজের মহা মিলন চিন্তা করিব; সেই অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের রসাস্বাদন করিব। দুই মিলাইয়া এক করিয়া লইব। অনন্তকে শান্ত করিয়া লইব।

পারি যদি তবে শুদ্ধ মানুষ বানাইয়া মানুষ পূজায় প্রবৃত্ত হইব। এত বড় অসীমের উপাসনায় আমার সুখ হইবে কি ?

দাস, প্রভু, মাতা পুত্র কি পতি পত্নী এই একটা মধুর সম্বন্ধ পাতিয়া তাঁহাকে আমার করিয়া লইব এবং আমি তাঁহার হইব। ভাই-ভাই হইয়া গলাগলি কোলাকোলী করিতে পারিলেও মঙ্গলের কথা। লোকের কথায় কাণ দিব না।

তবে যদি আমার ভাব গতিক দেখিয়া, আমার ভজন প্রণালীর সন্ধান মনে মনে করে, তবে আমার মঙ্গল। পাগল সাজিতে বড় সাধ। অনেক দিন যাবত পাগল হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু পারিতেছি না।

পাগল না হইলে আমাকে সংসারে ছাড়িবে না। পাগলের সংসার নাই। মান মর্য্যাদা নাই, নাই বলিতে কিছুই নাই। আছে কেবল সে, আর যার জন্ত পাগল সে।

পাগল না হইলে স্ত্রী, পুরুষ ভেদ জ্ঞান শূন্য হইবে না। এই ভেদ জ্ঞান লইয়া কি ভগবানের সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ সংস্থাপন করা যায়? হরি হরি হরি!!! কি বলিতে ছিলাম, আর কি বলিতেছি। আঃ! কি ভুলরে! আমি কি তবে কৃষ্ণ মহিষী হইয়া, কৃষ্ণকে বুকে লইয়া সুখী হইতে চাই নাকি? না, না, না। ইহাতে আমার লাভ কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বামী বেশ কথা, আর তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি মহা ভাবময়ী শ্রীরাধিকা স্বামিনী, তবেইত হইল। তবে আমি কি? আমি এই পুরুষ প্রকৃতি যুগলের সেবা দাসী। এমনটা হইলেই আর কোন গোল থাকেনা।

তবে কি আমাকে প্রকৃতি হইতে হইবে না কি? এতো বড় কঠিন কথা। পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া, পুরুষের স্বভাব লইয়া এখন হঠাৎ প্রকৃতি হইব কি প্রকারে? আমার ভজন সাধন তো এখানেই শেষ।

বাহিরে কৃত্রিম প্রকৃতি সাজিলেও তো চলিবে না। ভিতরে প্রকৃতি হওয়া চাই। প্রকৃতির স্বভাব প্রাপ্ত না হইলে কি কেবল কথায় বার্ত্তায় প্রকৃতি হওয়া যায়? ও বাবা!! এযে আর এক বিষম ফের উপস্থিত। এমন প্রকৃতির স্বভাব জানিয়া শুনিয়া সে প্রকৃতির স্বভাব ধরিব? প্রকৃতির স্বভাব জানিব কার কাছে? প্রকৃতির কাছে? হা কৃষ্ণ এযে আর এক বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। এখন বুঝি তবে আমাকে স্বভাব শিক্ষার নিমিত্ত প্রকৃতি সঙ্গ করিতে হইবে। বাবারে, বাবা!! এই খানেই তো সর্ব্বনাশ। যে প্রকৃতি সঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, মোক্ষ পথের প্রধান কণ্টক তাই বুঝি আমাকে করিতে হইবে। তবে তো আমি একটা সহজিয়া হইয়া উঠিলাম। না গো না? আমি চাই না।

এখন উপায় কি? সকল দিক সুষ্ঠ করিয়া শেষ কালে যে এমন বিপদ উপস্থিত হইবে কে জানে?'

আবার শুনি, কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী হইয়া কৃষ্ণ দর্শন অসাধ্য। আর পুরুষ হইয়া শ্রীমতী রাধা দর্শন অসাধ্য। তবে কি নপুংসক হইয়া? না,

তাও না। না স্ত্রী না পুরুষ, না নপুংসক, এইরূপ কি একটা না হইলে, যুগল সেবার অধিকার জন্মে না।

পাঠক! এই সব পাগলের প্রলাপ, কোন শাস্ত্রের সঙ্গে মিল পড়ে কি না তাহা আপনি বুঝেন। আমি তো ভাল মন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। শুনিলাম, না স্ত্রী না পুরুষ না নপুংশস এরূপ কিছু একটা হইয়া, শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের লীলা বিলাসোন্মত্ত মধুরানন্দাপ্লুত, নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রলেপ মাখা প্রাণ লইয়া সেখানে যাইতে হয়। তবে আকৃতি হয়ত স্ত্রী লোকের মতই থাকিবে, কিন্তু স্বভাব ভিন্ন।

না, এরূপ অসাধ্য সাধন করিবার আর জটিল সিদ্ধান্ত বুঝিবার শক্তি আমার নাই। তবে যুগল সেবা? শুনিয়াছি শ্রীধাম নবদ্বীপে মহামিলন। দুই রূপে একরূপ। দুই মূর্ত্তিতে এক মূর্ত্তি!! রাধা কৃষ্ণ মিলিয়া গৌরাঙ্গ। সেইতো ভাল। কোন উৎপাৎ নাই।

আমার মত দুর্ব্বল পতিতের, কাম কলুষিত পামরের সেই দিকে যাওয়াই ভাল। সেখানে কোন উপদ্রবের আশঙ্কা নাই। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, অন্ধ, আতুর, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ভেদ বিচার নাই, কেবল হরি ব'লে ডাক্‌লেই কার্য্য সারা। চাই পুরুষ থাকো, চাই স্ত্রী থাকো, চাই পুণ্যবান্ থাকো আর চাই মহা পাপীই থাকো, শুধু হরিবোল দিলেই সকল গোল চুকিয়া গেল!!

তবে আগে আমি নবদ্বীপের দিকেই যাই! ও বাবা!! সেও ত কেবল সহজ নয়। বৃন্দাবন যাইতে হইলে যেমন ব্রজ বধুর অনুগত হইতে হয়,— নবদ্বীপ যাইতে হইলেও সেই প্রকার নবদ্বীপ বাসী বৈষ্ণব ঠাকুরের অনুগত না হইয়া যাওয়ার যো নাই।

তবে আমাকে কোন বৈষ্ণব ঠাকুরের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া, তাঁহার কৃপা লেশ কণিকার বলে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইতে হইবে। এপথে বৈষ্ণবের কৃপাই কৃপা। এখন আমার সংসার নাই! সংসার তো দূরের কথা আমিই নাই। হরি হরি হরি!!! অনন্তের ধাক্কায় পড়িয়া অনেকটা অগ্রসর হইলাম রে!!

এখন বৈষ্ণব কোথায় পাই! বৈষ্ণব দাস না সাজিলে তো আর নবদ্বীপ যাওয়া হইবেনা। প্রিয়পাঠক! আমি আর বৈষ্ণব খুজিয়া কোন্ দেশে কোন্ পথে ঘুরিয়া বেড়াইব? আপনিই আমার বৈষ্ণব ঠাকুর। আমি আর

বৈষ্ণব খুঁজিয়া কোথায় যাইব? কোথায় পাইব? আপনি আমাকে দয়া করিয়া একটুকু ন'দের দিকে টানিয়া লইবেন কি?

পাঠক মহাশয়! আপনাকে বড় বিরক্ত করিলাম, ক্ষমা করিবেন। অনন্তের ধাক্কায় পড়িয়া আমার সংসার চিন্তা ছুটিয়া গিয়াছে। এখন প্রাণ, প্রাণেশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে চায়। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ ভাবিতে ভাবিতে শরীরটা শীতল হইয়া আসিল, ক্রমে তন্দ্রিত হইলে লাগিলাম। অগত্যা বাহির হইতে ঘরে গিয়া পুনর্ব্বার শুইলাম, নিদ্রা হইল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

অন্তিম নিবেদন।

—:০:—

কি জানি কোথায় কি ভাবে চলেছি
কোন পথে আমি কোথায় যাব।
শূন্য চারিদিক না হেরি কাহারে
কোথা বা যেতেছি কোথায় রব॥
এই যে গো ছিল সকলি আমার
সাধের সংসার কোথায় গেল।
বুকে মুখে পড়ি ছিল কত জন
একি! কাল কাল উদয় হ'ল॥
যা ছিলাম আমি তাহাই রয়েছি
তবে কেন স্থির ইন্দ্রিয়গণ।
দেখেও দেখেনা শুনেও শুনেনা
যেন গো তাহারা নহে চেতন॥

গিয়েছিল সব ত্যজিয়া আমায়
ছিল মাত্র মোর গেয়ান বাকি।
কি দেখি এখন সেও বুঝি যায়
ক্ষণে ক্ষণে রয় ক্ষণেকে ফাঁকি॥
দাঁড়াও দাঁড়াও ক্ষণেক দাঁড়াও
দুটি কথা মোরে বুঝিতে দাও।
রেখেছিনু তোরে কতই যতনে
কোথা ফেলে এবে চলিয়া যাও॥
বুঝেছি বুঝেছি সংসারের রীতি
এখানে কেহই কাহার নয়।
শুধু মায়া বশে শুধু ভুলাইয়া
সাধি নিজ কাজ হয় গো লয়॥

যারা ছিল মোর চলে গেল তারা
কে তোরা আবার এলিরে হেথা।
জীবনের সাধ না মিটিতে মোর
বল মোরে নিয়ে যেতেছ কোথা॥
ফুরাইল মোর জীবনের সাথী
দেহের সম্বন্ধ মোহের ভার।
যাই বায়ু ভরে কে জানে কোথায়
ক্ষণেক বিশ্রাম নাহিক তার॥
পলকে ছুটেছি কত কত দেশ
মুখ পানে চায় কেহই নাই।
যারা ছিল সাথে কোথা মিলাইল
খুঁজিয়া কাহারে নাহিক পাই॥
ক্ষুধার আহার পিপাসার জল
নিদাঘের বায়ু নিশার শিশির।
পরিধান বস্ত্র বায়ু বস্ত্র শুধু
নিরাশার আশা প্রশান্ত প্রান্তর॥
ঘোর অন্ধকার বীভৎস্য আকার
নাহি চলে আর আঁখির তারা।
কি করবে আর সে দুঃখে আমার
পোহাইল দুঃখ রজনী সারা॥
নাহি কিছু মোর পথের সম্বল
হাহাকারে কাল কাটিল শেষে।
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি স্বেদসিক্ত দেহে
উপনীত শেষে নুতন দেশে॥
আছে নানা জন নাহি কয় কথা
সকলে শিহরে আমারে হেরে।
যেন রে কতই অপরাধি আমি
আছে দাঁড়াইয়ে আমারে ঘেরে॥

যত অত্যাচার যত অনাচার
যা করেছি আমি জীবন সারা।
যারে স্মৃতি নাই কিবা অৰ্দ্ধ স্মৃতি
সবে দেহধারি হেরি যে তারা॥
এ কেমন দেশ নাহি ভুল কিছু
সকলি উদয় হৃদয় মাঝে।
সকলি জীবন্ত সবি পরিমিত
নিয়ম অধীন যা কিছু রাজে॥
সত্য বিনা কিছু নাহিক হেথায়
সত্য বিনা নাহি উদ্ধার আর।
অসত্য জীবন হেথা সত্য দাস
সত্য বিনা মুখে না আসে তার॥
কি ক'রেছি হায় দু দিনের তরে
ডুবেছি ডুবেছি অকুল তলে।
নাহি কোন আশা নাহিরে ভরসা
কি ক'রেছি আমি মহতী ভলে॥
দাও, ভেঙ্গে দাও সর্ব্বনেশে আশা
আর পাঠাওনা দুখের পারে।
এখানে থাকিয়া কৌমি কীট হ'য়ে
বেড়াব তোমার রাজ্যের ধারে॥
কি কব হে প্রভু! ভুলে যাই
মায়ার শাশনে প্রতিজ্ঞা যত।
বুঝেছি এবার চরণে তোমার
পারিবনা হ'তে সাধন রত॥
নিজ গুণে যদি করুণা করিয়া
করহে আমারে চরণ দাস।
তাহ'লে ত দেখি উপায় আমার
এড়াইতে পারি মায়ার পাশ॥

যে কিছু উপায় হেরিহে জগতে
সে সকলি করে সরব-নাশ।

তাই থাকি চাহি ওহে পরমেশ
রাখ, রাখ করি চরণ দাস॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভক্তিবিনোদ।

কর্ম্ম।

—:০:—

যাহা করা যায় তাহাকে কর্ম্ম বলে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করা একান্ত, আবশ্যক এবং কর্ম্ম সাধনই মোক্ষপদ প্রাপ্তির সহায়তা করিয়া থাকে। দুঃখ দূর করিবার জন্য কর্ম্ম প্রধান সম্বল, কর্ম্ম দ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়। মনুষ্য ভাগ্যে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক, এবং সকল দর্শনকার সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ সংসার দুঃখের আলয়। সকল দর্শনই দুঃখ নিবারণের উপায় স্থির করিয়াছেন, কিন্তু সকলের সিদ্ধান্ত একরূপ নহে। কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন।

কপিল বলেন দুঃখ ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার রোগাদিজন্য শারীরিক দুঃখ এবং কাম, ক্রোধাদি জন্য মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। মনুষ্য, পশু বা স্থাবর জনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ। শীত, গ্রীষ্ম, বাত, বর্ষা প্রভৃতির আক্রমণে আধিদৈবিক দুঃখ হইয়া থাকে। তাঁহার মতে দুঃখ নিবৃত্তির এক মাত্র উপায় জ্ঞান।

"জ্ঞানান্মুক্তিঃ।"—সাংখ্য সূত্র ৩।২৩

চঞ্চল চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য পাতঞ্জল ঠাকুর ক্রিয়া যোগ (তপঃ, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বর প্রণিধান) অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মরত হইলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় তখন মনুষ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং বিশুদ্ধ চিত্তে কূটস্থ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইলে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। বেদান্ত মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বেদান্তবাদীরা বলেন যে জ্ঞান না জন্মিলে মুক্তি হয়না।

বেদের মত। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কর্ম্ম কাণ্ডের অন্তর্গত, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত। মীমাংসাদর্শন বেদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মতে জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। মীমাংসা দর্শনের মতে বেদের কেহ রচয়িতা নাই, ইহা নিত্য ও অভ্রান্ত। ইহা চিরদিনই আছে ও থাকিবে। দৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান মনুষ্য আপনা হইতে লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপায় মনুষ্য নিজেই স্থির করিতে পারে। কিন্তু স্বর্গাদি অদৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার উপদেশ মনুষ্য বেদ হইতে পাইয়া থাকে, সুখময় স্বর্গধাম পাইবার জন্য বেদ বলিতেছেনঃ—

"স্বর্গ কামো যজেত".

অর্থাৎ "স্বর্গ পাইবার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর," মীমাংসা দর্শনের মতে কর্ম্ম দুই প্রকার অর্থকর্ম্ম ও গুণকর্ম্ম। যে কর্ম্ম দ্বারা আত্মাতে কোন রূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা অর্থকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অর্থকর্ম্ম তিনপ্রকার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা না করিলে পাপ (আত্মার অবরোধ) হয় তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলে। পিতা মাতা সেবা ও সন্তানাদি পালন করা মানুষের নিত্যকর্ম্ম ইহা না করিলে পাপ হয়। যে কর্ম্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয় তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। গো বধ করিয়া যে পাপ হইয়াছে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে প্রায়শ্চিত্তাদি করা যায় তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম। মীমাংসা চারি ভাষা বলেন ঃ—

"নিত্য নৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ং।"

অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়। কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে কাম্যকর্ম্ম বলে। কাম্যকর্ম্মও তিনপ্রকার যথা ঐহিক ফলক, আমুষ্মিক ফলক ও ঐহিকামুষ্মিক ফলক। যে কর্ম্মের দ্বারা ইহ লোকে ফল উৎপন্ন হয় তাহাকে ঐহিক ফলক কহে। যে কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে ফল পাওয়া যায় তাহাকে আমুষ্মিক ফলক কহে এবং যে কর্ম্ম দ্বারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই ফল পাওয়াযায় তাহাকে ঐহিকামুষ্মিক ফলক কহে।

শ্রীশুকদেব বলেনঃ—

"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ প্রমুচ্যতে।"

অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানী জীব কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় এবং বিদ্যা দ্বারা উক্ত অভিমান নিবৃত্ত হইলে মুক্তি লাভ করে। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছেঃ—

"কর্ম্ম খল্বিহ কর্ত্তব্যং জানতামিত্র কর্ষণ
অকর্ম্মণোহি জীবন্তি স্থাবরাণেতরে জনাঃ
অকর্ম্মণাং বৈভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্নহ কাচন ॥" বনপর্ব্ব, ৩২ অঃ।

অর্থাৎ জন্মমরণশীল মাত্রকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম শূণ্য হইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রভৃতিও থাকিতে পারেনা, প্রাণীদিগের কর্ম্ম ব্যতিত মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই।

যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছেঃ—
"সংসার বিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনম্।
কর্ম্ম ব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজে দন্তজং যথা॥"

অর্থাৎ সংসার বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমি ব্রহ্মজ্ঞ আমার কর্ম্মে আবশ্যক নাই বলিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা অন্ত্যজের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।

বোধায়নাচার্য্য কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলেন। আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীদিগের * পূর্ব্বাচারী স্বর্গীয় রাম মোহন রায় জ্ঞানী দিগকে লক্ষ করিয়া স্বকৃতবেদান্তানুবাদ ইংরাজী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হইলে কর্ম্ম কাণ্ডের তাদৃক্ প্রয়োজন থাকেনা বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের কর্ম্ম কাণ্ড সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, উহা কোন মতে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কেননা তৎসাধনে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বথা স্ফূর্ত্তি হয়, বিশেষতঃ বেদ বেদান্ত বিধি অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান হওয়া দুর্লভ সকাম সাধনার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, নিষ্কাম সাধনার নাম ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অতএব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার একান্ত আবশ্যকতা আছে।" বেদান্ত দর্শন বলেনঃ—

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" ॥১॥ বেদান্তং ॥ কর্ম্ম কাণ্ডানন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে।

---

* তাহাতে সন্দেহ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেনঃ—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং সকর্ম্মকৃৎ

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্।" ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯অ

অর্থাৎ মনুষ্যগণ যেপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থান কারী আমাকে (পরমাত্মাকে) আপনার হৃদয়ে জানিবে সে পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে।

এই প্রকার নানামুনির নানামত প্রচলিত থাকাতে, কেহ কর্ম্মের গৌরব কেহবা জ্ঞানের গৌরব করিয়া থাকেন কিন্তু সত্যের আকর সর্ব্বধর্ম্মের সার, সকল শাস্ত্রের সরাংশার ব্রহ্মরূপা গীতা, যাহা যোগী, সন্ন্যাসী, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী, সকাম উপাসক নিষ্কাম উপাসক সকলেরই প্রাণ ও আদরের বস্তু, তাহাতে কি উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক। ভক্ত গীতা পাঠক গণ! অবশ্য অবগত আছেন যে মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের প্রশংসা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কোন ব্যক্তি কোন অবস্থায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা, কারণ মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতির গুণ সমূহ সত্ত্ব রজঃ তমঃ অর্থাৎ অনুরাগ দ্বেষাদি তাহাকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্য "নৈষ্কর্ম্ম্য" লাভ করিতে পারেনা, কারণ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারেনা। ক্রমশঃ—শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

"প্রেমভৎর্সন।"

—:০:—

(রাজসাহী বৈষ্ণব সমিতিতে পঠিত)

"ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,
চরণ উপর ঝুলিয়েছে কোঁচা।

ঝাঁগ্‌ মল সোনার নূপুর বাজিতেছে মধুর মধুর
রূপ দেখিয়ে ভুবন মূরছা ॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তা'তে দিয়েছে চাঁপার ফুল
কুন্দমালতীর মালা বেড়া ঝোঁটা।
চন্দন মাখা গোরার গায় বাহু দোলায়ে চলে যায়
ললাট উপর ভুবণ মোহন কোঁটা ॥
বাহুর হেলন দোলন দেখি করির শুণ্ড কিসে লিখি
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কুঁদা ॥
মধুর মধুর কয় গো কথা শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা
চাঁদ যেন উগারয়ে সুধা ॥
এমনকেউ ব্যথিত থাকে কথার ছলে থানিক রাখে
নয়ন ভরি দেখি ওরূপ খানি।
লোচন দাস বলে কেনে নয়ান দিলি গৌর পানে
কুল হারালি আপনা আপনি ॥"

কে জানিত এমন ভুবন মোহন মূরতি খানি ছেঁড়া কন্থা গলায় দিয়া দীনের অধীন বেশে জগতের দ্বারে দ্বারে "হরিবোল" হরিবোল" বলিয়া কান্দিয়া বেড়াইবে; কে জানিত সে ধবল পাটের জোড় ছাড়িয়া সোনার অঙ্গে ডোর কৌপীন পরিধান করিবে; কে জানিত, সে নদীয়া নাগরীদের মন ভুলান চাঁচর কেশ মুড়াইয়া হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিবে; কে জানিত যে অঙ্গে চন্দন মালা শোভা পাইতেছে সে অঙ্গ আবার ভাবাবেশে ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইবে। আর কে-ই বা জানিত যে, যে বদনের ন্যায় সিদ্ধান্তে নৈয়ায়িক শিরোমণিরও শির নত হইয়াছিল, সেই বদন, "রাধে" "রাধে" বলিয়া নয়ন জলে ভাসিয়া যাইবে।

কান্দাইলেই কাঁদিতে হয়। একজন নিরপরাধীকে দণ্ড দিলেই দণ্ড লইতে হয়। নিরপরাধী ভক্ত তোমার জন্য জাতি কুল তুচ্ছ করে, মান সম্মানে জলাঞ্জলি দেয়, বিষয় সম্পদ স্ত্রী পুত্র পরিজন সকলই পরিত্যাগ করে। তুমি মহান হইয়া জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীর জন্য যাহা কর, একজন প্রেমিক তোমার জন্য তদপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া থাকে। তুমি বলিবে—ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান কর, তৃষ্ণার্ত্তকে

জল দাও, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃ স্তনে ক্ষীর সঞ্চয় করিয়া রাখ। তুমি দেখাইবে—ফল পুষ্পে সুশোভিত নব নব শস্য শালিনী তোমার এই বিচিত্র বসুন্ধরা জগতের প্রাণী সমূহের সেবার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। তোমারই সূর্য্য আলোক দান করিতেছে তোমারই চন্দ্র সুধা বিতরণ করিতেছে, তোমারই বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। তোমারই অনেক বলিবার আছে বলিতে পার, অনেক দেখাইবার আছে দেখাইতে পার, কিন্তু যাহার বলিবার ও দেখাইবার কিছুই নাই সে যাহা বলে তাহা একবার শুন, সে যাহা বলে তাহা একবার শুন, সে যাহা দেখায় তাহা একবার দেখ—যদি অন্নহারেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত তবে আবার ক্ষুধা হয় কেন? যদি জল পানেই পিপাসার শান্তি হইত তবে আবার পিপাসা পায় কেন? এ নিত্য ক্ষুৎ পিপাসার শান্তি পিপাসার শান্তি কোথায়? আবার ঐ দেখ শিশু পুত্র ধুলায় পড়িয়া রহিয়াছে—নিশ্চল নিস্পন্দ; মাতার স্তন আর মুখে করিতেছে না। হত ভাগিনী জননীর আর্ত্তনাদ ও বিলাপ ধ্বনি ঐ শ্রবণ কর; ঐ দেখ তাহার স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতেছে; হে চতুর! বল, আর শিশু স্তন্য পান করে না কেন? এখন স্তনের দুধ যে স্তনেই শুকাইবে। আবার তোমার এমন সুজলা সুফলা মলয়জ শীতল শস্য শ্যামলা ধরিত্রীর অঙ্কে দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক ও জরা মৃত্যুর গীতাভিনয় কেন? কে ইহা চাহে? যদি নর নারীর সেবার জন্যই ধরা সৃষ্টি করিয়া থাক তবে এ তোমার কিরূপ সেবা? তোমার যে চন্দ্র সূর্য্য আলোক দান করিতেছে তাহারাও সময়ে সময়ে রাহু গ্রস্থ হইয়া নিস্প্রভ হইয়া পড়ে কেন? জলদ মালায় আবৃত হয় কেন? যে বায়ু জীবের জীবন যাহার প্রবাহ একটু শিথিল হইলে প্রাণিগণ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য আকুল হইয়া পড়ে। যাহার আবাহনের জন্য এখন তাল বৃন্ত হইতে তড়িত ব্যজনী পর্য্যন্ত নিয়োজিত করিতে হয় কিন্তু সময়ে এমন দিন আইসে যখন মানব বহু চেষ্টা করিয়াও আর তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, চিকিৎসকগণ তাহার জীবনী শক্তি রক্ষার জন্য কত প্রকার কৃত্রিম উপায়ে তাহার শরীরে প্রাণ বায়ুর আহুতি দান করিতে থাকে কিন্তু তখন তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় হইয়া যায়। কৈ? তোমার জীবনত তখন জীবন রক্ষা করিতে পারে না। হে শঠ! বল এরূপ হয় কেন? তুমি চতুর চূড়ামণি কিন্তু তোমার ভক্ত প্রেমিকও তোমা অপেক্ষা

কম চতুর নহে;—"যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" সে তোমার প্রেমরূপ উজ্জ্বল হীরক খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সামান্য এই কাচ খণ্ডে মুগ্ধ হয় না। তোমার এই অঘটনঘটনপটিয়সী মায়াজাল সে অনায়াসেই ছিন্ন করিয়া ফেলে। সে দেখায় তুমি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, আর সে করুণার প্রতিমূর্ত্তি, কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুর হস্তে ফেলিয়া, অবাধ্য ইন্দ্রিয়গণের অধীনে রাখিয়া আবার মোহিনী মন্ত্রে ভুলাইয়া একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে তুমি কত নাচানই নাচাইতেছ, তাহাকে লইয়া কত রঙ্গই করিতেছ সে তোমার এই মায়া শক্তির সহিত শক্তিতে পারিয়া উঠিবে কেন? "তাহারা স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে" এই বলিয়া, তুমি নীরবে থাকিলেই বা চলিবে কেন? নির্দ্দয়, একটু কি দয়া হয় না কাকের উপর এ কামানের আওয়াজ কেন? তুমি যাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছ তাহাদের জন্য ভক্ত প্রেমিকের হৃদয় আকুল হইয়াছে সে চুপ করিয়া বসিয়া নাই—'মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর, নিজ কার্য্য নাহি তবু—যান তার ঘর॥" সে জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বিষয় বিষে অভিভূত মানবগণকে সঞ্জীবনী সুধা তোমার নামামৃত পান করাইতেছে, কত সংসারাসক্ত চিত্তকে তোমার উন্মুখীন করিয়া দিতেছে, নিষ্ঠুর! তুমি দয়াল না সে দয়াল? ভক্ত প্রেমিক আরও দেখায় তুমি প্রচ্ছন্ন কামুক আর সে নিষ্কাম প্রেমিক; বস্তুত তুমি এই মায়াময় প্রকৃত বিষয় ভোগ করাইয়া জীবের নিকট হইতে তৎপরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রেম প্রতিদান চাহ কি না! তোমার এ দানের মূলে সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে, ইহা তোমার কাচ বিনিময়ে কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা প্রেমিক কিন্তু তাহাতেও পরাঙ্মুখ নহে। সে তোমার এই মায়ার দানে মুগ্ধ হয় না বিষয় সম্পদ, স্ত্রী পুত্র, মান সম্মান সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিয়া বলে:—'নাথ ইহা তোমারই বিষয়; এই লও তুমি ইহার কর্ত্তা হইয়া বোস, আমি দাস,—ইহা দ্বারা তোমার সেবা করি তবে। আমার একটি নিজস্ব সম্পত্তি আছে তাহা এই দরিদ্রের হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন প্রেম, তুমি ইহা বড় ভালবাস। এজন্য ইহা হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছি আইস গ্রহণ কর এই বলিয়া সে প্রেমের সহিত তোমার চরণে লুটাইয়া পরে। এখন দেখ দেখি কাহার প্রেম নিস্বার্থ; তোমার না প্রেমিকের? প্রেমিক তোমার দত্ত বিষয় নিজে সম্ভোগ না করিয়া তাহা দ্বারা তোমারই সেবা করে, উপরন্তু তাহার "নিজস্ব সম্পত্তি" যে অমূল্য প্রেমরত্ন তাহাও তোমার চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয় এবং তোমার প্রীতি সাধনই সে জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করে, আর তুমি তৎপরিবর্ত্তে যেনতেন প্রকারে ক্রমাগত নিজ কার্য্যই সিদ্ধ করিতেছ, নিজ ইচ্ছাই পূর্ণ করিতেছে এপর্য্যন্ত কেহ তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে পারিল না ভবিষ্যতে পারিবেও না, এপর্য্যন্ত কেহ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিল না ভবিষ্যতেও করিবে না। তুমি ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। ক্রমশঃ—শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী।

"গোবিন্দ গোপীনাথ গোপীজনবল্লভ।"

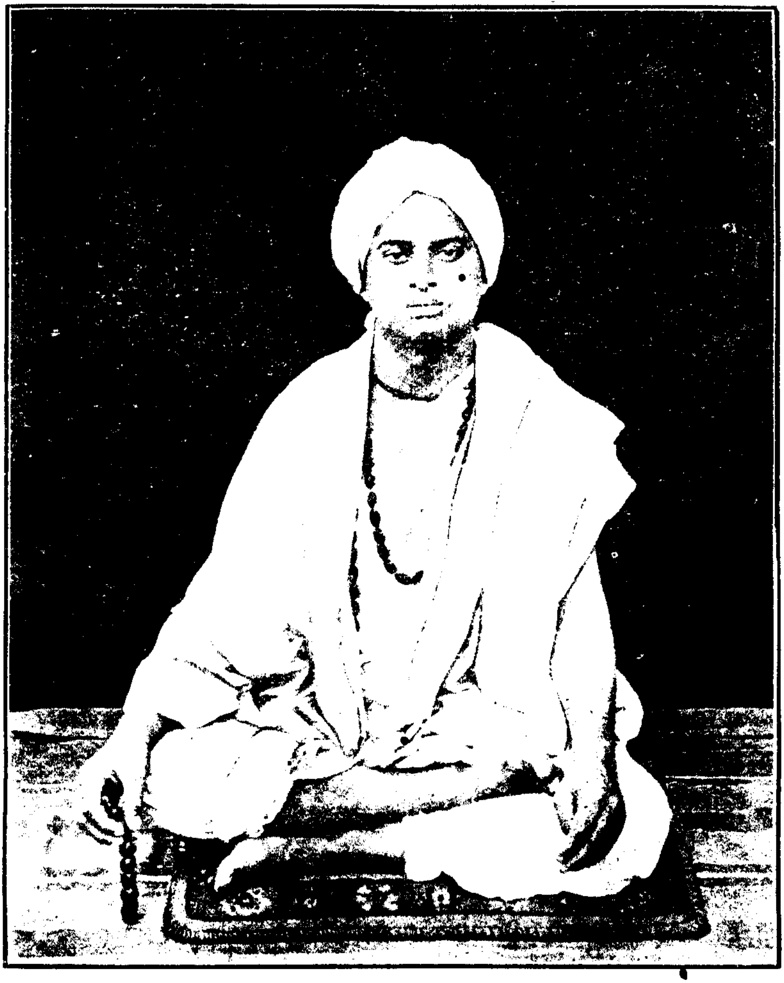

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর

দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

১১শ বর্ষ। পৌষ ১৩১৯। ৫ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু-নিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্ব-কর্ম্মানুরূপং।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎ-পাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

হে ভগবন্! ধর্ম্মে অথবা ধনাদি ভোগে আমার তেমন আস্থানাই, পরন্তু কামভোগেও সেরূপ কোন বাসনা নাই, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মবশতঃ যাহা হইবার হইয়াছে আর যাহা হইবার হইবে, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার এইটীই একান্ত প্রার্থনীয়, এইটীই একান্ত অভিলাষ অর্থাৎ ইহাই একমাত্র পাইবার ইচ্ছাযে, তোমার রাতুল পদকমলে যেন সর্ব্বদা নিশ্চলাভক্তি থাকে, সংসারের শত বাধা বিঘ্নেতেও যেন তোমায় না ভুলি, জাগতীক কোন বিষয়েতেই যেন অত্যাশক্ত নাহই, যেন তোমার প্রদর্শিত পথে তোমার আদেশ মত চলিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

হে দীনতারণ! তোমার দয়ার তোমার দীনজন-বৎসলতার জয় হউক। তোমার যে নিস্বার্থ অতুলনীয় ভালবাসায় এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ত চালিত পালিত হইতেছে, যে অনন্তশক্তি বলে কি সামান্য কি বৃহৎ সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে সেই ভালবাসার, সেই শক্তির জয় হউক। অনেক বলিয়াছি অনেক ভাবিয়াছি এবং অনেক চাহিয়াছি আর বলিবার, ভাবিবার বা চাহিবার কিছু নাই। যাহা ছিল ক্রমে ক্রমে সকল গুলিই হইয়াছে। এবার আমার একমাত্র চাহিবার বিষয় "তোমাকে ভালবাসিবার শক্তি"।

আকুল প্রাণে এবার আমার এইটীই প্রার্থনা যে, আমাকে আর তোমার ভাব ছাড়া করিয়া রাখিওনা। সামান্য, বৃহৎ যতটুকু ধারণা করিবার শক্তি দিয়াছ, তদনুরূপ যেন তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব অনুভব করিয়া সরল প্রাণে তোমাকে ভালবাসিতে পারি, সংসারের অসার খুটি নাটি লইয়া যেন আর ভুলিয়া না থাকি। তোমার সত্ত্বা, তোমার লীলা খেলা, তোমার ভালবাসা ভিন্ন মন যেন অন্য কিছু না ভাবে, অন্য কিছু না বোঝে বা অন্য কিছুকে না ভালবাসে। তুমি যে নিরন্তরই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান তাহা দর্শনোপযোগী ভাব চক্ষু প্রদান কর, তোমার বিশ্ববিমোহন ভুবনমোহন রূপ দর্শনে ভাবে বিভোর হইয়া যাই, তোমার শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্যেই যে কাহার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দাও। জগত জীবন! সংসার, জীব, জগত, সমস্তই তুমি রক্ষা করিতেছ ও করিবে; তথাপি আমি এমনই মুর্খ এমনই বহির্ম্মুখ যে, তোমার সত্ত্বা তোমার ভালবাসা ভুলিয়া তোমাতে নির্ভর করিতে না পারিয়া "আমি করি আমি বুঝি" ইত্যাদি অন্তঃসার হীন অহংভাবে মত্ত হইয়া পদে পদে কষ্ট ভোগ করিতেছি। সবগেল প্রভো! গেল না "কর্ত্তাসাজা" গেল না "অহঙ্কার" গেল না "হৃদয়ের মলিনতা" একটু ভাবিয়া দেখিলেই তোমার কৃপায় বেশ অনুভব হয় যে আমাদের অভিমান নষ্ট করিবার জন্যই তুমি এইরূপ নানাখেলা খেলিতেছ, তথাপি দুর্দ্দমনীয় মন বোঝেনা। দয়াময়! দয়াকর, তোমার দয়া ভিন্ন আমার আর কোন বল নাই, অহংভাবে যাহা ভাবিতে যাই তাহা ভাবা হয় না, যাহা করিতে যাই তাহা করা হয় না। আর না প্রভো! জীবনকাল গতপ্রায়, আর পরীক্ষা করিওনা, এই বার প্রাণে বলদাও স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি সর্ব্বভূতেই যে তুমি বিরাজমান তাহা দেখাইয়া

আমাকে কৃতার্থ কর। যখন যাহা করাও যাহা ভবাও যাহা দাও তাহাই যে আমার মঙ্গলের নিমিত্ত, তাহাই যে তোমার মঙ্গলময় লীলার অঙ্গ, ইহা যেন বেশ বুঝিতে পারি। তোমার ভালবাসা ভিন্ন, কোন বস্তুতেই যেন আমার মন না মজে। ভাল হউক মন্দ হউক কোন কার্য্যেই যেন হৃদয়ে আমিত্ব রূপ কুসংস্কারের দাগ নালাগে। প্রাণ ভরিয়া যেন তোমার ভালবাসার জয় দিতে পারি, আমায় তোমার ভাল বাসায় মাতাইয়া রাখ।

"(তোমার) ভালবাসায় মাতায়ে দাও ওহে হরি প্রেমময়।
আমি তোমার ভালবাসায় মগন হইয়া শীতল করিব হিয়ায় ॥
কতমত ভাবের খেলা খেলছ আমার সনে ;—
তুমি থাকিয়ে আড়ালে ডাক আয় আয় ব'লে
আসিয়ে দেখা না দাও আমায় ॥
এজীবনে পাবনাকি সদা দরশন ;—
তোমায় দেখিতে দেখিতে লুকাও চকিতে
ভাবিতে ভাবিতে দুঃখ হয় ॥
আর আসিব না খেলিবনা যদি না দাও দেখা ;—
ওহে প্রাণসখা দিয়ে দেখা
সুখে রাখ আমায় এই ধরায় ॥
মনের কথা বলব তোমায় আছি আশা করি ;—
তোমায় নাদেখে নয়নে ত্রিতাপ দহনে
নিশি দিন দহে এ হৃদয় ॥"

দীন—শ্রীদীনেশ চন্দ্র শর্ম্মা।]

পাতকীর প্রার্থনা।

—:০:—

পাপী তাপী উদ্ধারিতে ওহে গৌরহরি!
নিত্যধাম নবদ্বীপে তব অবতার ;
আমি পাপী তাপত্রয়ে দিবস শর্ব্বরী
পুড়িতেছি, কৃপানেত্রে চাহ একবার।

দেবের দুর্লভ তব প্রেমামৃত বারি,
বিলাইলে আচণ্ডালে যাচিয়া যাচিয়া;
কাঁদাইলে পশু, পাখী ব'লে হরি হরি,
শিখা'লে জগতে ভক্তি নিজে আচরিয়া॥
মম সম পাপী তাপী কভু এ মরতে,
পাও নাই, পাবে নাই হে দীনশরণ!
এ'পাপীরে উদ্ধারিয়ে পাপ-সিন্ধু হ'তে,
নামের গৌরব তব করহ বর্দ্ধণ।
বিষম জ্বালায় প্রাণ জ্বলে অনিবার,
শরণ লইনু পদে, দয়া না করিলে,
আমা হ'তে দয়াময় নামটী তোমার
ডুবিয়া যাইবে প্রভু কলঙ্ক সলিলে।
দয়াময়! দয়া করি' দাও হৃদে বল,
পূরাও দীনের আশ, যেন মোর চিত
নিয়ত চিন্তয়ে দু'টী চরণ-কমল,
শ্রীনাম লইতে অঙ্গ হয় পুলকিত।
তা'হলে বুঝিব তুমি হে শচীনন্দন!
দয়ার ঠাকুর বটে পাতকী শরণ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

নিত্যধাম গত,

পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন।

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

[চিত্র পুস্তকের প্রথমে দ্রষ্টব্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর)

—:০:—

শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার।

বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া, দীনবন্ধু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারে এই ভাবে মন নিবেশ করিলেন। শ্রীগ্রন্থতো পূর্ব্বে অনেকবার প্রচারিত হইয়াছেন, তবে আবার এ উদ্যোগ কেন, একথা কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান, পণ্ডিত ও অধ্যাপক দিগের, শাস্ত্র পঠন-পাঠন ও প্রচার নৈমিত্তিক ক্রিয়ার একটি অঙ্গ বিশেষ। যিনি যতটুকু পারেন, যেমন অধিকার, তদনুযায়ী শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। জীব, ভ্রান্তজীব, মোহাচ্ছন্ন জীব, সংসারের ঘোর অন্ধকারময় পিচ্ছিল পথে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের কর্ণে দিবানিশি নাম কীর্ত্তন করিলে, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলে, জগতে এই দেহ নশ্বর, ইহার

সুখ খুঁজিতে গিয়া দুঃখের জ্বালা বহন করিবার প্রয়োজন নাই, বার বার বলিতে থাকিলে যদি তাঁহাদের সংমতি হয়, যদি তাহাদের মন সুপথে পরিচালিত হয়। তাহা হইলে, জীব ধন্য হইবে, জীব চরিতার্থ হইবে, সে কি, এই বিশ্বের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, সে ও এই বিশ্ব কোথা হইতে উৎপত্তি হইল, কাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তিনি কে, তাহা জানিতে পারিবে, জানিতে পারিলে আনন্দের আস্বাদ পাইবে, আর আনন্দের আস্বাদ পাইলে ভগবৎ লীলামৃত পানে মত্ত হইয়া যাইবে।

জীবকে সেই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য, বেদান্তের সেই প্রথম সূত্র, 'জন্মাদ্যস্য যতো'র মর্ম্ম বিস্তার করিয়া, জীবের সুখ বোধ্য করিবার জন্য, শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। অতএব শ্রীভাগবৎ "কেবল শাউ শুড়ীর" পূজিত গ্রন্থ নহে। যে ব্যাসদেব বেদ সংগ্রহ করিলেন, বেদার্থ বৃংহণ করিলেন, তিনি কি এমনই অল্পবুদ্ধির লোক ছিলেন যে, কতকগুলা কাল্পনিক উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া, তাহাই শ্রীকৃষ্ণর লীলা রূপে বর্ণনা করিলেন? আর আজ কাল্ কার, রামা শ্যামা, দু'পাত বেদান্ত উল্টাইয়া এত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন যে শ্রীমদ্ভাগবতকে সামান্য গ্রন্থ বলিয়া উপেক্ষা করিতে চায়? আবার বাবুর দলে কেহ কেহ শ্রীভাগবতকে একখানা পুরাণ মাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া বেদান্ত সূত্রের আলোচনা করেন। কিন্তু এই সকল জীব যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহা সাধক মাত্রেই, ভক্ত মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পুরাণ গুলি "গাঁজাখুরী" গল্প নহে; সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত কাল্পনিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে। "পূরণাৎ পুরাণম্" অর্থাৎ পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ পূরণ হয় বলিয়াই, ইহাদিগের নাম পুরাণ হইয়াছে। এই জন্যই, শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বৃন্দারণ্যবাসী পরম ভাগবত শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, জীবের হিতার্থে, বিকৃত-বুদ্ধি-পরায়ণ কলির জীবের সংশয় ভঞ্জনার্থ, শ্রীষট্-সন্দর্ভ গ্রন্থে, শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্ত-সূত্র সমূহের অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় ভাব-বিশেষ, তাহা সুবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে জানা যায়, পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ শ্রীব্যাসদেবকে উপদেশচ্ছলে বলেন, শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনই ধর্ম্মোপদেশের প্রধানতম কার্য্য। শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া জীবের

হিতার্থ যে কিছু কার্য্য করেন তাহাই লীলা। তাঁহার প্রপঞ্চে প্রকটনই লীলা। এমন কি তিনি অব্যক্ত প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া যখন সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাও তাঁহার প্রাপঞ্চিক লীলা। ইহাতেও আমরা তাঁহার শক্তির খেলা —বহিরঙ্গা শক্তির স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া থাকি। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। সুতরাং এই প্রপঞ্চে তিনি সৎরূপে প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত বলেন সেই পরম তত্ত্ব—

"সচ্চিদানন্দ"

অর্থাৎ তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, তিনি জ্ঞান ও আনন্দ। তিনি যখন এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টি এক পরম তত্ত্ব তখন সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা, চিতি ও আনন্দত্ব বিরাজমান। এমন কি একটি পরমাণুতেও তাঁহার সচ্চিদানন্দত্ব বিরাজমান। জড় বস্তুতেও তাঁহার চিতি শক্তি ও হ্লাদিনী শক্তির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য, অথবা যাহাকে লোকে জড়বস্তু বলে তাহাও সেই নিখিল চিদানন্দেরই মুর্ত্তিমাত্র। তাই শ্রীচণ্ডীতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চিতিরূপেণ সংস্থিতা।"

স্থুলদর্শীরা প্রাকৃতিক জগতের অভিব্যক্তি মাত্র দেখিয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে সূক্ষ্মতমা নিত্যা ভাগবতী শক্তিরই মূর্ত্তি সে ধারণা তাহাদের হয় না। ইহারই নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"প্রকটাপ্রকটভেদে লীলাচ দ্বিবিধামতা।"

অর্থাৎ প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধ। শ্রীভগবানের নর-লীলা সম্বন্ধেই শাস্ত্রে যেমন বর্ণনা আছে, আবার তাঁহার জড়ীয় অভিব্যক্তির বর্ণনা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে, দর্শন শাস্ত্রে ও বিস্তৃতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবৎ-শক্তির এই লীলা যথেষ্টরূপে বর্ণিত আছে। এই লীলার আলোচনা করিলেই ভগবৎশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতে পারে।

জড়ীয় বিজ্ঞান, শক্তিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এখনও প্রকৃত তথ্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন শক্তিতত্ত্ব, ভাগবতী শক্তিকে মূলশক্তি ও সর্ব্বশক্তির উৎস বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন শক্তিতত্ত্বের

কোনরূপ তর্কেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের মীমাংসাহীনতা পরিলক্ষিত হইবে না। জড়বিজ্ঞান যতই সূক্ষ্মভাবে শক্তিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে, ততই একটা বিশেষ জ্ঞানের আলোকরেখা বিজ্ঞানবিদ্‌গণের চিত্তবৃত্তি ও বিচার শক্তিকে উর্দ্ধদিকে উন্নীত করিয়া শ্রীভগবানের প্রাপঞ্চিক লীলার তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া দিতেছে।

জগৎশক্তি শ্রীভগবানের লীলারই পরিচয়। লীলা কেবল শক্তিরই ক্রীড়া। শ্রীভগবান্ যখন নররূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন তখনও আমরা তাঁহার শক্তির লীলা দেখিতে পাই। কেহ বা বহিরঙ্গা শক্তির আলোচনা করিয়া নিবৃত্ত হয়েন, কেহবা তাঁহার চিৎশক্তির আলোচনা করিয়াই পরিতৃপ্ত রহেন। আবার কেহবা আরও দূরে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে ভগবৎ কৃপায় তাঁহার সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি সন্দর্শনে কৃতার্থ হয়েন। ইহারও উপরে কোন কোন সিদ্ধ প্রেমিক শ্রীভগবানের আনন্দলীলা রসানুভবের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ফলকথা এই যে, স্থূল সূক্ষ্মভেদে শ্রীভগবানের যত লীলা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে প্রত্যেক লীলার অন্তরে ভাগবতী শক্তির প্রভাব বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, এই শক্তির অবগুণ্ঠণ উন্মোচন করিয়া দিয়া তাহার স্বরূপ সন্দর্শনে চির লালায়িত। লীলার অন্তরালে যে মহিয়সী শক্তি বিদ্যমান থাকিয়া লীলারস বিস্তার করেন, তাহার অনুভব লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এতাদৃশ সাধক পুরুষগণ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না। তাই, ব্যাসদেব বেদ-বিভাগ, বেদান্ত সূত্র সংগ্রহের পর, আবার শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা করিলেন। শ্রীভাগবত শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তিবর্গের সহিত লীলারস বিস্তারের ইতিহাস ও দর্শন বিজ্ঞান। সূক্ষ্ম চিন্তাশীল প্রেমিকভক্ত পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থে গোপীশক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া থাকেন। এইজন্য বলা হইয়াছে, "বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা।"

এই হ্লাদিনী শক্তির লীলাতত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রেমিক ভক্তগণ যে সকল চিত্র এই স্থূল জগতের স্থূল বুদ্ধি জনগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কৃপার পরিচায়ক। কিন্তু স্থূলবুদ্ধিজনগণ তাহা অপর ভাবে বুঝিয়া লয়। দয়াময় ঋষিগণ এইজন্য দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা হ্লাদিনী শক্তির লীলাবিলাসের আভাস বুঝাইতে সময়ে সময়ে সচেষ্ট হয়েন।

ভক্ত-সমাজ সেই সকল তত্ত্বের মর্ম্ম পরিগ্রহ ও প্রচার করিতে পারিলে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া দীনবন্ধু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এবং স্থূল বুদ্ধি লোকেরাও যাহাতে লীলা কাহিনীর সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্ব সকল বুঝিতে পারে, এবং বুঝিয়া আপন জীবন ধন্য ও পবিত্র করিতে পারে, সেই রূপ করিয়া সরল টীকা ও "সুখবোধিনী নাম্নী" সরল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

শাক্তসাধকগণ মহাশক্তিকে "ঘোরা করালবেদনা ও সৃক্কদ্বয় গলদ্‌রক্তধারাভিস্‌ স্ফুরিতাননা" রূপে উপাসনা করেন, সময়ে সময়ে মহাশক্তির এইরূপ লীলা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ হয়—মহামারীতে মহাশক্তির এইরূপ লীলাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মহাশক্তি জগতের অশেষ কল্যাণময়ী—সুতরাং ভীষণা হইয়াও সুধামধুরা। তাঁহার আনন্দময় মাধুর্য্যই বৈষ্ণব দার্শনিকগণের চরম সাধনার বিষয়। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অনন্ত শক্তিময়ের প্রত্যেক শক্তিই স্বীকার করেন, প্রত্যেক শক্তির প্রয়োজনীয়তাই তাঁহাদের স্বীকার্য্য ও গ্রাহ্য। কিন্তু বিশ্ববিপ্লাবিনী, বিশ্ব-আপ্যায়নী, বিশ্বাহ্লাদিনী, হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দশক্তি আনন্দময়ের নিত্য-স্বরূপশক্তি বলিয়া বৈষ্ণব দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। এবং ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। শ্রীভাগবতের রাসলীলা এই বিশুদ্ধাহ্লাদিনী শক্তিবর্গেরই আনন্দলীলা। রাসনৃত্যই আনন্দের আদি নৃত্য। এই বিশ্বের প্রকৃত আনন্দ নৃত্য উহারই ক্ষীণ আভাস। আনন্দে বাস্তবিকই মানুষের হৃদয় নাচিয়া উঠে, তরুলতা পুলকিত হয়, অচেতন পরমাণুতে স্পন্দন অনুভূত হয়। রাসের আনন্দ-গীতি বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে সঞ্চারিত।

মানুষ সেই আনন্দের অধিকারী, সেই আনন্দ রসাস্বাদন করিবার জন্যই তাহার জন্ম লাভ হইয়াছে। সেই আনন্দের অংশ-কণা তাহার প্রাণে রহিয়াছে বলিয়াই তো সুখের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠে। কিন্তু সে মোহ বশতঃ কিসে সুখ তাহা না বুঝিয়া, সুখ ভ্রমে, দুঃখকে আবাহন করিতেছে আর তৃষ্ণার জ্বালায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র তাহার সেই ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া দেয়। প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দেয় বিশ্বের সকল পদার্থে যে আনন্দ ময়ের আনন্দ লীলা বিকাশিত রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেয়, সেই আনন্দ তরঙ্গ মধ্যে তাহার প্রাণকে আকর্ষণ করে। তখন নব-নীরদ দেখিলে তাহার শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ

হয়। নব কুসুম-কান্তি দেখিলে সেই রাতুলচরণের কথা মনে পড়ে, পাখীর গানে শ্যাম বাঁশরীর ঝঙ্কার শুনিতে পায়। শিশুর হাসিতে, নিভৃত নিকুঞ্জের বিমল ছবি দেখিতে পায়। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে এই ভাবে প্রকৃতিপাঠ করিলে, জগৎ মধুময় বলিয়া মনে হয়, আর সেই পরম সত্য—

"আনন্দাদ্ধেবর খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতের লীলা বর্ণনার এমনই চমৎকার আকর্ষণ, এত তেজঃ, এমনই অপ্রতিহত প্রভাব!

দীনবন্ধু, এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া, জনসাধারণকে যে বিনীত নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশাকরি, হিন্দু-সন্তান এই উক্তি গুলি একটু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিবেন। তিনি লিখিয়া ছিলেন "আমরা চাই শান্তি, চাই সুখ, চাই নিরাপদ ভাব, শ্রীভগবানের অসীম দয়াবলে যাহাতে সেই চিরশান্তি, চিরসুখ, ও চির সম্পদ পাইতে পারি তেমন জীবন, তেমন শরীর তেমন ইন্দ্রিয়, এমন কি তেমন বুদ্ধি বিদ্যাও অনেকে পাইয়াছি, অথচ শান্তি নাই, সুখ কাহাকে বলে তাহাও বোধ হয় জানিনা, ইহার কারণ কি? কারণ কেবল সদুপদেষ্টার ও সদালোচনার অভাব! আর কারণ নিজেদের অলসতা ও ইচ্ছা করিয়া অসদালাপ ও অসৎ সঙ্গ করা। আমরা অনেকেই জানিনা যে, আহার নিদ্রা ও স্ত্রীপুরুষ মিলনাদি কএকটি সাধারণ কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের আর কিছু কর্ত্তব্য আছে। অথচ নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ঐ আহার নিদ্রাদি আমারও যেমন আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু পক্ষীরও তেমন আছে। বহু শাস্ত্রে পরিপক্ক জ্ঞানশীল বড় বড় মহাত্মা মানবজীবনকে যে এত প্রশংসা এত আদর ও এত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন কি জন্য তাহা ভাবিনা বা ভাবিবার সুযোগও হয় না। তাই অনেকের মুখে স্পষ্টই শুনিতে পাই যে "এক প্রকারে দিন চলিয়া গেলেই হইল"। হায়। হায়। বড়ই দুঃখ হয় যে এমন একটা প্রার্থনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবন সাধারণ পশুর সহিত তুলনায়ও যেন তুচ্ছ; কারণ আহার নিদ্রাদি সাধারণ কর্ম্ম গুলিতে পশুরা স্বাধীন আমরা সে বিষয়েও নানা প্রকারে পরাধীন, কারণ তাহাদের আহার নিদ্রার জন্য তাহারা নিরন্তর ভাবেনা বা কোন প্রকার আড়ম্বরের অপেক্ষা করে না, যাহা পায় তাহাতেই পরমানন্দে দিনপাত করে, আমরা যে কোন রকমে দিনপাত করিতেও

দিবারাত্র খাটিয়া খাটিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া ব্যাকুল হই ; সুতরাং ভাবিতে হইবে আমরা শ্রেষ্ঠ কিসে ?

পাঠক পাঠিকাগণ! সত্য সত্যই কি আমরা পশু পক্ষীর হেয় ? সত্য সত্যই কি আমাদের জীবন পশু পক্ষী অপেক্ষা দুঃখের ? আর সত্য সত্যই কি আমাদের জীবনের কার্য্য কোনরকমে দিনপাত করা ? না, তাহা নয়! আমরা শান্তি সুখ ও সুস্থতা অবলম্বনে যাহাতে পরমানন্দ পাইতে পারি তাহাই আমাদের চির প্রার্থনীয়, সর্ব্বদা কিসে সুখে থাকিতে পারি, কিসে আমাদের প্রাণ হইতে হতাশা দুরাশা ও দুশ্চিন্তা বিদূরিত হয় তাহার জন্য সর্ব্বশাস্ত্রসার-ভূত শ্রীভাগবত কি বলিতেছেন শুনুন—

> তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ
> ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
> হৃদ্‌বাগ্‌ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
> জীবেত যোমুক্তিপদে স দায়ভাক্‌

হে ভগবন! যেব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে আপন সঞ্চিত কর্ম্মের পরিণাম বুঝিয়া ঐ কর্ম্ম ফলরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করত, কবে তোমার কৃপা হইবে এই প্রত্যাশা করিয়া জীবনধারণ করে, তোমার ভাবের অমৃতরস পাইয়া জীবন্মুক্তি ধনে ধনী হইবার সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অধিকারী।

শাস্ত্রালোচনা করিয়া ভাবরত্নাকর ভাগবত শাস্ত্র হইতে এই অমৃত বাণীর অনুসরণ করুন অভিমান শূন্য হইয়া যখন যাহা লাভ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন বিষয়ে কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বর কৃপাই কামনা করিয়া অকপট ভাবে পরমেশ্বরে মন প্রাণ অর্পণ করত অক্রোধ পরমানন্দ স্বভাবে চলিয়া যান, সংসার সুখের হইবে, প্রত্যেক কার্য্যে লীলাময়ের লীলার অনুভব পাইবেন, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা যে ধর্ম্ম লইয়া সেই পরমধর্ম্ম ভগবদ্‌ ভাব লাভ হইবে, কোন অশান্তি কোন বিক্ষেপ ও কোন ভাবনা থাকিবে না, ভাবনা রহিত হইয়া সর্ব্বদা অক্রোধ পরমান্দ ও অভিমান শূন্য হইয়া থাকাই পবিত্র জীবন। পবিত্র জীবন, লাভ না হইলে মানুব হওয়া যায়না, মানুষ না হইলে পরমেশ্বরের প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করা হয়না। যাহার পবিত্র জীবন লাভ হইয়াছে সেই ব্যক্তি—

কায়েনবাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনাবানুস্মৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥

শরীর দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা, ইন্দ্রিয় দ্বারা, এবং স্বভাব বশতঃ যাহা যাহা করে সকলই নারায়ণকে অর্পণ করে, অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ হইলে যখন যাহা যাহা করে সকলই ভগবৎ ইচ্ছায় হইতেছে ভাবিয়া, সকলই শ্রীভগবানে সমর্পন করে, কোন কার্য্যেই আপন কর্ত্তৃত্ব রাখেনা যাঁহারা কর্ত্তৃত্বাভিমান্ শূন্য হইয়া সংসারে ভগবদ্ ভাবে থাকেন তাঁহারাই পবিত্র, তাঁহারাই যথার্থ মানুষ, তাঁহারাই আদর্শ পুরুষ। পবিত্রজীবন প্রাপ্ত নরনারীর ব্যবহার অতি সুখময়, কিছুতেই ব্যাকুল হয়না। সুখেতে বিহ্বল হয়না, আর দুঃখেতে অতিশয় ম্রিয়মান থাকেনা, সর্ব্বদাই পরমেশ্বরের ভাবে থাকার জন্য যখন যাহা হয় তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তাহাদের প্রাণে বিশ্বপ্রেমের উদয় হয়, তাঁহারা সামান্য প্রাণি মাত্রেই প্রেমময়ের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন। এই পবিত্র জীবন প্রাপ্ত নরনারী দেব তুল্য, এইভাবে দেব তুল্য হইয়া চিরশান্তি ও ইহপরকাল সুখময় করিতে হইলে সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সাধনতত্ত্বের আলোচনা একান্ত আবশ্যক” দীনবন্ধু এই আবশ্যকতা স্বয়ং যেমন বুঝিয়া ছিলেন তৎসহ শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারে ব্রতী হইয়া ছিলেন। ভগবান, তাঁহার সে সদনুষ্ঠান্ পূর্ণ করিলেন। খণ্ডে খণ্ডে, শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ হইতে লাগিল।

সহায়হীন, ধনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, কিরূপে কেবল শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই বিরাট অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এইরূপে যে দিন শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, সে দিন দীনবন্ধুর কি আনন্দের দিন। সে দিনে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা সন ১৩১৪সালের ভক্তি পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখানে তাহারই কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলাম—

“সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান—এই সত্যটির প্রমাণ পাইয়া ধন্য হইলাম। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পর, আমার সাধনার ধন শ্রীমদ্ভাগবত সরলটীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত সম্পূর্ণ হইলেন। আমি দরিদ্র এবং সহায়হীন হইয়াও আশার

ক্ষীণ আলোক লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধির মহাপথে যে সত্যবলে পদার্পন করিয়াছিলাম, পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘণের ন্যায় আমার পক্ষে যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান, যাঁহার করুণা গর্ভ এই অভয়বাণী কবচের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক বিঘ্ন, বাধা তুচ্ছ করিয়া, কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিতেছিলাম, সেই বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীভগবানের কৃপায় তাহার সফলতা লাভ করিলাম। সেই জন্যই আজ আবেগপূর্ণ প্রাণে উচ্চকণ্ঠে, বন্ধু বান্ধবগণকে জানাইতেছি যে—

"সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান্"

সাংসারিক ব্যাপারে থাকিয়াও অহর্নিশী সাংসারিক সর্ব্ববিষয় হইতে একরকম প্রত্যাহৃত হইয়াই এই দ্বাদশবর্ষ কাল যে আসক্তি যে স্রোত ভাগবত সাধনাভিমুখে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছিল, শ্রীভগবৎ কৃপায় এক্ষণে শ্রীগ্রন্থ সঙ্কলন কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়ায় সেই স্রোত সংযুক্ত হইয়া হৃদয় এক অদ্ভুত পূর্ব্ব আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়াছে। সুতরাং সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ভক্ত হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া, ভগবন্নির্ভরতায় যে অসম্ভবও সম্ভব হয় এই সত্যবীজ বহু ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে বপন করিবার প্রত্যাশায়, সৎ প্রত্যক্ষিত এই অমূল্য সত্যের দ্বারা "ভক্তির" কোমলাঙ্গ অলঙ্কৃত করিলাম।"

"প্রিয় পাঠকগণ! আপনারা যে যে ভাবের সংসারী বা সাধক হউন না কেন, সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান্ এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন। মানুষ আত্মাভিমানে মত্ত থাকিয়া, "আমি করি" ভাবিয়া কার্য্য করিয়াও ফল পায়না এবং নানা প্রকার বাধা বিপত্তিতে অভিভূত হয়। ভগবন্নির্ভরতা রূপ নিরাপদ শান্তিপ্রদ বাঞ্ছিত ফলপ্রদ ভাব অবলম্বন করিতে পারিলে আর কোনরূপ অশান্তি থাকেনা। যাঁহারা একবারও ভগবন্নির্ভরতা রূপ অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়াছেন তাঁহারা চির জীবনে, আর কখনও সে সুখময় ভাব ভুলিতে পারেন না। সকলে শ্রীভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া কার্য্য করুন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ নির্ভরতা ছুটিয়া না যায়; প্রতি কার্য্যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিরতিশয় দয়ার পরিচয় পাইয়া আনন্দে থাকিতে পারি।

(ক্রমশঃ) শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অনুতাপ।

—:০:—

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতে　　ঘাত প্রতি ঘাতে
পাপ পুণ্যে পরিচয়।
অজানা অশ্রুত　　মৌন অনাদৃত
সুখ দুঃখে পরিণয়।
দৈব দুর্ব্বিপাকে　　অদৃষ্ট ফলকে
মানব জন্ম লেখা।
দাগা বুক মাঝে　　রাত দিন বাজে
যাতনায় ঠেকে শেখা।
কেন বা আইনু　　বাজইনু বেণু
সংসার কাননে হায়।
না মিলিল ধন　　জ্বলে গেল মন
নয়ন ভাসিয়া যায়।
সংসার কারাতে　　চির দগ্ধ চিতে
রুদ্ধ বিহঙ্গ মত।
বদ্ধ আছি সদা　　বাসনা, কামদা
কাটে বৃশ্চিক শত।
কিসের লাগিয়া　　যতন করিয়া
বাধিনু সোণার ঘর।
কার তরে বহি　　বিষময় অহি
দগধ পরাণ পর।
কি সুখ পাইনু　　বালুকার রেনু
নদী তীরে বসি গণি।
ভ্রান্ত উপদেশ　　তীব্র উপহাস
সকলের মুখে শুনি

চতুরা রমণী ঠক শিরোমণি
পুত্র কন্যা বন্ধু জন।
সুখের পিয়ারী এ কি ঝকমারি
না মিলিল প্রাণ ধন।
কোথায় বা যাই কি ক'রে জুড়াই
পিয়াসে দগধ প্রাণ।
যুক্ত করে যাচি যথা অভিরুচি
বলি দাও অভিমান।
চাহিনা সম্পদ সঙ্কুল বিপদ
পাশরিব ভব মায়া।
কন্দরে বসিয়া হৃদি তিরপিয়া
ত্যজিব এমর কায়া।
দাও পদতরি ওহে গৌর হরি
লয়ে চল নিজ ধাম।
হও হে প্রকাশ কহে হরিদাস
হই যেন পূর্ণ কাম।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

ব্রহ্মগোপাল বেশং।

(রাজসাহী বৈষ্ণব সমিতিতে পঠিত।)

"বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেন্যস্ত বেণুং॥
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষণং বৈজয়ন্ত্যা।
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতী শতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশং॥"

কি আশ্চর্য্য! যিনি পরব্রহ্ম, তিনি কি না গোয়ালার ঘরে যাইয়া গোপাল হইয়া বসিয়াছেন। গোপালনই তাঁহার কার্য্য হইয়াছে। ব্রজের বনে বনে কঠিন কঙ্কর ও কুশাঙ্কুরের মধ্যে হাঁটিয়া হাঁটিয়া এখন তাঁহাকে গোচারণ করিতে

হয়। নন্দের বাধা মাথায় করিয়া বহিতে হয়। একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম—"ঠাকুর! তুমি সম্ভ্রান্ত জ্ঞানী দিগের কত বড় কি একটা ছিলে, কিসের দুঃখে গোয়ালাদের ঘরে জাত হারাতে আসিলে?" তিনি বলিয়া ছিলেন "তুই বুঝ্‌বি কি? আমি গব্য রস টুকুর লোভ ছাড়িতে পারি না। একটু দুগ্ধের জন্য আমি পাগল। চির দিনই আমার দুধের নাড়ী, তাহাতে আবার শুষ্ক জ্ঞানীদের সঙ্গে মিশে মিশে একেবারে শুক্‌ন কাটখানা হ'য়ে গিয়েছি, তাই শুদ্ধ গো-রসটুকুর জন্য আমার গোপের ঘরে জাত দেওয়া।" আমি ভাবিলাম তাইতো তিনি রসস্বরূপ রসময়, রসিক শেখর তাঁহার দুধের নাড়ীই ত বটে? আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "বেশ জাত দিলে দিলে তা'দের বাধা বইতে গেলে কেন?" তিনি ছল ছল চক্ষে বলিলেন—"তবে কে বহিবে? তাহাদের কে আছে? আমিই যে তাহাদের সর্ব্বস্ব তাহারা যাহা কিছু করে সব আমারই জন্য। এই দ্যাক্ তা'রা আমার জন্য ক্ষীর সর নবনী কেমন থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে আমার নিজ হাতে খে'য়ে পেট ভরে না ব'লে, তারা আমাকে এগুলি খাইয়ে পর্য্যন্ত দেয়, আর আমি তাদের বাধাটা বইতে পা'রব না! সংসারের কুটিল পথে পদে পদে বাধা। নন্দের সে বাধা আমি মাথায় করিয়া বই।" আমি বলিলাম "তুমি গোপরাজ-নন্দন, তোমার অসংখ্য ধেনু, যদি একটা গাই গরু দিতে, তবে আমিও তোমাকে দুধ দই যোগাইতাম।" গোপাল হাসিয়া বলিলেন—"বলিস্ কি লো ছুঁড়ি, তুই গোধন নিবি, যা দিয়েছি তা'ই পুষ্‌তে পারিস্‌নে আবার গরু।" আমি হতভম্ব হইয়া তাহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলাম। কে যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—"তোর লজ্জা নাই, ও তোকে একটা কেন দশ দশটা গরু * দিয়ে রেখেছে তারই পেট ভরা'তে পারিস্‌নে আবার গরু চাইতে যাস্?" আমার লজ্জা আসিল, আমি অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় ফিরিয়া দেখি, নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া আড় নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে।

পাপিয়ার পিউ পিউ তানে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল নয়ন মেলিয়া দেখি নিশা অবসান হইয়াছে। উষার অরুণ রাগে পুলকিততনু বিহঙ্গচয় তরুশাখায়

* দশ ইন্দ্রিয়। গো—ইন্দ্রিয়।

বসিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রভাতি গাহিতেছে। শিশির সম্পৃক্ত মলয়ানিল মৃদু হিল্লোলে ঘুমন্ত বিশ্বকে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। সেই ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে আমি জাগরিত হইলাম। মনটা কেমন গদ গদ হইল, ভাবিলাম, ভোরের স্বপ্নতো সত্য হয়, আমার ভাগ্যে কি তাহাই হইবে; তখনই জ্ঞান আসিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল "স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তামাত্র" আমার সরল প্রাণ নিরস হইয়া গেল, আবার যে আমি সে আমিই হইলাম। ইহার দুই দিন পরে গুরুপুত্র বাড়ীতে পদার্পন করিলেন, ভাবিলাম ভালই হইল, গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু তাঁহার পাগলামী ঝোঁক আছে, সময় বুঝিয়াই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এক দিন তিনি আহারের পর বসিয়া পান চিবাইতেছেন, আর বিশ্রাম করিতেছেন, মুখ খানি বেশ হাসি হাসি, সময় বুঝিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম দাদা গোসাঞি! আমার গরু পুষিবার সাধ হইয়াছে; তিনি বলিলেন পোষা গরুর আর পুষ্‌বি কি? কথাটা মনে প্রাণে ঐক্য হইল। ভাবিলাম শব্দার্থের সহিত ভাবার্থের কি অপূর্ব্ব মিলন। গো শব্দে গরু, আবার গো শব্দে ইন্দ্রিয়। দাদা গোসাঞি আমার মতলব বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, ভায়া হে! ভাবুক না থাকিলে তোমার শব্দের মর্ম্ম বুঝিত কে? আমি তখন সেই অন্তর্যামী ঠাকুরনন্দনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলাম, তিনি আমাকে আদরের সহিত চুম্বন করিলেন, তাঁহার নয়নোদ্বেলিত অশ্রু আমার গণ্ডকে অভিষিক্ত করিয়া ঝরিয়া পড়িল। আমার পাষাণ প্রাণও গলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম দাদা অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এ গরুতে দুধ দেয় না কেন? তিনি বলিলেন, ভাই গরুতে খেতে না পেলে কি দুধ দেয়? তোমার বাড়ীর সম্মুখেই মরুভূমি তাহাতে আবার গরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে রেখেছ, খিদে পেলেই তাহারা বরাবর মরুভূমিতে চর্‌তে যায়; সেখানে গিয়ে আর পাবেকি, দু একটা কাঁটা গাছ যা চোখে পড়ে তাই চিবাইতে থাকে, এতে কি আর পেট ভরে। বিশেষতঃ গাই গুলো খোলা থাকায় পাড়াপড়শীর সর্ব্বদাই অনিষ্ট করে। কাহাকেও শিংএর গুতো দিয়ে ফেলিয়ে দেয়; কাহাকেও লাথি মারে অথবা কাহারও ঘরে ঢুকিয়া জিনিসপত্র অপচয় করে। ভাবিলাম কথাটা সত্য; দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গুলি শুষ্ক বিষয় মরুতে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে, কণ্টকবৃক্ষ চিবাইলে ইহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে কেন! ইহাতে কেবল আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হয়। সম্প্রতি ইহারা এতই বেয়াড়া হইয়া

উঠিয়াছে যে, সুবিধা পাইলেই লোকের অনিষ্ট করিয়া বসে। কলহ কচ্‌কচি, অত্যাচার, উৎপীড়ন একটা না একটার মধ্যে ইহাদিগকে দেখিতে পাই; কিন্তু ইহাদের দোষ কি; সকল দোষ ত মনেরই। মন ইহাদের রাজা, ইহারা মনের অনুগামী, মন যাহা করায়, ইহারা তাহাই করে।

দাদা ঠাকুর মন জানিয়া বলিলেন—ভাই! মন সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা বটে; কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়গুলি বাদ দিলে মনের পৃথক অস্তিত্ব বড় মালুম হয় না। একটা কাহিনী বলি শুন। এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন:—একদিন মুখ, হাত, এবং পা পরস্পর যুক্তি করিল, আমরা সকলে খাটিয়া মরি, আর পেট বসিয়া খায়। অতএব এখন হইতে আমরাও বসিয়া থাকিব। ক্রমে এ কথাটা পেটের কাণে উঠিল, তিনি বলিলেন "তথাস্তু"। এইরূপে একদিন গেল, দুইদিন গেল, তিনদিনও যায়। ক্রমে হাত নড়েনা, পা উঠেনা মুখখানি হেট হইয়া থাকে, কিছুই আর ভাল লাগেনা; তখন সকলে মিলিয়া পেটের নিকটে গেল; পেট বলিল আবার কেন? তখন সকলে মিলিয়া পেটের পায়ে পড়িল, বলিল, ভাই! যাহা হইবার হইয়াছে, তুমি এখন কিছু খাও, নচেৎ আমরা আর বাঁচিনা তখন অনেক অনুনয় বিনয়ে উদর আহার করিল এবং উদরের পরিতোষে মুখ হাত ও পা সকলেই পরিতুষ্ট হইল। তেমনি মনও ইন্দ্রিয়গুলির উদরস্থানীয়; মনের তৃপ্তিতেই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। মনরূপ পেটের পরিতুষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়গুলি চারিদিকে ছুটাছুটী করিতেছে; যেখানে যাহা পাইতেছে, তাহাই আনিয়া যোগাইতেছে কিন্তু তাহাতে মনের মন উঠিতেছেনা। সে তৃপ্তি লাভ করিতেছে না, সর্ব্বদাই চঞ্চল। তাই যদি তোমার ইন্দ্রিয়রূপা ধেনুর পেট ভরাইতে চাহ তবে নবদূর্ব্বাদল পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অন্বেষণ কর। যদিও তোমার বাড়ীর সম্মুখেই মরুভূমি, কিন্তু জানিও মরুভূমিতেই মরুদ্যান জন্মে। তাপিত তৃষিত পান্থ, পরিশ্রান্ত হইয়া এই ওয়েসিসে আসিয়া বিশ্রাম করে; যাহারা ইহার খোজ খবর রাখে না তাহারা বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তরে প্রচণ্ড রবি তাপে দগ্ধ হইয়া মরে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম নবদূর্ব্বা কি? তিনি বলিলেন সাধারণতঃ নবধা ভক্তির নামই নবদূর্ব্বা। ইহা লতাইয়া যায় এজন্য ইহার আর একটি নাম "লতা।" যদি তোমার ইন্দ্রিয়রূপা গাভীকে এই নবদূর্ব্বা পেট ভরিয়া খাইতে

দাও, তবে দেখিবে তাহাদের সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া যাইবে এবং অল্প দিন মধ্যেই তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী হইয়া উঠিবে। যাহার নয়ন হরিরূপ দর্শন করে, কর্ণ হরিনাম শ্রবণ করে, জিহ্বা হরিগুণ কীর্ত্তন করে, মন হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে। হস্ত হরিসেবায় নিযুক্ত থাকে, মস্তক হরিচরণে লুণ্ঠিত হয়; যে আত্মবিনিময়ে হরিদাস হইয়াছে, হরিতে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছে, মনাদি ইন্দ্রিয় তাহাদের পরিতৃপ্ত হয়, পেঠ ইহাতেই ভরে। বাসনার নিবৃত্তি ইহাতেই হয়। আমি বলিলাম প্রভো! আমার গাভীগুলি যে এ তৃণ খাইতে চাহে না! কত যত্ন করিয়া মুখের নিকট ধরি, ইহারা শুঁকিয়া বিমুখ হইয়া থাকে। খুব চেষ্টা চরিত্র করিলে ইহারা দু একটী লইয়া মুখ নাড়িতে থাকে, কিন্তু তাহাও উদরস্থ করে না।

দাদাপ্রভু হাঁসিয়া বলিলেন তা হয়, শুক্‌নো গোয়াল থেকো নাড়ীমরা গরুকে যদি দিব্য করিয়া খৈল ভূষি দিয়া সানি মাথাইয়া দেও, তবে সে প্রথম প্রথম মুখ তুলিয়া থাকে, তারপর ক্রমে যখন চাট্‌ পায়, তখন আর ছাড়িতে চাহে না।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম—সে নব তৃণ বহুল ভূখণ্ড কোথায়? দাদা ঠাকুর বলিলেন "বেশ? সে মাঠটার খবরও জাননা? যেখানে সেই কাল রাখাল বালকটী বাঁশী বাজায় আর গরু রাখে।

আমি বলিলাম—ব্রজভূমি নাকি? দাদাঠাকুর চটিয়া খুব লাল হইয়াছিলেন, আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিলেন—"দিনে দিনে যে কচি খোকাটী হচ্ছিস্‌"। ব্রজমাঠেই যে গোষ্ঠ ইহাতে আবার নাকি কি? আমার আর কথা বলিতে সাহস হইলনা, ভয়ে অধোবদনে রহিলাম। এইরূপে কিছুক্ষণ গেল, তাহারপর চাহিয়া দেখি মেঘখানি সরিয়া যাইতেছে এবং চন্দ্রানন হইতে হাস্যকৌমুদি অল্পে অল্পে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দাদাপ্রভু আমার ভাবগতিক দেখিয়া এবারে আপনা হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন "ভাইরে! চম্‌কিওনা, আমি তোমাকে সে ব্রজভূমির কথা বলিতেছি না। আর তুমি এই কাঁচা বয়সে সেখানে যাইয়াই কি করিবে? তোমার স্ত্রী, পুত্র পরিজন সকলই আছে, তুমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইয়া ঠিক থাকিতে পারিবে না। মনে উৎকট বৈরাগ্যের উদয় না হইলে লোকে সে

ব্রজারণ্যে যায় না। সে বনে যাইতে হইলে বনবাসীর বেশ ধরিতে হয়, কৌপিন পরিতে হয়, ছেঁড়া কন্থা গায় দিতে হয়, "হাতে করোয়া নিতে হয়" অহঙ্কার মাৎসর্য্য ভুলিয়া দীনের অধীন ভাব ধরিতে হয়। আর মাত্র নিজ গাভী কয়টী লইয়া চুপে চুপে ঘরের বাহির হইতে হয়।

সে ব্রজভূমি নির্জ্জন, জন কোলাহল শূন্য, প্রশান্ত তাহার প্রান্ত বহিয়া কুল কুল রবে কালিন্দী যমুনা প্রবাহিতা। সেখানে বৃক্ষগুলি ফলভরে অবনত পুষ্পতরু বিকশিত, কত শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয়। সেখানে বিহগতানে শ্যামগান ও ভ্রমর ঝঙ্কারে ওঙ্কার ফুটিয়া উঠে। গাভীগণের চারণোপযোগী এমন উৎকৃষ্ট ভূমি আর নাই। এখানে গোকুলচন্দ্র স্বয়ং গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এজন্য ইহার আর একটী নাম গোকুল। এখানে প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া গাভীগণের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। স্বভাবে বিচিত্র শোভাস্বাদে ইহাদের স্বভাবের কুভাব বিদূরিত হয়। এই স্থানে গবিন্দ্রিয়গণ দ্বেষ, হিংসা ভুলিয়া হরিলীলামৃত আস্বাদ করে। হরিনামামৃত পান করে। গোবর্দ্ধন গিরিকন্দর গোচারণের প্রকৃষ্ট স্থান; এখানে গোগণ শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এ জন্য ইহার নাম গোবর্দ্ধন। কত সাধু ভক্ত ইহার কন্দরে কন্দরে গো সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু এ' ব্রজভূমি তোমার জন্য নহে। যাহারা মান সম্মানের মুখে ছাই দিয়া কুল শীলে জলাঞ্জলি দিয়া সেই কালছোঁড়াটার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের বাহির হইয়াছে, এ ব্রজের অধিকার তাহাদেরই। তোমার ব্রজ অরণ্য নহে, উদ্যান। তাহা এই বিষয় মরুর মধ্যস্থ উর্ব্বর ভূখণ্ড। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ওয়েসিসের নাম "হরিভক্ত" রাখিয়াছেন, ভাইরে! ব্রজনাথ ভক্তের হৃদয়ব্রজে স্বয়ং গোচারণ করিতেছেন এজন্য তথাকার গাভীগুলি যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি দুগ্ধবতী, যদি তুমি কখন সে ব্রজে যাও ত দেখিবে তাহাতে নব নব শ্যাম-দূর্ব্বা কেমন শোভা পাইতেছে। সৎপ্রবৃত্তিরূপ বৃক্ষগুলি ফলভরে কেমন অবনত রহিয়াছে। তাহার কন্দরে কন্দরে প্রেম প্রসূন কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার সংস্পর্শে কত শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া নূতন পত্র পুষ্পে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। যদি তোমার নিরস তরুকে সরস করিতে চাও, তবে গাভীগুলি চরাইবার উপলক্ষ করিয়া এক একবার তথায় যাইও, দুই কার্য্যই হইবে।

আমি করজোড়ে বলিলাম প্রভো! আমার গাভীগুলি যে সেখানে কিছুতেই যাইতে চাহেনা! আমিও গাভীগুলা ছাড়িয়া এক পা নড়িতে পারিনা, সুতরাং আমারও যাওয়া হয় না।

আমার দয়াল প্রভু বলিলেন ভাইটী, কামাদি ছয়টী চোর তোমার অজ্ঞাতে এই ধেনুগুলির পশ্চাতে লাগিয়া আছে। তাহারা জাতিতে চর্ম্মকার, কোন অন্ধকার স্থানে লইয়া গিয়া, গাভীগুলির চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া লইবার বাসনায় ইহাদিগকে বিষময় কণ্টক বৃক্ষের লোভ দেখাইতেছে। ধেনুগুলি সেই লোভে পড়িয়া তোমার সহিত যাইতে চাহে না। চঞ্চলতা প্রকাশ করে। যদি তুমি তাহাদের রাখালী করিতে না পার, তবে সেই রাখাল বালকটীকে ডাক্ দিও। সে বড় পাকা রাখাল; তাহার নিকট যতই কেন দুষ্ট গরু লইয়া যাও না সে সব ঠিক করিয়া ফেলিবে! তুমি যাহাদের গলায় সংযমের দড়ি দিয়া টানা টানি করিয়াও সুপথে আনিতে পার না, তেমন কত শত দুষ্ট সে রাখাল বালকের চোখের ইঙ্গিতে সোজা হইয়া সুপথে চলিতে থাকে।

সে রাখাল বড় সুন্দর বাঁশী বাজাইতে জানে, তাহার বেণুগীতে যোগীগণ যোগ ভুলিয়া যায়, মুণিগণের ধ্যান টলিয়া যায়, পাষাণ বিগলিত হয়; শুষ্কতরু মুকুলিত হয়, পার্থিব গতি পরিত্যাগ করিয়া প্রেমযমুনা উজান ধায়, আর গাভীগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া বৎস্য জ্ঞানে শ্যাম অঙ্গ চাটিতে থাকে। রাখালের সেই বেণুটীর নাম কলবেণু। ঋষিরা বলিয়াছেন "গোবিন্দং কলবেণু বাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে"—কলবেণু-বাদনকারী সেই গোবিন্দকে ভজনা করি। এ বেণু সর্ব্বদাই বাজিতেছে বাজার বিরাম নাই। বিষয় কোলাহলের মধ্য হইতে ইহা শ্রুতিগোচর হয় না। এই কলবেণু শুনিতে হইলে উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হয়; যদি ভাগ্যক্রমে গুরুরূপ অনুকুল পবনের যোগে বিষয় কোলাহল ভেদ করিয়া বেণুর সেই কলনাদে "ক" কার "ল" কার এবং নাদাদি বীজরূপে কর্ণ বিবরে প্রবেশ করে, তবেই মনবাসনা পূর্ণ হয়। কিন্তু সেই রাখালের দেশে না যাইলে এই বেণুর গান সুস্পষ্ট বুঝা যায় না এবং ইহার মাধুর্য্যও সম্যক উপলব্ধি হয় না। ভাইরে, যদিও সে রাখাল বালক, কিন্তু তাহার গুণে বনের পশু পাখীও বন্দী হয়। আর তোমার ধেনু কয়টা বশীভূত হইবে না?

সে হৃষীকৃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গুলিকে সুপথে পরিচালিত করে, এ জন্য তাহার নাম হৃষীকেশ। গোচারণেই তাহার আনন্দ, এ জন্য তাহার নাম গোবিন্দ। গোপালনই তাহার কার্য্য, এ জন্য তাহার নাম গোপাল। তাহাকে গোপালনের ভার অর্পণ করিলে তোমার গাভী গুলি অল্পদিনেই হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী হইয়া উঠিবে। তাহাদের মনবৃত্তিরূপ স্তনে প্রেম দুগ্ধের সঞ্চার হইবে ক্রমে তাহারা এতই পয়স্বিনী হইবে যে স্তনে আর দুগ্ধ ধরিবে না। নয়নরূপ ছিদ্র পথ দিয়া অবিরত শ্রাবিত হইতে থাকিবে। তুমি তখন দুহিয়া দুহিয়া হৃদয় ভাণ্ডে রাখিবে এবং লালসাগ্নিতে ধিকি ধিকি জাল দিয়া তাহা হইতে ক্ষীর সর নবনী প্রস্তুত করিবে। ক্ষীর, সর নবনীই গোপাল সেবার প্রকৃত আয়োজন। যতই কেন উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা কর না, প্রেম না থাকিলে কিছুতেই শোভা পায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দের মুখ দিয়া ইহাই বলাইয়াছেন। ভাই, দুধের গোপাল নবনী বড় ভালবাসে, তাহর দুধের নাড়ী, দুধ না হইলেই চলে না, এই একটু দুধের জন্যই সে গোয়ালের ঘরে জাতি কুল মজাইয়াছে; নচেৎ তাহার কিসের অভাব ছিল। এমন উচ্চ পবিত্র ব্রাহ্মণ কর্তৃক লালিত পালিত, কত আদর কত যত্ন, সব পরিত্যাগ করিয়া কেবল একটু নবনীর জন্য গোয়ালিনী যশোদার বন্ধন গ্রহণ করিয়াছে। দাদা গোসাঞি ভাবাবিষ্ট হইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ব্রহ্ম গোপাল বেশং" ঐ দ্যাখ, ব্রহ্ম বালগোপাল বেশে কিঞ্চিৎ নবনীর জন্য তোর নিকট হাত পাতিয়া আছে, ননী দে।

আমার কর্ণে তখনও বাজিতে ছিল "ব্রহ্ম গোপাল বেশং।" আমি গলবস্ত্রে বলিলাম গুরো! আমার গৃহ যে দুগ্ধশূন্য, আমি যে ক্ষীর, সর, নবনী কিছুই প্রস্তুত করিতে জানি না, গোপালের করে কি দিব।

তিনি বলিলেন যদি তুমি গোপালকে ননী খাওয়াইতে চাহ তবে তোমাকে গোয়ালাদের অনুগত হইয়া কিছুদিন ইহার কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। ব্রজবাসী গোপগণ এ কার্য্যে সুন্দর পরিপক্ব। তুমি তাহাদের অনুগত হইয়া দুগ্ধাবর্ত্তন, দধিমথন প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা কর। কিন্তু ব্রজের গোপীরাই এককার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৎপরা, তাহারা প্রেম দুগ্ধ হইতে স্নেহ, মান, প্রনয় রাগ অনুরাগ, ভাব, মহাভাবরূপ ক্ষীর সর নবনী যেমন সুন্দর প্রস্তুত করিতে পারে, তেমন আর কেহ পারে না। যদি তুমি তাহাদের অনুগত হও তবে শীঘ্রই

একটী পাকা গোয়ালিনী হইতে পারিবে। তাহাদের সংসর্গের গুণে তোমার পুরুষোচিত পৌরুষভাব ঘুচিয়া গিয়া, রমণী স্বভাব সুলভ কোমলতা আসিয়া পড়িবে। সেইটী তোমার প্রকৃত বেশ।

জীব সংসারী, কিন্তু সে সংসার কয়জন করিতে জানে। অধিকাংশ লোকই সংসাজিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। যাহারা ভাগ্যবান, তাহারাই সার হইয়া প্রস্থান করে। ভগবানের তিন শক্তি। প্রথম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি দ্বিতীয় বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি, তৃতীয় তটস্থা বা জীবশক্তি। জীব ভগবানের স্বরূপ, মায়া এই উভয় শক্তির তটে বাস করে. এজন্য তাহাকে তটস্থা শক্তি বলে। ভগবৎ মায়ার নাম সং,এবং তাহার স্বরূপ শক্তির নাম সার। তুমি জীব এই সংসারে বাস করিতেছ। এজন্য তোমাকে সংসারী বলে। তুমি এখন সং সাজিয়ো রহিয়াছ। সংসঙ্গের বাতাসে তোমার এই "সং" টুকু খসিয়া "সার" ভাগ প্রকাশ পাইলেই তোমার প্রকৃত মুর্ত্তি দৃষ্ট হইবে। মানুষ বুঝিত না পারিয়া এই পঞ্চভূতময় "সং" টুকুকেই নিজ দেহ বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা তাহার দেহ নহে, "সং।" ইহাকে তুমি বহিরাবরণ বা বাস গৃহ বলিতে পার। সর্প যেমন ভিতর ভিতর একটী দেহ আশ্রয় করিয়া পুরাতন খোলস পরিত্যাগ করে। ভক্তিমান ব্যক্তিও তদ্রূপ ভজন সিদ্ধ দেহ আশ্রয় করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ভজন সিদ্ধ দেহই জীবের প্রকৃত দেহ। ভজন দ্বারা সে দেহ নূতন করিয়া লাভ হয় না। জীব স্বরূপতই কৃষ্ণের নিত্য দাস। সাধন ভজনের দ্বারা তাহার মোহ আবরণ সেই সংটুকু শিথিল হইলে সে নিজেই নিজের দেহ চিনিয়া লয়। তখন তাহার এই বাহ্য দেহের প্রতি আর আত্মবুদ্ধি থাকে না, সে তখন স্ব স্বরূপে বাস করে এবং যতদিন বহিরাবরণটা একেবারে খসিয়া না পড়ে, ততদিন সে ইহার মধ্যে থাকিয়াও মুক্ত পুরুষের ন্যায় সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে, সংসারের রোগ, শোক. দুঃখ, দারিদ্র কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে তখন বাহ্য দেহটীকে দেহ মনে না করিয়া গৃহ মনে করে, এবং পরমানন্দে তাহার মধ্যে বাস করিয়া প্রেম সেবায় নিযুক্ত থাকে। সেই সিদ্ধ দেহখানি রসের, সে রস জড়ময় নহে, চিন্ময় সংসারী জীবের "সং" টুকুই জড়, সার ভাগ চিন্ময়। এই চিন্ময় দেহ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব ভেদে পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে মধুর ভাবাশ্রিত চিন্ময়

দেহের নামই যোগী দেহ। যখন তুমি এই গোপী দেহ ধারণ করিয়া রূপে গুণে ডগ্‌মগী হইয়া উঠিবে এবং এই পাঞ্চভৌতিক দেহরূপী গৃহে বাস করিয়া দধি দুগ্ধের ব্যবসা আরম্ভ করিবে, তখন জানিতে পারিবে সেই রাখাল সহজ নহে। সে যেমন চোর, তেমনিই লম্পট। তোমার হৃদয় ভাণ্ড হইতে কোন পাকে প্রণয় নবনী চুরি করিয়া সে প্রস্থান করিবে, তাহার টেরও পাইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ চুরিতে তোমার দুঃখ না হইয়া আনন্দ হইবে; জড়দেহের সহিত চিন্ময় দেহের বিপরীত সম্বন্ধ। জড়দেহে যাহা দুঃখ, চিন্ময় দেহে তাহা সুখ, সুতরাং তোমার এ চুরি সুখকর হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু রাখাল কেবল চুরি করিয়াই ছাড়িবে না। সে তোমার রূপ যৌবনের প্রতিও কাল হইবে। জ্ঞান মানুষকে প্রবীন ও বৃদ্ধ করে, প্রেমে যৌবন জিয়াইয়া রাখে। তুমি প্রেমময়ী সুতরাং নবীনা কিশোরী, তোমার এ হেন রূপ যৌবন সে লম্পট সম্ভোগ না করিয়া ছাড়িবে না। সে ক্রমেই তোমার নিকট ঘনাইয়া বাসবে এবং অল্প দিনেই তোমার সহিত নিগুঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। এই রূপ করিতে করিতে একদিন তুমি তাহার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আত্ম হারা হইয়া পড়িবে, এই সুযোগে সেই লম্পট তোমার ভগ্ন পাঞ্চভৌতিক গৃহ হইতে তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিবে। পরে যখন তুমি সংজ্ঞালাভ করিবে তখন দেখিবে এক অজ্ঞাত রসের দেশে আসিয়াছ। সে দেশের সকলই চিন্ময়, এই বলিয়া তিনি সুর করিয়া একটী পদ ধরিলেন :—

সেই রসের † দেশে রসের মানুষ রসরঙ্গিণী সঙ্গে।
করে, নিতুই নূতন রসের খেলা নব রস রঙ্গে॥
সেথা, রসের মাটী রসের জল রসের বাতাস বয়।
রসের আগুন রসের আকাশ রসের চন্দ্রোদয়॥
সেথা, রসের হাট রসের বাট রসের ঘর বাড়ী।
রস লইয়া ঘর করা রসের পুরুষ নারী॥
(তাদের) রসাধরে রসের হাঁসি রসের নয়ন মন।
রসে নাওয়া রসে খাওয়া রসেরই শয়ন॥

† আনন্দ চিন্ময় রস।

(সেথা) রসের শুক রসের সারী রস পিঞ্জরে বসি।
বলে, রসে চলি রসের বুলি, রসে পড়ে খসি॥
(কত) রসের ধেণু রসের বাঁটে রস দুগ্ধ ঝরে।
কত রসের গোপ রসের হাতে রসভাণ্ড ধরে॥
(যত) রসের নারী রস দুগ্ধ আউ'টে রসে রসে।
(করে) রসের ক্ষীর ক্ষীরসা সর ননীসব রসে॥
(সেথা) রস হিল্লোলে রস কল্লোলে রসের নদী বয়।
(কত) রসের প্রাণ রসের সুরে রসের কথা কয়॥
(সেথা) রসের সরে রসের কমল রসে টল্ টল করে।
(যত) রসের মরাল রসের মৃণাল রসের লোভে চরে॥
(সেথা) রসের গাছে রসের পাতা রস ফুলফল ধরে।
(ব'সে) রসের ডালে রসের পাখী রস গানটী করে॥
(কত) রসের লতায় রসের কলি রসেই ফুটে রয়।
(যত) রসের ভ্রমর রসের তানে রসের মধু খায়॥
(সেথা) রসের মেঘে রস দামিনী রসের শোভা ধরে।
রস ভাদরে রসের বাদর রসরসিয়ে ঝরে॥
(দেখে) ঐ রসের মেঘ রসের চাতক রসগগনে ধায়।
(কত) রসানন্দে রসামৃত রসে রসে খায়॥
(দেখে) রস কাদম্বিনী রসের ময়ূর রসের পেখম ধরে।
(ফুলায়ে) রসকণ্ঠ রসের তালে রস নৃত্য করে॥
(সেথা) রসের চাঁদে রস কৌমুদী রস ছড়ায়ে যায়।
ব'সে) রস রসালে রসের কোকিল রসের কুহু গায়॥
(সেথা) রস কদম্বে রসিকেন্দ্র রসভঙ্গি হ'য়ে।
(করে) রসের হাঁসি রসের বাঁশী রসের করে লয়ে॥
(কিবা) রসনয়নে রস চাহনী ধরে রসের তান।
(যত) রসনবীনা রসে ভাসে শুনি রসের গান॥
যারা, সেই রসের দেশের রস পেয়েছে রসের মানুষ তারা।
তা'দের সরসে রস বিরসে রস রসের ধারা কারা॥
ভাইরে রসে পাগল তারা।

আমি এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া ছিলাম, প্রাণস্পর্শী সুরটী বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি প্রভুর নয়ন দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু পতিত হইতেছে। আমি আর ঠিক থাকিতে পারিলাম না। আরাধ্য ইষ্টদেবের চরণ প্রান্তে পড়িয়া গেলাম এবং উচ্চৈস্বরে বলিলাম :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রভু আমার মেঘ গম্ভীর ধ্বনীতে বলিয়া উঠিলেন :—

"ব্রহ্ম গোপাল বেশং—ব্রহ্ম গোপাল বেশং"

শ্রীগোপীবল্লভ গোসাঞি।

শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গার।

—:০:—

(১) মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥

ধনলাভ তৃষ্ণা মূর্খ! কর পরিত্যাগ।
মন প্রতি মন্দবুদ্ধে! হও বিতরাগ॥

নিজ কর্ম্ম ফলে যাহা লব্ধ হয় বিত্ত।
তাহাতেই বিনোদন কর তব চিত্ত॥

(২) কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ,
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

কে হয় তোমার প্রিয়া, কেবা তব পুত্র?
পরিদৃশ্যমান বিশ্ব অতীব বিচিত্র॥

এসেছ বা কোথাহ'তে, তুমি কা'র জন?
এই তত্ত্ব ওহে ভাই! করহ চিন্তন॥

(৩) মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময় মিদ মখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন, জন, যৌবনের না করিহ গর্ব্ব।
নিমেষে হরিয়ে লয় মহাকাল সর্ব্ব॥

ত্যজি' এই মায়াময় অখিল সংসার।
ব্রহ্মপদ জানি' ইথে পশহ সত্বর॥

(৪) নলিনীদলগত জলমতি তরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

পদ্মপত্র স্থিত নীর চঞ্চল যেমন।
অস্থির তেমতি অতি হয় এ' জীবন॥

সাধুর এ' জীবনে শুধু ক্ষণতরে।
তরণী তরণে হয় ভব পারাবারে॥

(৫) যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

যে'রূপ জনম হয় সে'রূপ মরণ।
জননী জঠরে হয় আবার শয়ন॥

সংসারে এরূপ হয় পরিস্ফুট দোষ।
কেমনে ইহাতে নর! তোমার সন্তোষ?

(৬) দিন যামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ॥

দিন যায় নিশা আসে, সায়ং ও প্রভাত,
শিশির বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত॥

করিতেছে কাল ক্রীড়া, যাইতেছে আয়ু।
তথাপি মানব নাহি ত্যজে আশাবায়ু॥

(৭) অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্ত বিহীনং জাতং তুণ্ডং।
কর-ধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং॥

রজত বরণ কেশ, শরীর গলিত।
বদনের দন্ত সব হয়েছে স্খলিত॥

শোভিতেছে কর ধৃত কম্পান্বিত দণ্ড।
তথাপি করে না ত্যাগ নর আশা ভাণ্ড।

(৮) সুরবর মন্দির-তরুতল বাসঃ,
শয্যা ভূতল মজিনং বাসঃ।
সর্ব্ব পরিগ্রহ ভোগ ত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥

বাসস্থান দেবালয় কিম্বা তরুতল।
পশুচর্ম্ম পরিধান, শয়ন ভূতল॥

সকল প্রকার সুখ-সম্ভোগ বর্জ্জন।
এ বৈরাগ্য সুখ কা'র করেনা সাধন?

(৯) শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মাকুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং॥

শত্রু, মিত্র, বন্ধু, পুত্র, সন্ধি, বিগ্রহেতে।
যতন করিও নাকো এই সকলেতে॥

সর্ব্বরূপ বিষয়েতে সমচিত্ত হও।
যদ্যপি ত্বরায় তুমি বিষ্ণুপদ চাও॥

(১০) অষ্টকুলা চল সপ্ত সমুদ্রাঃ,
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদাপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

অষ্টকুলাচল, ব্রহ্মা, শিব, দিনকর।
লবণাদি সপ্ত সিন্ধু আর সুরবর॥
তুমি, আমি, কোনজন চির নাহি র'বে।
করিতেছ কেন আর শোক তুমি তবে?

(১১) ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ,
ব্যর্থং কুপ্যসি মষ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং,
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদ জ্ঞানং॥
তোমাতে, আমাতে, সর্ব্বে এক বিষ্ণু স্থিত।
আমাতে অসহ্য হ'য়ে অযথা কুপিত?
স্ব আত্মাতে সর্ব্ব আত্মা কর দরশন।
সকল বিষয়ে ত্যাগ কর ভেদ জ্ঞান॥

(১২) বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত·
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিন লগ্নঃ॥
বালক সতত রহে ক্রীড়াতে আসক্ত।
তরুণ তরুণী প্রতি হয় অনুরক্ত॥
প্রাচীন মানব সদা রহে চিন্তান্বিত।
পরম ব্রহ্মেতে কিন্তু কেহ না' আসক্ত॥

(১৩) অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈবা বিহিতা রীতিঃ॥
'অনর্থেরি মূল অর্থ' ভাব তুমি নিত্য।
তাহা হ'তে সুখলেশ নাহি জন্মে সত্য॥
সন্তান হতেও ধনী ভয় পায় মনে।
বিহিত রয়েছে এই নীতি সর্ব্বস্থানে॥

(১৪) যাবদ্বিত্তো পার্জ্জন শক্ত-
স্তাবন্নিজ পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর দেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

কর তুমি যদবধি ধন উপার্জ্জন।
পরিজন তদবধি করিবে যতন॥

জরা হেতু জীর্ণ দেহ যখন হইবে।
গৃহেতে সংবাদ তব কেহ না' লইবে॥

(১৫) কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহং।
আত্ম-জ্ঞান-বিহীনা মূঢ়া-
স্তে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়াঃ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ করিয়া বর্জ্জন।
'কে আমি' এ' আত্মতত্ত্ব কর দরশন॥

আত্মজ্ঞান পরিত্যক্ত মূঢ় নরগণ।
পচিতে থাকয়ে তারা নরকে ভীষণ॥

শ্রীচুণী লাল চন্দ্র। (অনুবাদক)

প্রেমভর্ৎসন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

বিষয়াশক্ত জীব নিজের "কর্ম্মবশতঃ দুঃখ পায়; তুমি কি করিবে?? একথা বলিতে পার। কিন্তু যাহাদের একমাত্র করণীয় তুমি, চিন্তনীয় তুমি তাহাদের কাঁদাও কেন? যাহারা স্ব—ভাব পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভাবে

মজিয়াছে তাহাদিগকে পাগল কর কেন? যাহারা বিষয় সম্পদ ছাড়িয়া দেহ গেহ ভুলিয়া, তোমার চরণে প্রেম কুসুমাঞ্জলী দিবার জন্য ছুটিয়াছে, তাহাদিগকে চরণ বাড়াইয়া দেওনা কেন? হে ত্রিভঙ্গ এ তোমার কি রঙ্গ? তুমি দানের পরিবর্ত্তে প্রতিদান যেরূপ দাও তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবকে বনে পাঠাইয়াছিলে। বালক প্রহ্লাদকে কত নির্য্যাতন করিয়াছিলে, শুকদেবকে মাতৃস্তন্যটুকুও পান করিতে দাও নাই, ভূমিষ্ট মাত্রেই ঘরের বাহির করিয়াছিলে। নারদ তোমার জন্য আজীবনটা ঘুরিয়া ঘুরিয়াই মরিল। ভোলানাথ তোমার ভেল্কীতে পড়িয়া সব ভুলিয়া বসিল, সোণার কাশী পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানবাসী হইল, ছাই মাখিল, হাড়েরমালা গলায় দিল অবশেষে উলঙ্গ পাগল পর্য্যন্ত হইল কিন্তু তোমাকে ভুলিলনা। তৎপরে অবলা সরলা ব্রজবালাগণের পালা। তাহাদের কথা বলিতে বাক্য-রোধ হয়, তাহাদের দশা ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহারা তোমার জন্য কুল শীল, লোক লজ্জা, গেহ দেহ সকলই ভুলিয়া তোমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল জীবন যৌবন তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়াছিল, পাছে তুমি কোমল চরণ দু'টীতে বেদনা পাও এজন্য যাহারা সেই পা দু'খানি ধীরে ধীরে বক্ষে স্থাপন করিতেও শঙ্কা বোধ করিত সেই গোপরমণীগণের শেষদশা একবার ভাব। আর বিশেষ করিয়া ভাব তোমার সেই ভক্তিশীর-সীমন্তিনী শ্রীমতি রাধিকার কথা। যে তোমাভিন্ন জানিত না তোমার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়াও প্রেমের বিচিত্রতা হেতু সময়ে সময়ে "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কান্দিয়া উঠিত, যে রাজনন্দিনী হইয়া পথের কাঙ্গালিনী সাজিয়াছিল, কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া তোমার চরণে মন প্রাণ অর্পন করিয়া বলিয়াছিল :—

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী। হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা। রাধা কান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
সম শৈল কুল মান দূর করি। তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥

* * * *

যে ধনী দু' খানি কোমল করে তোমার চরণ ধরিয়া সজল নয়নে কত মিনতি করিয়া জানাইয়াছিল :—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়ে একমন হৈয়ে নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই দাড়াব কাহার কাছে॥

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ওদুটী কমল পায়॥

না ঠে'ল না ঠে'ল অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু নাথ তোমা বিনে গতি যে নাহিক মোর॥

সেই নবিনা কেশরীর দশা কি করিয়াছিলে একবার ভাব। এখন কালঅঙ্গ, গৌর হইয়াছ, ভাবিবার বেশ ধরিয়াছ বেশ করিয়া ভাব। ভাবিয়া ভাবিয়া বিভোর হও, হাস, কাঁদ, নাচ, গাও, ধুলায় গড়াগড়ী দাও আমরা কিন্তু বলিতে ছাড়িব না; আমরাও বলিব তুমি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছ একজনকে কাঙ্গালিনী করিয়াছিলে এখন কাঙ্গাল সাজিয়াছ; একজনকে প্রেম পাগলিনী করিয়াছিলে এখন প্রেমে পাগল হইয়াছ; একজনকে অহর্নিশি ভাবাইয়াছিলে এখন ভাবে বিভোর হইয়া ধুলায় লুটালুটী করিতেছ। একজনকে নিরপরাধে দণ্ড দিয়াছিলে এখন দণ্ডীর বেশে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছ; একজন তোমার বিরহে ব্রজের বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে এখন তুমিও সেই একজনের বিরহে কাতর হইয়া দেশে দেশে বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইতেছ। একজন "হা কৃষ্ণ" বলিয়া নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়াছে, এখন তুমিও হা কৃষ্ণ বলিয়া নয়ন জলে বক্ষ ভাসাও। তাই বলিতেছিলাম কান্দাইলেই কান্দিতে হয়, একজনকে নিরপরাধে দণ্ড দিলেই দণ্ড লইতে হয়। নিজের ব্যবস্থা উল্টাইতে পার না সুতরাং লজ্জার চড় গাল পাতিয়া খাইতেছ।

হে গৌরসুন্দর! যদি তোমাকে কান্দিতেই হয়। তবে ঐ সুদূর শ্রীক্ষেত্রে বসিয়া কান্দিবে কেন? আমার হৃদয় ক্ষেত্রে বসিয়া কান্দ। তোমার আগমনে

আমার হৃদয় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া শ্রীক্ষেত্র হইবে তুমি তাহার নিভৃত কক্ষে বসিয়া বিরহিনী রাধার ন্যায় হা কৃষ্ণ বলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দ আমিও, তোমার সহিত কান্দিব এবং কান্দিতে কান্দিতে আমার ক্ষুদ্র অঞ্চল খানি দিয়া তোমার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিব।

হে গৌরসুন্দর! যদি তোমাকে প্রেমোন্মত্ত হইয়া বনে বনে বেড়াইতে হয় তবে আমার হৃদয়ারণ্যে আইস ইহাতে অসংখ্য হিংস্র 'বন্য পশু সর্ব্বদাই পরহিংসায় রত রহিয়াছে, তুমি এখানে আসিয়া পদচারণ করিলে ইহারা শীঘ্রই তোমার বশীভূত হইবে এবং তোমার মনোগত অনেক কার্য্য সাধন করিবে।

হে গৌরসুন্দর! এতদিন আমার হৃদয় খানি উত্তাল তরঙ্গময় পাপসাগরে নিমজ্জিত ছিল তোমার দয়াল নামের গুণে সবে মাত্র জাগিয়াছে ইহা এক্ষণে নবদ্বীপ যদি তোমাকে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে হয় তবে ঐ সুদূর নদীয়ায় যাইবে কেন? আমার হৃদয় নদীয়ায় নৃত্যকর; আমিও তোমার সহিত নাচিব।

হে গৌরসুন্দর! আর তোমাকে দণ্ডীর বেশে দণ্ড ধরিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে হইবে না। যদি নিতান্তই দণ্ড ধরিবার সাধ থাকে তবে রসরাজ বেশে আমার হৃদয় সিংহাসনে বসিয়া প্রেম-দণ্ড ধারণ কর, সে রাজ্যে তুমি রাজা আর আমি প্রজা, যে দণ্ড দিবে তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

হে গৌরসুন্দর! আর তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি তুমিও আমার হৃদয় ছাড়িয়া আর কোথাও যাইও না, গেলে তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক হইবে। কেবল তাহাই নহে আবার তোমাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। যদি তোমার সে ভয় থাকে তবে আমার হৃদয়ে বসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমি কিছু বলিবনা। বরং তোমার দুঃখের দুঃখী হইয়া তোমার সহিত বাস করিব তোমার চরণ সেবায় রত থাকিব। এ সুযোগটুকু তুমি ছাড়িওনা ইহাই আমার অনুরোধ, ইহাই আমার আদেশ, ইহাই আমার মিনতি এবং ইহাই আমার প্রেমভৎসন।

বৈষ্ণব দাসানুদাস শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী।

সম্পাদকীয়।—বিলম্বে চিত্রটী হস্তগত হওয়ায় বাধ্য হইয়া চিত্রপরিচয় ও পদ্যটী ক্রোড়পত্র করিয়া দিতে হইল; সূচি পত্রে না থাকিলেও পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চিত্র পরিচয়।

(চিত্র পুস্তকের প্রথমে দ্রষ্টব্য।)

—ঃ০ঃ—

"রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমিকৃষ্ণ স্বরূপং।"

কুসুম কানন মাঝে সাজি ফুল সাজে
কিবা ভাব অনুভব করিতেছ হরি?
"রসরাজ মহাভাব মিলি একরূপ'
একেগো স্বরূপ সেই, যেই রূপ হেরি
রামানন্দ ভাগ্যবান্ ধন্য চির তরে।
ললিত-ত্রিভঙ্গ ঠাম শিখি পাখা শিরে
মুকুতা কুণ্ডল কর্ণে দোলে লীলা ভরে
রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজিছে অধরে॥
সুন্দর নয়নে শোভে তেরছ চাহনি
বদনে মাখান হাঁসি যেন সুধা খনি
রতন ভূষণ সনে কুসুমের মালা—
দুলিছে আপনি আহা করি কত ছলা
সকল জ্যোতির সার অঙ্গকান্তি যেন
উজলিছে কুঞ্জবন। মনে হয় হেন—
রাধা কান্তি অঙ্গে ধরি রাধা ভাবাবেশে
কুঞ্জপথে দাঁড়াইয়া যেন কার আশে॥

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।

আবাহন।

—:০:—

এসহে আমার হৃদয়বল্লভ,
বস হৃদি-সিংহাসনে।
পূজিব তোমার চরণ দুখানি,
বড় সাধ মনে মনে॥
তুমিহে আমার জীবন-জীবন,
তুমি মম ধ্যান, জ্ঞান।
জনমের তরে, তব শ্রীচরণে,
সঁপিয়াছি দেহ, প্রাণ॥
শিশুকাল হ'তে, ডাকিছি তোমায়,
আমার ভরসা তোমার নাম।
কৃপা বিতরিয়া, শ্রীনাম সার্থক
করহে দয়াল শ্যাম॥
তোমারি বিরহে, জীবন ব্যাকুল,
হৃদয় আঁধারে ভোর।
একবার আসি, নাশ তমোরাশি,
ঘুচাও বেদনা মোর॥
করিয়ে ছলনা, থেকোনা দূরেতে,
হৃদয়ের ধন তুমি।
হৃদয় মাঝারে, হওহে উদয়,
ডাকিছি কাতরে আমি॥
অনুরাগ সূত্রে, গাঁথি সুচিকন,
ভকতি কুসুম দাম;
শ্রীচরণে দিব, আনন্দে ভাসিব,
হ'ব আমি পূর্ণকাম॥

দীন—শ্রীগণিভূষণ সরকার।

"ভক্তি"

"ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকা হইতে গৃহীত।

INDIAN ART SCHOOL, BOWBAZAR, CALCUTTA

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

১১শ বর্ষ। মাঘ ১৩১৯। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

ভুবন বিস্তর মহিমাড়ম্বর,
বিরচিত নিখিল খলোৎকর সম্বর।
বিতর যশোদা তনয় বরং
বরমভিলষিতং মে ধৃত পীতাম্বর॥

হে পীতাম্বর! তোমার মহিমা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত, তুমিই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া জগত রক্ষা করিতেছ, তুমি ভিন্ন বাঞ্ছিত বরপ্রদানে আর কেহই সমর্থ হয় না। দয়া করিয়া আমার হৃদয়-স্থিত দুষ্ট ভাবসকল দূর করিয়া তোমার সুনির্ম্মল শান্তিপ্রদ শিষ্টভাব প্রদান পূর্ব্বক তোমর ভাবে ভাবিত করিয়া রাখ। আমি পরমানন্দে তোমার নামের জয় দিয়া ধন্য হই।

লীলাময় শ্রীহরে! তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই পালনকর্ত্তা, আবার তুমিই সংহারকর্ত্তা। সময় সময় তোমারই কৃপায় তোমার এই ত্রিভুবন-পরিব্যাপ্ত দুষ্ট-দমন ও শিষ্টের পালনকারী লীলা-শক্তি বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু আমি এমনই মায়ামুগ্ধ, এমনই বহির্ম্মুখ যে, উপলব্ধি সুদৃঢ় করিয়া কৃতার্থ হইতে না হইতেই তোমার এই সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্ব কারণ-কারণত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ভুলিয়া যাই, ঠিক রাখিতে পারিনা।

এক একবার মনে হয় তুমিই সকল কিন্তু কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে সে ভাব, সে ধারণা, সে নির্ভরতা, ঠিক রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিনা। তজ্জন্যই সুখ পাইলে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যাই এবং দুঃখ আসিলে একেবারে অধীর হইয়া পড়ি। তোমার জগত-বিমোহন-কারিণী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার এমনই প্রভাব যে, সকল ভুলাইয়া দেয়। বুঝিতে দেয়না যে, তুমি কোন ঘটনা দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত করিতেছ। হয়ত আমরা যেটীকে অমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করিতেছি তুমি তাহার মধ্য দিয়া কত শুভকার্য্য সম্পাদন করিতেছ; কিন্তু তাহা না বুঝিতে পারিয়া আমরা বাহ্যিক কার্য্যাবলী দেখিয়াই সুখ দুঃখ কল্পনা করিয়া অলীক কর্তৃত্বে জ্ঞানহারা হইয়া যাই, এবং অবিরত কত যে কুকার্য্য করিয়া ফেলি তাহার ইয়ত্তা থাকেনা।

আর পারিনা, নাথ! ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, সুখ দুঃখ, কোন ভাবনাতেই আর আমাকে চঞ্চল করিওনা। সৎগুরুর কৃপায়, তোমার অপরিসীম দয়াবলে যতটুকু বুঝিবার বা ধারণা করিবার শক্তি পাইয়াছি, তাহাতে ক্রমেই বুঝিতেছি যে, মনের দুঃখ বুঝিয়া, প্রাণের প্রকৃত অভাব জানিয়া, যথার্থ দুঃখ দূর করিতে, যথার্থ প্রাণের অভাব ঘুচাইতে তোমার মতন আমার আর কেহ নাই। তাই আজ সরল প্রাণে আমার যাহা আছে সকল তোমাকে সমর্পণ করিয়া শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইলাম। এক্ষণে আশ্রয় দিতে হয় দাও, ফেলিতে হয় ফেল। তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আমার আর কিছু বলিবার নাই। অভাবের যাতনা আর ভুগিতে পারিনা, আমার মনের কথা, অন্তরের ব্যথা সকলই জানিতেছ, আমি আর বলিয়া কি জানাইব। তুমি দয়ারসিন্ধু তোমার দয়ার, তোমার ভালবাসার সীমা নাই, সুতরাং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিয়া লওয়া অসম্ভব। আমার তুমিই আশা, তুমিই ভরসা, তুমিই সহায়, তুমিই সম্বল, তুমিই সাধন, তুমিই ভজন। আমি তোমারই ভরসায় তোমারই কৃপালাভের নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া আছি, দেখ যেন আমার ন্যায় দীনহীনের দ্বারা তোমার অধমতারণ, দীনশরণ, দীনবন্ধু প্রভৃতি ভক্তদত্ত নামের কলঙ্ক না রটে। দীনে দয়াকরিয়া এবার ঐ রাঙ্গাপদে স্থান দাও ইহাই প্রার্থনা।—

"এবার রাখ পদে বিপদবারণ।
আমার সাধন ভজন, সহায় সম্পদ, সকল তোমার ঐ চরণ॥

ওহে অনাথশরণ　　(আমি) চাইনা অন্য ধন
(কেবল) তোমাধনে ধনী হ'য়ে জুড়াব জীবন ;—
আমার এই বাসনা যেন সদা থাকি ভাবেতে মগন ॥
ওহে অগতির গতি　　করি পদে মিনতি
(যেন) বিপদে সম্পদে মতি রয় তোমার প্রতি ;—
(যেন) কুকার্য্য সাধিতে মতি যায়না হে মধুসূদন ॥
পড়ে অকূল পাথারে　　ডাকি তোমায় কাতরে
তুমি বিনে এ দুর্দ্দিনে বল কে—তারে ;—
দিয়ে চরণ তরি কৃপাকরি তরাও হে দীনশরণ ॥"

দীন—শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আকিঞ্চন।

—:০:—

হে মহান্! আসিবে কি
"অণোরণীয়ান্" রূপে
ক্ষুদ্র এই হৃদয়ে আমার?
কিন্তু সখা, তব তরে
আয়োজিত হ'য়ে হেথা
নাহি কিছু পূজার সম্ভার।
দীনের কুটীর যে গো!
কোথা পাব সে সম্ভার?
নৈবেদ্যের নাহি আয়োজন।
আছে শুধু ক্ষুদ্র 'প্রাণ',—
তাও তোমা দিতে দান,
প্রাণ ত চাহে না ভগবান্!

হে অতিথি! এসেছ ত
যেওনা ফিরিয়া আর
আমি প্রভু বড়ই কৃপণ।
কিছু নাই, তবু এই
ক্ষুদ্রত্ব আমিত্ব টুকু—
এই ল'য়ে থা'কি আন্‌-মন।
তুমি আপনি লহগো সখা!
আপনার দান!
চরণে লুটায়ে দাও
মোর-ক্ষুদ্র প্রাণ!

শ্রীগোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিরহ।

—:০:—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহত্যাগের পর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, গৌরবিরহে বিষম কাতরা হইয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। দেবীর নিকটে এই সময়ে কয়েকটী মর্ম্মী সখি সর্ব্বদা থাকিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাঞ্চনা প্রধানা। সকলেই দেবীর নিকট গৌর কথাই কহিতেছেন। কারণ অন্য কথা দেবীর ভাল লাগেনা। যদি কোন সখি অন্যকথা বলিয়া দেবীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন, তখনি দেবী নিষেধ করিয়া বলেন "সখি! এ সময়ে অন্য কথা আমাকে বলিও না। আমার হৃদয়-বল্লভের কথা ভিন্ন অন্য কথা আমার ভাল লাগেনা"। গৌরবিরহ ব্যাধির গৌর কথাই ঔষধ। দেবীর উক্তি অধম লেখকের রচিত এই সময়ের একটী পদ এখানে পাঠক বর্গকে উপহার দিলাম। রসজ্ঞ পাঠক ইহার রসাস্বাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিলে কৃতার্থ মনে করিব।

(১)

সজনি! কহলো গৌর কথা।
পরাণ ভরিয়া সে কথা শুনিয়া
জুড়াই মনের ব্যথা।
কহলো সজনি রসময় বাণী,
গৌর-কথা রসে ভরা।
হিয়া মাঝে মোর বিরাজে গৌর
গোরা রূপ মনহরা।
পরাণ সম্বল, গৌর কথা বল,
আন কথা শুনিব না।
প্রেমময় গাথা হয় গৌর কথা,
মোরে সে কথা বল না।
পিয়াস মিটিবে, আনন্দ ছুটিবে,
দগধ হৃদয় মাঝে।
মানস মুগধ, গৌর শবদ,
পরাণে মধুর বাজে।

(২)

সখি! চরণে তোমার ধরি।
গৌর কথা কও, পরাণ জুড়াও,
গোরার বিরহে মরি।
সকল সময় কথা রসময়
শুনাও আমার কাণে।
বাঁচাও পরাণে সুধা বরিষণে
জুড়াও তাপিত প্রাণে।

(৩)

সখি! রূপের মাধুরী কহ।
কিবা সে বদন কিবা সে নয়ন
কিবা সুবলিত দেহ।

রূপের ছটায় উছলে হিয়ায়
নবানুরাগ লহরী।
জগত ভুলিয়া, সে রূপ স্মরিয়া
রয়েছি জীবন ধরি।
সোণার বরণ গৌর রতন
কিবা সে মোহন হাসি।
রূপের কাহিনী কহলো সজনি!
শুনি আমি দিবানিশি।

(৪)

সখি! শুনাও শ্রীগৌরাঙ্গ নাম।
পরাণ জুড়ান, পরম রতন
মধুময় রস ধাম।
আখরে আখরে, কত মধু ঝরে,
গোরা-নাম মাখা সুধা।
এনাম শুনিলে, প্রেম উথলে,
দূর হয় ভব ক্ষুধা।

(৫)

সখি! নাহি কহ আন কথা।
চরণেতে ধরি, ছাড়হ চাতুরী
লয়ে চল গৌর যথা।
জীবনে আমার, গোরা ধন সার
নাহি জানি গোরা ভিন্ন।
গৌর জীবন গৌর পরাণ
নাহিক ভাবনা অন্য।

(৬)

সখি! জুড়াও মনের ব্যথা।
বিয়াকুল মন, করিতে শ্রবণ
মধু মাখা গৌর-কথা।

কহলো সজনি, অমিয়ার খনি
রসময় গৌর লীলা।
যে কথা শ্রবণে জীবের পরাণে
উথলে প্রেমের লীলা।
রসের সাগর গৌর নাগর
সুধার কলস নাম।
গৌর লীলা রস সদাই সরস
সর্ব্ব রসের ধাম॥

(৭)

সখি! বাঁচাও পরাণ মোর।
শুনাও মধুর নাম গৌর
দেখাও সে চিত চোর।
জনম গোয়ানু তবু না পাইনু
সে মন চোরার মন।
বিরহে তাহার জ্বলে অনিবার
হিয়া মোর অনুক্ষণ।
ভনে হরিদাস করি অভিলাষ,
তোমার চরণ ধূলি।
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
গোরা যেন নাহি ভুলি।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

কর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" গীতা ৩।৪

গীতার মতে দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যে যজ্ঞ অর্থাৎ যাহার দ্বারা ভূত ভাবের উদ্ভব হয় তাহাই কর্ম্ম নামে অভিহিত।

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥" গীতা ৮।৩

এবং সকল প্রকার ক্রিয়াই কর্ম্মের অন্তর্গত। শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, তদভাবকে অকর্ম্ম বলা হয়। যাহা শাস্ত্র বিধেয় তাহা কর্ম্ম ও যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ তাহা অকর্ম্ম। কর্ম্মের বিভাগ নানা প্রকার, যথা—কাম্য, নিষ্কাম ও নিত্য কর্ম্ম। বিবিধ, সুখাভিলাষ, তৃপ্তি বা স্বর্গাদি পুণ্য ফল পাইবার কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম্ম। কামনা শূন্য হইয়া সর্ব্ব ব্যাপক কেবল মাত্র সত্বা জ্ঞানে তন্ময়চিত্তে, তদ্ভক্তিতে, তৎপ্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এবং চিত্ত-শুদ্ধির জন্য যে নিয়মিত কর্ম্ম দান, ব্রত, দেবপূজা ইত্যাদি করা হয় তাহা নিত্যকর্ম্ম। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতির গুণ। এই গুণের প্রাদুর্ভাব ভেদে মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য কর্ম্মের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ বিভাগ হইয়াছে। প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বিশেষ কর্ম্মের ফলে পাপ পুণ্যাদির সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর ইহার নিয়ন্তা নহেন। তিনি নির্লিপ্ত সচ্চিদানন্দ পুরুষ। মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিজ কর্ম্মানুসারে নিজেই গড়িয়া থাকে। কর্ম্মই মানুষের বিধাতা পুরুষ। নিজ উপার্জ্জিত কর্ম্ম সমূহ মনুষ্যের অদৃষ্টে লিপি বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা অপর প্রস্তাবে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইবে। নিজ অদৃষ্ট গড়িবার জন্য ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম একান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কিছু সাধিত হয় না, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত কর্ম্ম করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন :—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম" গীতা, ৩।৮

তিনি আরও বলিতেছেন যে, জনকাদি মহাত্মাগণ কর্ম্ম-দ্বারা সংশুদ্ধ চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানীগণের লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করা আবশ্যক, কারণ জ্ঞানীগণ যাহা করিয়া থাকেন অজ্ঞ লোক তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে :—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ গীতা ৩।২০-২১

কর্ম্ম করিবার উপদেশ দানের সময় শ্রীভগবান কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ গীতা, ৩।২২

অর্থাৎ ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, সুতরাং আমার কর্ম্ম করিবার কোন আবশ্যক নাই, তথাপি লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আমি অনলস ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছি।

কর্ম্ম করা আবশ্যক ইহা স্বীকার করা হইল ; কিন্তু কর্ম্ম হইতে বন্ধন ঘটিয়া থাকে ইহার মীমাংসা কি প্রকারে হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে বন্ধন স্বীকার করেন না। তিনি ফলাকাঙ্খাকে বন্ধনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জীব যদি ফলাকাঙ্খা রহিত হইয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহার মতে কর্ম্মসন্ন্যাস না করিয়া ফলসন্ন্যাস করা আবশ্যক। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ ত্যাগ। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্খা ত্যাগ না করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল নিগ্রহ করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় সকল স্মরণ করে, সেই মূর্খকে কপটাচারী বলা হইয়াছে, কারণ হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত হইলেও চিত্তের অশুদ্ধতা হেতু চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যাইতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণের মতে অনাশক্ত কর্ম্মই প্রশংসার্হ, তিনি বলেন, যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে মনোবলে সংযত করিয়া ফলাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ :—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ গীতা, ৩।৭

গীতার মতে ফলাকাঙ্খা সন্ন্যাস করিতে হইবে, কর্ম্ম অনুষ্ঠান ত্যাগ করা বিধেয় নয়। ফলসঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারেনা :—

"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥" গীতা, ৬।২

শ্রীভগবান আরও বলিতেছেন যে, ফলকামনা রহিত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানরূপ অগ্নি জন্মে, সেই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কাম ও কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় :—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম সংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" গীতা, ৪।১৯

আত্ম জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর বস্তু অপর কিছু নাই কিন্তু কর্ম্মযোগ ভিন্ন আত্ম জ্ঞান লাভ হয় না।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তং স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥" গীতা, ৪।৩৮

তজ্জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন, হে ভারত! তুমি অজ্ঞান সম্ভূত হৃদিস্থিত শোকাদিনিমিত্ত এই সংশয়, দেহাত্মবিবেকজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছিন্ন করিয়া কর্ম্ম যোগ আশ্রয় কর।

"তাই বলি সযতনে শুন ধনঞ্জয়,
অজ্ঞানের ফল এই মনের 'সংশয়'
জ্ঞানরূপ খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড কর,
উঠ পার্থ, জ্ঞানোপায় কর্ম্ম যোগ ধর"।

গীতানুবাদ, ৪।৪২ শ্লোক

জ্ঞানীগণের জন্য কর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই। কর্ম্ম সাধনে তাঁহাদের ইষ্ট নাই এবং অসাধনে পাপ নাই কিন্তু গীতার মতে লোক শিক্ষার্থ তাহাদের কর্ম্মকরা আবশ্যক। সাংখ্য মতে কর্ম্ম দোষাবহ বলিয়া উহা ত্যাগের বিধান করা হইয়াছে। মীমাংসকেরা বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিৎ নয়। গীতা বলেন দেহাভিমানি জীব কখনই সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেনা :—

"নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ"। গীতা ১৮।১১

তবে অভ্যাস দ্বারা কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে পারে, কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তজ্জন্য জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের জন্য তিনি কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ত্যাগ সম্বন্ধে ত্রিবিধ ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, সাত্ত্বিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ ও তামসিক ত্যাগ। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্যের প্রেরণায় যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ। দুঃখাবহ বিষয় (সন্ধ্যোপাসনাদি) কায়-ক্লেশ ভয়ে ত্যজ্য হইলে তাহাকে রাজসিক ত্যাগ বলে। নিত্যকর্ম্ম ভ্রমবশতঃ ত্যজ্য হইলে তাহা তামসিক ত্যাগ হয়। গীতার মতে দান যজ্ঞ, তপস্যা ত্যজ্য নহে, ইহার দ্বারা মনুষ্যের চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞান যোগ যদিও শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান ভিত্তি স্থাপিত ভক্তি উদ্ভাবিত শান্তি জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তথাচ বিধেয় কর্ম্মারম্ভ ভিন্ন যখন জ্ঞান লাভের ব্যাঘাত হয়, তখন তৎতৎ কর্ম্ম বর্জ্জন অপেক্ষা সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানোপদেশে মানস বৃত্তির প্রকৃত চালনা দ্বারা ও অভ্যাস বলে ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হন তিনিই শ্রেষ্ঠ। আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধির উপর লক্ষ না রাখিয়া কর্ম্ম করিলে বন্ধন ঘটেনা। সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ ও সর্ব্বদা তাঁহার মহিমা ও তাঁহার বিশ্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে মনে এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত হয় যে, তখন আর মানুষের "অহং" ভাব থাকেনা, এবং তখনই তাঁহার বিভূতি দর্শন করা হয়। এইরূপ সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এক জন্মের সাধনায় পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্ম সঞ্চয় না থাকিলে, এভাব উৎপন্ন হয় না, বহু জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত সাধনা করিলে সেই পরম পিতার সাক্ষাৎকার ঘটিলে আর জীবকে দেহ ধারণ রূপ দুঃখ বহন করিতে হয় না। জীব আপন কর্ম্মে আপনি উন্নত হইয়া চির শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

ভক্তি ও বৈরাগ্য।

—:০:—

বৈরাগ্য বিদ্যানিজ ভক্তি যোগ।
শিক্ষার্থ মেক: পুরুষঃ পুরাণঃ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীর ধারী।
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

কলিকলুষিত আপামর জনসাধারণকে গৃহান্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য পার্ষদ সহ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন, তাহাই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভাগবত ধর্ম্ম উহারই নামান্তর। উক্ত ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য ধর্ম্মে কামনারূপ কলঙ্ক কালিমা বিদ্যমান থাকায়, তাহা আচরকের (তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বিদের) আত্যন্তিক হিতকর বা আনন্দ দায়ক হয় না কিন্তু মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে স্বার্থ রূপ কলঙ্ক কালিমার বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায়না। কাযেই উহা পূর্ণচন্দ্রবৎ নির্ম্মল ও সর্ব্বজন সমাদৃত। দ্বিতীয়তঃ উহা নিঃস্বার্থ হইলেও সম্পূর্ণ আনন্দ-দায়ক। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যেমন ভোজন করিতে বসিয়াই গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তিজন্য আনন্দ অনুভব করে। সেইরূপ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই ভক্তগণ ভজনানুসারে তন্মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং অল্পায়াসসাধ্য ও আনন্দাধিক্য প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম্মই যে ধর্ম্মজগতের চরমসীমা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা স্বয়ং জগদীশ্বর যে ধর্ম্মের আচরক বা প্রবর্ত্তক, তাহা যে সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। করুণা-বরুণালয় শ্রীকৃষ্ণ প্রকট প্রকাশে ব্রজ ধামে যে সকল লীলা করিয়া ছিলেন। সেই সুমধুর লীলারস সংসার-দাবানল-দগ্ধ জীবের হৃদয়-ক্ষেত্রে সেচন করিয়া তাহাতে প্রেমরূপ অমৃত ফলের বীজ রোপন করত তাহাদিগকে চিরতরে আনন্দিত করিবার জন্য এবং স্বয়ং তদানন্দ বিশেষরূপে আস্বাদন করিবার জন্য, প্রেমময়ী

শ্রীরাধার ভাব কান্তি লইয়া গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। এই লীলা রস আস্বাদনই তাঁহার গৌরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর সব আনুসঙ্গ।

প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥ চৈ চঃ আদি ৪ অধ্যায়।

তাঁহার প্রেমরস আস্বাদন করিবার কারণ এই যে, কদাচিৎ শ্যামসুন্দর দর্পণাদিতে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করতঃ বিমুগ্ধ হইয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু যখন বহু যত্ন করিয়াও তিনি তাহা আস্বাদন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি পূর্ণানন্দ রস স্বরূপ হইয়াও আপনাকে আস্বাদন করিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছি। সেই আমাকে আস্বাদন করিয়াছেন যে রাধিকা, তাঁহার কি অপরূপ প্রেমমহিমা! যে প্রেমে পরিপূর্ণ সুখ স্বরূপ আমি ও আত্মহারা হইয়া যাই এবং যে প্রেমদ্বারা তিনি মদীয় অদ্ভুত মধুরিমা সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। সেই শ্রীরাধার প্রেমমহিমা কিরূপ এবং তৎকর্তৃক নিরন্তর আস্বাদিত মদীয় মধুরিমাই বা কি প্রকার। নাজানি তিনি আমাকে আস্বাদন করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দই বা প্রাপ্ত হন। তাহা একবার দেখিতে হইবে, এই প্রকার তাঁহার আগ্রহবল্লী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

দর্পনেতে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥ চৈ চঃ আদি ৪র্থ অধ্যায়।

কিন্তু তৎস্বরূপ না হইলে তাহা কি প্রকারে আস্বাদন করিবেন। এই জন্যই তিনি প্রেমময়ী রাধিকার ভাবকান্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণলীলায় অনাস্বাদিত বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করিলেন।

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ চৈ চ আদি ৪র্থ অধ্যায়।

তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন।

তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন।। চৈ মঃ ৮

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে আপনাকে রাধা ভাবে ভাবিত করিয়া নিজ অনির্ব্বচনীয় রস আস্বাদন করিলেন। ইহা তাঁহার একটি রসিকশেখরতার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রিয়ানুরাগিতার বিশেষ দৃষ্টান্ত। তিনি রাগানুগা ভক্তির আদর্শ স্বরূপ হইয়া জগৎকে ঐ রাগানুগা ভক্তিরই শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ এই রাগানুগা ভক্তিই কৃষ্ণামৃত মাধুর্য্য আস্বাদনের প্রধান অবলম্বন। ইহা ব্যতীত তন্মাধুর্য্য আস্বাদন বা তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় না। তাহা তিনি স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণানন্দ রস স্বরূপ হইয়াও স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিলেন না। তাঁহাকেও রাধাপ্রেমের আশ্রয় লইতে হইল; তখন গোপীপ্রেমই যে তদানন্দ আস্বাদনের প্রধান উপায় তাহাই স্থির। আর ঐ প্রকার রাগানুগা ভক্তিই যে তদীয় ভক্তমণ্ডলীর একমাত্র শিক্ষিতব্য বিষয়, তাহা তিনি নিজে প্রকাশ করিয়াও দৃঢ় করিবার জন্য রামানন্দাদি রসিক ভক্তের মুখে পুনর্ব্বার প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তন্মতানুযায়ী ভক্তবৃন্দের, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ঐ ধ্রুব বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক ব্রজভাবের অনুগত হইয়া ভজন করাই কর্ত্তব্য। এবং যাহা ঐ ভাবের প্রতিকূল তাহাই ত্যজ্য। তৎপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় জন্মাষ্টমী, দ্বাদশী, কার্ত্তিক ব্রত, তৎপ্রীতির উদ্দেশে ভোগাদিত্যাগ শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, স্পর্শন, তৎকৃপাপেক্ষণ, নাম গুণ ও লীলাদির স্মরণ, কৃষ্ণার্থে সমস্ত কর্ম্মকরণ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, সাধুসেবা ও সাধুমার্গের অনুসরণ, ভজনরীতি প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাদি, শ্রীমূর্ত্তিসেবা কৌশল, রসিক ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদন, সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ মহত্তর সাধুসঙ্গ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ, বৈষ্ণব চিহ্নধারণ ইত্যাদি ভক্তি গ্রন্থে যে সকল ব্রজ ভাব প্রাপ্তির অনুকূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎ সমস্তই সাদরে শিক্ষা ও যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইগুলি সব ব্রজভাব প্রাপ্তির অনুকূল। এইগুলি সব ভক্তির অঙ্গ। এইগুলি যথারীতি অনুষ্ঠিত না হইলে ব্রজ ভাব লাভ হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত জন্মাষ্টম্যাদি তৎপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় গুলি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করত, যাহা তৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল তাহা একবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা ব্রজভাব লাভের সম্ভাবনা নাই।

যেমন ভোজন করিতে বসিয়া তদ্বিরোধি গমনাদি অন্যক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার আর ভোজন করা হয় না। সেই রূপ কৃষ্ণ ভজন করিতে বসিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি প্রীতিকর আপাত মধুর ও পরিণাম বিষময় রমণীসঙ্গ বা অন্যান্য বিষয় সম্মুখে আসক্ত হইলে তাহারও কৃষ্ণ ভজন হয় না। কেননা এই দুইটি বস্তুই ছায়াতপের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাব অর্থাৎ যেখানে ছায়া থাকে সেখানে যেমন আতপ অর্থাৎ জ্যোতিঃ পদার্থ থাকে না। আর যেখানে জ্যোতিঃ পাদার্থ বর্ত্তমান থাকে, সেখানে যেমন ছায়া অর্থাৎ অন্ধকার থাকিতে পারে না। সেইরূপ যে হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় অমৃতময় ভজন প্রদীপ নিরন্তর জ্বলিতে থাকে, সেখানে কামোপভোগাদি অন্ধকারও থাকিতে পারে না। আর যে হৃদয় কামাদি ঘনতিমিরে সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন। সে হৃদয়ে সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তিরও উদয় হয়না। কারণ শাস্ত্রে আছে—

বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং কৃষ্ণ ভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।
বারুণী দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

পূর্ব্বদিকে গমন করিলে কি আর পশ্চিম দিকগত বস্তু লাভ হয়? কখনই না। সেইরূপ বিষয়াবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণ ভক্তিরও উদয় হয় না। কেননা তাহাদের ভক্তি প্রাপ্তির আগ্রহই নাই। একটা মানসিক আগ্রহ না থাকিলে কি আর কার্য্য সিদ্ধ হয়? মনে কর, তুমি কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে কাশী যাইবে। কিন্তু কাশীধাম কলিকাতা হইতে অনেক দূর। ইহা তোমার মানসিক সঙ্কল্প মাত্রেই সিদ্ধ হয় না। কাযেই তদ্বিষয়ে একটি উদ্যম চাই। পরে তুমি উদ্যম সহকারে পাথেয়াদি সম্বল করিয়া যখন কাশীধাম অভিমুখে অগ্রসর হইলে, তখন তুমি কাশীধাম অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতেছ, কাশীধাম ও তোমার ততই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আর তুমি যে স্থান হইতে কাশীধামে যাত্রা করিতেছ, সেই জন পূর্ণ কলিকাতা মহানগরী ততই তোমার দূরবর্ত্তী হইতেছে। পাঠক! এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ভক্ত, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা সাধনভক্তি লইয়া আগ্রহ সহকারে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত আনন্দময় ভাবরাজ্যের পথে যতই অগ্রসর হইবেন ভাবরাজ্যও ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবে। আর হিংস্রব্যাঘ্রাদি সঙ্কুল ও নানা অশান্তি পূর্ণ সংসার কানন ততই তাহার দূরবর্ত্তী হইবে। করুণাময়

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সংসার কাননে চিরনিপতিত ও মোহময়ী কণ্টকীলতা বিজড়িতাঙ্গনষ্টপ্রায় জীবসকলের সংশয় দূরীকরণ ও ভাবরাজ্যের ভক্তজনাস্বাদিত সুমধুর ভক্তিরস প্রদান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এবং স্বয়ং কঠিন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জনসাধারণকে বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, কৃষ্ণ চৈতন্যের বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার কারণ কি? তিনিত রাম কৃষ্ণাদি অবতারের ন্যায় সংসার ধর্ম্ম করিয়াও জীবসকলকে বৈরাগ্য বিদ্যা এবং ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতে পারিতেন? তাহার উত্তর এইযে, তিনি নিজে বৈরাগ্য না করিলে সংসারাসক্ত জীবের হৃদয়ে কি প্রকারে বৈরাগ্যের উদয় হইবে? এবং বৈরাগ্য না হইলে সংসারাসক্ত ভ্রান্ত জীবের ভগবন্নাম শ্রবনাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে কৈ! নাম শ্রবণাদিতে রুচি না জন্মিলে তদ্বিষয়ক প্রেম লাভেরও সম্ভাবনা নাই; তাই তিনি নিজে বৈরাগ্য করিয়া জন সাধারণকে বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তিযোগ শিক্ষাদিয়াছিলেন। আরও "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"। অতএব তদেকান্তি ভক্তমণ্ডলির শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ঐ দুইটী বিষয়ই সাদরে শিক্ষা করা উচিত। যাহারা চৈতন্য দেবেকে জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের নিকটে তদ্বাক্য ও বেদবাক্যবৎ সমধিক আদরণীয় ইহাই স্থির।

পুরানতীর্থোপনাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

দুইটী গীত।

—:০:—

তব প্রেমাধীন, হ'য়ে যদি দিন পারিতাম হরি যাপিতে।
হোতনা যাতনা হোতনা কাল শমনের ডরে কাঁপিতে॥
ধন জন পুত্র, ভেবে দিবারাত্র, হ'য়েছি যথার্থ উন্মাদের মতন,
আসিলাম কি ক'য়ে যাই কিবা ল'য়ে সঙ্গের বস্তু কি করলেম, অর্জ্জন,

(আর কইবার কথা কি আছে দয়াল)
আমার সম্বল মাত্র কৃপাধন
তবে পার্‌ব হে পাড়ি যোগাইতে ॥ (তোমার কৃপা হ'লে)
আপন জানিয়ে, আছি যারে নিয়ে, তাহারে ত্যজিয়ে যাবহে এখন
আসিয়াছি একা, যাব একা একা, দেখা যদি দাও তুমিহে তখন,
(আর সখা সখী কে আছে দয়াল)
কেবল তুমি হও সর্ব্বস্ব ধন
দয়াল ধ'রে তু'ল এ পতিতে। (জীবন অন্ত হ'লে)
বুঝিবার গোলে, মজিলাম ভুলে, তবপদ মূলে নিলেম না শরণ,
এই তো মনুষ্যত্ব, এমনি নীচত্ব, তত্ত্ব কথার দিকে
দিলামতোনা মন ;
(আমার নিকাশের দিন হ'য়েছে নিকট)
এখন হ'তেছে সব স্মরণ—
মহেশ মরিতেছে আত্ম গ্লানিতে ॥ (মরণ আস্‌ছে হে'রে)

(২)

কত দিন ভবে থাকিতে বা হবে
তুমি কবে বা চরণে দিবে স্থান।
ঐ চরণে শরণ নিবার কারণ
আমি অনুক্ষণ হরি করিহে ধ্যান।
দিয়াছিলে মোরে যা কিছু সম্বল
বুঝিতে পারিনা সে বস্তু কি হ'ল
কি দুর্গম পথে ঘটে চলাচল
বড় সঙ্কটের কথা হয়গো ;—
(এসে রিপুর দেশে বসতি করা)
হরি কেমনে পাইব পরিত্রাণ ॥
মায়ার মন্দিরে যবে প্রাণ ঢুকে
কেমনে ছাড়াবে মায়ার কুহকে
তার কি আর কোন স্বাধীনতা থাকে
সে যে নীরবে সকলি সয় গো ;—

(কহে তোমারি উদ্দেশে ক্লেশের কথা)
কর তুমি যদি হরি শান্তি দান ॥
পঞ্চ ভূতে করে বিফল আনন্দ
ভূতে কি বুঝিবে জীবের ভাল মন্দ
তোমার সাথে কিবা মধুর সম্বন্ধ
কারো বুঝিবার কথা নয়গো ;—
(সে যে প্রাণের কথা প্রাণেতে থাকে।
করে প্রাণের সহিত অন্তর্ধান ॥
বিষম বিপ'কে ঠেকিয়ে শ্রীহরি
কারতেছি সদা শ্রীহরি শ্রীহরি
বৃথা কাজে দিন গেলাম অন্ত করি
কি দুঃখের কথা হয় গো ;—
(মহেশ কত যে পাপে হ'য়েছে পাপী)
জানত সকলি ভগবান।

দীন—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কাঙ্গালের মনের কথা।

—:০:—

এই পরিদৃশ্যমান্ জড় জগতের যাবতীয় জীবের অন্তরাত্মাতেই সুখ লাভের প্রবল পিপাসা। সকলেই সুখ চায় ;—কেহই দুঃখ চায় না। সুখের জন্যই এই সংসারে আসা। সুখ লাভই জীব-জীবনের তাৎপর্য্য। সুখ সম্ভোগই জীব-জীবনের মুখ্যোদ্দেশ্য। কিন্তু সংসারের অলীক-উদ্‌ভ্রান্ত সুখের নিমিত্তই জীব-জগত লালায়িত।

এই দুর্লভ মানব জীবন কেবল সুখের অনুসরণে,—সুখের সাধনায়ই অতিবাহিত হইয়া যায়। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি ছোট, কি বড় সকলেই সুখের কাঙ্গাল।

সুখের আশায় জগতের অনন্তকোটি জীব, দিবানিশি কত যে উপায়োদ্যোগের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার অবধি নাই।

বিষয়, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প সকলিই সুখের নিমিত্ত। যে সকল মহাত্মা সংসার ত্যাগী হইয়া ঝোড়ে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদেরও অন্তঃকরণে সুখ বাসনা বিরাজিত।

চুরী, ডাকাতি, দাঙ্গা, হাঙ্গামা প্রভৃতি যে সকল পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় দিবানিশি চলিতেছে,—তৎসমস্তের মূলেও সেই সুখ বাঞ্ছা।

চোর, চুরী করিতেছে,—সুখের জন্যে, স্বার্থপর নরাকার পশুরা পরের মাথায় বাড়ী দিয়া পরস্বাপহরণ করিতেছে, সুখের নিমিত্ত। বলী, দুর্ব্বল কাঙ্গালের পাতের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে, সুখের আশায়। এইরূপ, সুখ, লাভের জন্য যে কত কত নারকীয় কার্য্য অহরহঃ মানব সংসারে সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

সদাগর চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া একদেশ হইতে আর একদেশে যাইতেছে, সুখের জন্য।—রাজার রাজত্ব সুখের জন্য। কৃষক মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া দিন-রাত্ অশান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সুখের প্রলোভনে।

জগতের জীব যাহা কিছু সদসৎ কার্য্য পরিচালনা করিতেছে, তাহার মূলহেতু সুখ লাভ।

যাঁহারা মানুষ হইয়াও দেবতা,—মর রাজ্যে বাস করিয়াও অমর, পরোপকারের জন্য, পরের সুখের জন্য সাধের মানব জীবন অক্ষুণ্ণচিত্তে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য সুখ লাভ।

যে সকল মহাত্মারা পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া আজীবন কেবল দুঃখের বোঝাই বহিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদেরও অন্তঃকরণে সুখের বলবতী ইচ্ছা নিয়ত খেলিয়া বেড়াইতেছে।

জগতের লোকে হয়ত বুঝিয়া লইল, "এই লোকটী, পরের জন্য সারাটা জীবন বড়ই ক্লেশ ভোগ করিল।" কিন্তু, আমার বিবেচনায়, তাঁহার মত সুখী জগতে অন্যরকম সুখভোগীর মধ্যে আর একটী আছে কিনা সন্দেহ।

একটুকু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্রতম কীটানুগণের মধ্যেও সুখের প্রবল পিপাসা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই যে জগতের অসংখ্য প্রাণী অসংখ্য প্রাণ লইয়া দিবানিশি ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল তো সুখের জন্যই ?

কিন্তু হায়! কেহ কি (দুই একজন ভিন্ন) যথার্থ সুখের বিমল জ্যোৎস্নায় আপন পাপতমসাচ্ছন্ন প্রাণটাকে আলোকিত করিয়া লইতে পারিয়াছে? কেবল সুখের সংস্পর্শ লোভে ভাবি দুঃখের বোঝা সংগ্রহ করিতেছে মাত্র।

তবে কেহই যে প্রকৃত সুখের খোঁজখবর না পাইয়া কেবল অন্ধের মত সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একথা আমি বলিতে পারিনা। অবশ্যই মহাপুরুষেরা মানবরূপী দেবতারা, জীবনের চরম লক্ষ্য পরম সুখের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া প্রকৃত সুখে সুখী হইতে পারিয়াছেন।

অবশ্যই নিত্য সুখ সাধনায় জীবন যাপন করিয়া বহুজীব জন্মমরণরূপ যাতায়াতের পথ বন্ধ করতঃ চিন্ময়ানন্দ লাভের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন।

জগতের যে সকল সামগ্রী আমরা সুখের কারণ বলিয়া তল্লাভের প্রত্যাশায় জীবনের অতি অমূল্য সময় রত্নকে বিলাইতেছি, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়।

অনিত্য সুখের উপকরণ হইতে সুখের পরিবর্তে বরং জগতের দুঃখই বৃদ্ধি পায়। কারণ, আমাদের সুখের সামগ্রী সমস্তই অনিত্য। অর্থাৎ যাহা পাইয়া আমরা সুখ বোধ করি, তৎ সমস্তেরই অভাব অবশ্যম্ভাবী।

রাজা রাজ্য পাইয়া সুখী, ধনী, ধন পাইয়া সুখী, বৈষয়িক লোক, বিষয় পাইয়া সুখী, এবং কেহ পুত্র পাইয়া সুখী, কেহ, রূপবতী ভার্য্যা পাইয়া সুখী, কেহ বা সম্মান পাইয়া সুখী ;—আবার কেহ পরের ঘরে আগুণ দিয়া সুখী, কেহ পরের ধনে ধনী হইয়া সুখী, কেহ পর পীড়ণে সুখী। ন্যায় বিচারে অথবা সংসিদ্ধান্তে ইহারা কেহই সুখী নয়। কারণ এই সকল ইতর সুখ সুখের মধ্যে গণ্য নহে। অতি ক্ষণস্থায়ী ও পরিতাপোৎপাদক।

রাজা, রাজ্য হারাইলে আর তাঁহার দুঃখের অবধি থাকেনা। পুত্রবান্ পুত্র হারাইলে পুত্র শোকে পাগল হয়। কি পুত্রের কোন রোগোপস্থিত হইলে

ভাবনায় অধীর হইয়া পড়ে। সুন্দরী স্ত্রী, মরিয়াগেলে, কি কাতরা হইলে স্বামী বড়ই দুঃখ পান। আর যদি অতি সাধের, রূপবতী সোহাগিনী কুলটা হইতে পারেন, তবে তো স্বামীর দেহ প্রাণ কত দুঃখে জর্জ্জরিত হয় তাহা ভুক্ত ভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে কেন ?

চোর, ডাকাইত, দস্যু প্রভৃতি নরাকার পশু সকল, কি অসহায় দুর্ব্বল পীড়ক স্বার্থপর নর পিশাচেরা কোন ক্রমেই সুখী নহে। কারণ, ভয়, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতায় ইহাদের হৃদয়ে বিন্দু মাত্রও শান্তি নাই। ইহাদের হৃদয় নরকাপেক্ষাও জঘন্য।

এই শ্রেণীর পাপাত্মারা সর্ব্বদা রাজ ভয়ে সশঙ্কিত! অনেকে রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। ঐশ্বরিক দণ্ডও (রোগাদি) ইহাদের হইতে দেখা যায়।

নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে, দেখা যায়, জড় জগতের যাবতীয় সুখই মিথ্যা। এই মিথ্যা সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আমরা নিত্য সুখের সংস্পর্শ লাভে বঞ্চিত আছি। আর কেবল দুঃখের উপর দুঃখ ভোগ করিয়া মরিতেছি।

তবে কি জীবের ভাগ্যে প্রকৃত সুখ নাই? অবশ্য আছে। সে সুখের মুখ দেখিতে হইলে, সে অপূর্ব্ব সুখের অমৃতাস্বাদ করিতে হইলে, মানাভিমান, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া, স্বার্থ শূন্য স্বতন্ত্রতাকে অবলম্বন করিতে হইবে, সত্যের ধ্বজা উড়াইয়া, ন্যায়ের পথে চলিতে হইবে।

স্বার্থ পরতায় মানুষকে যত নীচে নামাইয়া দেয়, যত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, কি মানব হৃদয়কে যত সংকীর্ণ করিয়া তুলে, যত নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ করিতে পারে, এমত আর কিছুতেই নহে।

অতএব স্বার্থপরতা মানবাত্মার উন্নতি পক্ষের কণ্টক স্বরূপ।

তবেই দেখা যাইতেছে, আত্মোন্নতি সাধন করিয়া সুখী হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উপরোক্ত দুষ্প্রবৃত্তি গুলি হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। আর দয়া, শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, তিতীক্ষা প্রভৃতি সদ্ গুণাবলীর সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, পরোপকার মহাব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণ কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে।

এরূপ হইলে, সেই অপ্রাকৃত অপূর্ব্ব আনন্দময় সুখ সুধার কথঞ্চিৎ আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে।

দীন দুঃখীর প্রতি দয়া বিতরণে স্বার্থ শূন্য পরোপকারে—স্বদেশ বাসীর কল্যাণার্থ আত্ম বিসর্জ্জনে, যে অপ্রাকৃত অনির্ব্বচনীয় সুখোৎপত্তি হয়, বোধ-করি, মরজগতের স্বার্থপর ধনী, মানী, রাজা, জমিদার ও বিষয়ী কেহই সেই ভূমানন্দ সুখ সুধার গন্ধলেশও অনুভব করিতে সমর্থ নহে।

বাস্তবিক সুখ প্রেমে ও প্রেমের সাধনায়।

প্রেম রাজ্যের ভাব স্বতন্ত্র, ভাষা স্বতন্ত্র, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্বতন্ত্র, ধনী, মানী লোভী কামীর সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। সে রাজ্য নিষ্কাম ভালবাসার উজ্জ্বলালোকে আলোকিত, মধুর হইতে মধুরতম প্রেম সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শী ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, প্রেমোন্মত্ত ভক্ত-ভ্রমরের দিব্য ধ্বনিতে, রসোন্মত্ত রসিকের রসা-লাপে সর্ব্বদা মুখরিত।

সেখানে অলীক ভোগ বিলাসের আরাধনা নাই, অনিত্যের উপাসনা নাই, দীক্ষা, শিক্ষা সকলি নিত্যের।

প্রাণের সম্বন্ধ নিত্যধন, পরমারাধ্য ভগবানের সঙ্গে, প্রেমের স্বরূপও সেই পরাৎপর পরম তত্ত্বের সহিত।

যাহারা ভগবানের সঙ্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সম্বন্ধ পাতিয়া প্রেম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী, তাঁহাদের সে সুখের অবসান নাই। সে প্রেমের বিরহ নাই, তবে যে বিরহের কথা শুনা যায়, সে কেবল প্রেমের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য, সুখের সার উপলব্ধির হেতু।

হে কলিরজীব! যদি যথার্থ সুখে সুখী হইয়া অনন্ত কাল চিদানন্দে থাকিতে চাও, যদি আর এই ক্ষণভঙ্গুর রক্তমাংসের শরীর লইয়া ত্রিতাপ-দগ্ধ মরজগতে আসিতে না চাও, যদি আপন প্রাণের দেবতাকে চিনিয়া লইয়া আপন হৃদয়ে রাখিবে মনে কর, তবে প্রাণ ভরিয়া বাহু তুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া বলিতে থাকো,—

"হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! বল, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ! বল, জয় জয় রাধা গোবিন্দ, জয় জয় রাধা গোবিন্দ!"

প্রেমিক জনের অনুগত হইয়া দিন দিন মায়ার সংসার হইতে কিছু কিছু করিয়া সরিয়া যাইতে থাকো, আর একটুকু একটুকু করিয়া ধীরেধীরে প্রেম রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকো। বুঝিবে, কারে বলে সুখ।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

ষট্‌সন্দর্ভ।

—:•:—

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় ষট্‌সন্দর্ভের প্রথম অংশ তত্ত্ব সন্দর্ভ গ্রন্থের এক খানি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের টীকা ও সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পার্শ্ব-সূচী সমাবেশে গ্রন্থ খানি আরও অধিকতর সমাদৃত হইয়াছে। ইহার উপরে মুদ্রাঙ্কণ সৌন্দর্য্যে, (উত্তম কাগজ ও ভাল বাঁধাই প্রভৃতি দ্বারা) গ্রন্থ খানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

ষট্‌সন্দর্ভ কিরূপ উপাদেয় গ্রন্থ, পাঠকগণ এই তত্ত্ব-সন্দর্ভ খানি পাঠ করিলেও তাহার আভাস পাইবেন। আমরা শুনিলাম সুবিজ্ঞ গোস্বামি মহোদয় এইরূপ অপর পাঁচ খানি সন্দর্ভেরও সানুবাদ অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন। তাহা হইলে বৈষ্ণব সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইবে। কেবল বৈষ্ণব সমাজেরই বা বলি কেন, ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেই ইহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন।

ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব, ও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-নির্দ্দেশই প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক শাস্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য। যে দর্শন শাস্ত্র এই লক্ষ্যের দিকে প্রখর দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বহিরঙ্গ বিষয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, আমরা সেই দর্শনের প্রয়োজন অস্বীকার না করিলেও তাহার প্রতি তাদৃশ আদর দেখাইতে পারি না। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের আলো-

চনা করা হইয়াছে। এই সকল পদার্থ বিচারের মধ্যে আত্মতত্ত্বের নাম মাত্র আছে, কিন্তু তাহা এই দর্শনের আলোচ্য বিষয়ে অপ্রধানরূপেই গণ্য।

আমরা তাই বলিয়া বৈশেষিক দর্শনের অপ্রয়োজনীয়তা মনে করিনা। কেননা, জিজ্ঞাসু ভেদেই পরম কারুণিক ঋষিগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। যাঁহারা জগদ্বিজ্ঞান (Cosmology) দ্রব্য বিজ্ঞান (Law of Substance) পরমাণু সংযোগ বিভাগ বিজ্ঞান (chemistry) প্রভৃতির তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া "তন্ন তন্ন" প্রণালী ধরিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ জিজ্ঞাসুর পক্ষে কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক সূত্র সবিশেষ উপাদেয়। কিন্তু যাহারা এই সকল বিষয়ের তথ্য বহিরঙ্গ বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা কেবল শ্রীভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত অপর কথা "বাজে" কথা বলিয়া ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা বৃথা সময়ক্ষেপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ষট্‌সন্দর্ভে ভগবতত্ত্বের অমৃত খনি দেখিতে পাইবেন।

আবার যাহারা প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত অবয়ব, তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস-ছল জাতি নিগ্রহ স্থান প্রভৃতির তত্ত্ব জ্ঞানে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের সুধামধুর সাক্ষাৎকারে আনন্দলাভের প্রয়াসী, তাঁহাদের পক্ষে প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দর্শনের তত্ত্ব বিচার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হইলেও অবশেষে উহাতে তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা চরিতার্থ হয়না। সে অবস্থায় ষট্‌ সন্দর্ভ পিপাসিতের পক্ষে সুশীতল পানীয়ের ন্যায় পরম তৃপ্তিকর বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তাই ষড় দর্শনের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত, বঙ্গের প্রধানতম ন্যায়াচার্য্য শ্রীমৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, শ্রীচরিতামৃতে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, যথা :—

সার্ব্বভৌম কহে, আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি॥
* * * *
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গ-সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

ইহা অপেক্ষা এ সম্বন্ধে উত্তম প্রমাণ আর কি হইতে পারে। ফলতঃ কৃষ্ণ-কথা-সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গের লীলা-শক্তি আমরা এই ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে দেখিতে পাই।

সাংখ্যতত্ত্বের প্রয়োজনও জিজ্ঞাসুর অস্বীকার্য্য নহে, তাদৃশ অধিকারীর পক্ষে প্রকৃতির বিকার বিচার, পুরুষের স্বরূপের নিরূপণ, প্রকৃতিপুরুষের বিবেক-সাধন দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি রূপ পুরুষার্থ লাভই প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা স্বর্গ চাহেন না, নরকের ভয় করেন না, জগতের সুখ দুঃখও পারমার্থিক সুখ দুঃখ যাহাদের নিকট একবারেই গণনার মধ্যে ভুক্ত নয়, যাঁহারা জগতের সমগ্র দুঃখ আপন মাথায় লইয়া সমগ্র জগৎবাসীকে ভগবদ্ভক্ত করিতে প্রয়াসী, শ্রীভগবানের চরণ সমক্ষে মানব সমাজকে উপনীত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের পদনিঃসৃত আনন্দ-সুধায় অমর করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক, সাংখ্যের "অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি" তাদৃশ ভক্তগণের নিকট কোনও ঐন্দ্রজালিক চিত্তাকর্ষণীয় প্রলোভন বিস্তার করিতে পারে না। অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রও দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া পাঠকদিগকে ভগবত্তত্ত্ব হইতে সুদূর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। আমরা কেবল বৈষ্ণব দর্শনেই ভগবত্তত্ত্বালোকের সন্দর্শন পাই। এইক্ষেত্রে গৌড়ীয় দর্শনই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাঁহারা এই দর্শনের মর্ম্ম জানিতে চাহেন, তাঁহারা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের সম্পাদিত সানুবাদ তত্ত্বসন্দর্ভ নামক অতি উপাদেয় এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত "ভক্তি" সম্পাদকের নিকট সবিশেষ তথ্য জ্ঞেয়।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

নিত্যধামগত,

পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন।

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

—:০:—

শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচারিণী সভা স্থাপন ও "ভক্তি" প্রচার।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দীনবন্ধু ভবানীপুরে অবস্থান কালে লোকসমাজে যাহাতে ভক্তিভাব বর্দ্ধিত হয়, ভাগবতধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদি করিতেন, শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করিতেন এবং স্থানে স্থানে সভা সমিতি করিয়া, বৈষ্ণব-দর্শনানুমোদিত তত্ত্ব কথার আলোচনা করিতেন। ইহাতে প্রচার কার্য্যের সহায়তা হইলেও, যাহাতে দেশের যুবকগণের মতি গতি পরিবর্ত্তিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হয়, যাহাতে তাহারা পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, তজ্জন্য এমন একটি সভা স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন,—যথায় নিয়মিতরূপে বিষয় বিভাগ করিয়া, ভাগবত-শাস্ত্র-তত্ত্ব সুচারুরূপে আলোচিত হইতে পারে। ইহারই ফলে, 'ভাগবতধর্ম্ম প্রচারিণী' সভা স্থাপিত হয়। দীনবন্ধু বুঝিয়াছিলেন যে, এ দেশ, ধর্ম্মক্ষেত্র—পুণ্যক্ষেত্র সুতরাং এ দেশে ধর্ম্মপথ ভিন্ন অন্য গতি নাই। জগতের বক্ষে ভারতের ধর্ম্ম-গৌরব চিরকাল অটুট হইয়া থাকিবে। যে দেশে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জীবের প্রতি তাঁহার অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া ছিলেন, জীবের সহিত তাঁহার যে নিত্য সম্বন্ধ বিরাজমান, তাহা বিবিধলীলা বিলাসে প্রকটিত করিয়া ছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, অনুভব করিয়া, ধারণা করিয়া, যে দেশের মননশীল আর্য্য সাধকগণ বিবিধ দর্শন-বিজ্ঞানে, বিবিধ ভাবে, বিবিধ মন্ত্রে, বিবিধ ছন্দে, লীলাবিলাসের বর্ণনা করিয়া জগতের নরনারীকে আহ্বান করিয়া, অটল বিশ্বাসে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তি রধোক্ষজে।" সেই দেশের নরনারী উচ্ছৃঙ্খল হইবে, পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিবে, অনিত্যের জন্য লালায়িত হইবে, ইহা কখনই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে। দেশের যুবকগণের এই শিক্ষা লাভ হয়না বলিয়া, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা

লাভ করিয়াও, যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা সংসার আশ্রমের আনন্দোজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পান্ না, বরং নিরানন্দের, হতাশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। তাহার ফলে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলতা বা পশুভাবের বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র। সেইভাব দূর করিতে হইলে, সংশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সংভাবে জীবন যাপন করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। তাই, যুবকগণকে লইয়া তিনি এ সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কারণ, যুবকগণের হৃদয় পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইলে, তাহারা যখন সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিবে, তখন তাহাদের হৃদয়ে পশুভাব স্থান পাইবে না, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, তাহা বুঝিয়াছে বলিয়া, তাহারা সেই আশ্রমের সকল কর্ম্মে, শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ যাচিয়া লইবে। আলোর সম্মুখে দাঁড়াইলে, ছায়া যেমন পশ্চাতে সরিয়া যায়, আনন্দময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার পাতিলে, ইহপর জীবনের নিরানন্দও সেইরূপ বিদূরিত হইবে। জীব ধন্য হইবে, সমাজে কি অভিনব প্রীতির ভাব জাগিয়া উঠিবে! নরনারীর হৃদয়ে কি পবিত্র ভাব প্রবাহিত হইবে! প্রতিমুহূর্ত্তে করুণাময় শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় পরিচয় পাইয়া, মানব তাঁহার মধুরতায় বিভোর হইয়া থাকিবে, জগৎ মধুময় বলিয়া মনে হইবে, আর তখন বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সেই বৈদিক মন্ত্রের এই মধুর ঝঙ্কার সমুত্থিত হইবে—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
ওঁ মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীর্মধুনক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নোবনস্পতি
মধুমাংস্তস্তূর্য্যো মাধ্বীগাবো ভবন্তুনঃ।
ওঁমধু ওঁমধু ওঁমধু॥

এই উদ্দেশ্যে দীনবন্ধু ভাগবতধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং যুবকগণের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য, কলিপাবনাবতার পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের এই মহৎ উপদেশটি কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশিত করিয়া দিলেন—"জীবেদয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, এর চেয়ে ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন"—এই লক্ষ্য স্থির করিয়া এই সভায় যে সকল যুবক যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল, চিত্ত-দর্পণ সুমার্জ্জিত হইয়াছিল,

সৎসঙ্গ ও সদালোচনায় পবিত্র জীবনের ভাব কেমনে বিকশিতে হয়, তাহা উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিল। এই সভায় যে সকল আলোচনা হইত, তাহা জনসাধারণে প্রচারিত করিবার জন্য, এই সভা হইতে "ভক্তি" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ভক্তি পত্রিকা ও সভার কার্য্যাদি পরিচালনা ব্যাপারে ভবানীপুর বাসী শ্রীমান্ সতীশ চন্দ্র বসু, যুবক দলের মধ্যে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বর্ষের "ভক্তি" পত্রিকারপ্রথম সংখ্যায়, ভাগবতধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ও 'ভক্তি' পত্রিকা সম্বন্ধে যে পরিচয় জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখানে তাহারই অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"সার্দ্ধ ত্রিবৎসর কাল হইল, স্থানীয় কতিপয় যুবক অথবা বালকের উদ্যোগে সন ১৩০৩ সাল ২৬শে চৈত্র বুধবার এই সভা স্থাপিত হয়। সেই দিন হইতেই দয়াপ্রবণ হৃদয় ভক্তপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় বালকদিগকে উপদেশ দানে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য দয়া করিয়া আচার্য্যের আসন গ্রহণ করতঃ সভাকে ধন্য করিতেছেন। বেদান্তরত্ন মহোদয় কিরূপ আগ্রহের সহিত বালকগণের উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। স্থানীয় উকীল পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও যত্নের ক্রটী নাই। * * * প্রকৃত কথা বলিতেগেলে, শ্রীভগবানের এই দীনহীন অজ্ঞানাদগের প্রতি অসীম দয়া হেতু আমরা যেরূপ আচার্য্য পাইয়াছি, এরূপ, দুই একটি সভার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। * * * *

"সভা স্থাপিত হইল, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভগবৎগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়মিতরূপে পাঠ হইতে লাগিল, গগন ভেদ করিয়া উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইল। আবার বাৎসরিক অধিবেশনে কত পণ্ডিত, কত ভক্ত আসিয়া উপদেশ দিয়া গেলেন অসংখ্য দীন দরিদ্রকে ভোজন করান হইল, কিন্তু সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেহই বুঝিল না। কেহ বলিলেন, একটা হুজুগ করাই সভার উদ্দেশ্য, কেহবা সহৃদয়তা গুণে ইহা বলিলেন যে, এই সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই সভার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা, তাহা সভ্যগণের হৃদয়েই অন্তর্নিহিত রহিল। উদ্যোক্তৃগণই জানেন, কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। তবে যে,

সে উদ্দেশ্য কিছুই সাধিত হইতেছে না, এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু কবে যে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে সাধিত হইবে, কবে আচার্য্য ও সভাপতিকে অগ্রে করিয়া প্রত্যেক সভ্য দয়ায় আপ্লুত হইয়া আপন গ্রাস ক্ষুধার্ত্ত দীন দরিদ্রকে তুলিয়া দিবে, কবে প্রত্যেকেই ভক্তিভাবে "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া, জগতের সেবা করিয়া আনন্দ লাভ করিবে, কবে নিরাশ্রয় কাঙ্গালকে আদর করিয়া স্বীয় বক্ষে ধারণ করিবে, কবে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরোপকারে সচেষ্ট হইবে। জানিনা সে দিন কবে আসিবে, জানিনা ভক্তগণের কবে দয়া হইবে, কবে শ্রীভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন।"

"ভক্তি" রচিত হইল। আজ তিন বৎসর ধরিয়া যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মিতরূপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া আসিতেছে, "ভক্তি" কতক পরিমাণে সে উদ্দেশ্যে সহায়াতা করিলেন।

যে জ্ঞান লাভ করিলে, যে ভক্তিভাবে ভাবিত হইলে, আমরা সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হইব, "ভক্তি" সে জ্ঞান সে ভাব প্রত্যেক সভ্যকে ন্যূনাধিক পরিমাণে দান করিতেছেন। যাঁহারা 'ভক্তি'র লেখক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সভার সভ্য। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা এ কার্য্যে যে আনন্দ লাভ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের ভক্তিতত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান লিপ্সা প্রবলতর হইয়াছে।"

এই প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া "ভক্তি" পত্রিকা এতাবৎ কাল সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিয়া আসিতেছে। ইহার প্রচার কাল হইতে দীনবন্ধু ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং ধর্ম্মপ্রচার কল্পে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করায়, সময়ে সময়ে "ভক্তির" পরিচালন ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর সমর্পিত হইত, ইহা "ভক্তি"র পাঠকগণ অবগত আছেন। এই "ভক্তি" পত্রিকা প্রচারের সময়, ও ভাগবতধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় "পাঠ" করিতে করিতে, তাঁহার মনে শ্রীমদ্ভাগবত সম্পাদনের তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে। কিন্তু মূল ভাগবতের পুঁথি অভাবে, সে কার্য্যে তখন ব্রতী হইতে পারেন নাই। একদিন তিনি স্ব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে বসিয়া, ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেছেন, এমন সময়

একটী বালিকা আসিয়া সহসা তাঁহাকে একখানি ভাগবতের হস্ত লিখিত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পুঁথি দান করিল। কে উহা পাঠাইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় বালিকা বলিল "আপনি ভাগবত লিখিবেন জানিয়া আপনাকে এই পুঁথি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যিনি দিয়াছেন, তাঁহার নাম জানিনা, তিনি কেবল এই কথা বলিয়া দিয়া গিয়াছেন।" এই পুঁথি পাইয়া ও ভাগবতধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসাহে, এবং পরলোক গত জষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, দীনবন্ধু কি ভাবে এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভাগবত সম্পাদনের সময়, তিনি কখন কখন ভক্তি পরিচালনায় বিশেষ মনোযোগী হইতে পারিতেন না। এইজন্য মুর্শিদাবাদের রামপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কিছুদিন 'ভক্তির' সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলেন, এবং পরে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ভক্তি' পত্রিকা পরিচালনে ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায়, আবার দীনবন্ধুকে ইহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি শেষ জীবন অবধি সেই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। দীনবন্ধু, ভবানীপুর হইতে হাওড়া, কোঁড়ার বাগানে, আসিয়া 'ভাগবতাশ্রম স্থাপন করিলে পর, ভক্তি পত্রিকা তথা হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

"ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল"।

—:•:—

এখান হইতে প্রতি বৎসর বৈষ্ণব-ব্রত-তিথির তালিকা প্রকাশিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। এই বৎসর গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণকে শাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহ দিবার মানসে এই ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল কর্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে, যাঁহারা বৈষ্ণব-ব্রতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মত সমন্বয় পূর্ব্বক পৌরাণিক উপাখ্যান-সম্বলিত শাস্ত্রীয়-প্রয়োগ সহ প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে সুবর্ণ পদক ও যথাযোগ্য উপাধি প্রদত্ত হইবে। এই মন্তব্যানুসারে "একাদশীব্রত" প্রথম প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট হয় এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ লেখকগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রবন্ধ আমাদিগের উদ্দেশ্যানুযায়ী আংশিক আলোচনায় লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ পরীক্ষিত হইয়া তাহার বিচার ফল প্রকাশিত হইতেছে।

একাদশীর ব্রতের প্রবন্ধ পরীক্ষার প্রশ্ন। (১০০)

প্রশ্ন।

নং (৪০) ১। ব্রতের উৎপত্তি বর্ণনা এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ। নং (৩০) ২। পৌরাণিক সহ ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সমন্বয়। নং (২০) ৩। ব্রতের সাধারণ প্রতিপাল্য নিয়মাদি (কৃত্য)। নং (৬) ৪। ব্রতপালনের ফল এবং ব্রতাপমানের প্রায়শ্চিত্ত। (৪) ৫। পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কাগজে লেখার জন্য।

অভিপ্রায়।

১। একাদশী ব্রত কোথায়, কিরূপে, কখন, কেন উৎপন্ন হইল, এই সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ। তিথীর উৎপত্তি প্রসঙ্গাধীন বর্ণনা। ২। পুরাণে উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার বিষয় ইতিহাসের সহিত সমন্বয় করিয়া দেখান। ৩। একাদশীর ব্রতপালন জন্য ব্রতের পুর্ব্বে, ব্রতকালে, এবং পরে কিরূপ বিধি পালন করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের কিরূপ ব্রত পালন কর্ত্তব্য, তদ্‌সম্বন্ধে সামান্য বিচার। ৪। ব্রতপালন করিলে কি ফললাভ হয় এবং ব্রতাপমান করিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সংক্ষেপে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

মন্তব্য।

১ম। প্রাপ্তসংখ্যা ৭৬নং

শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী মহাশয় আমাদিগের প্রবন্ধের উদ্দেশ্যানুযায়ী সকল প্রশ্নের সুন্দর উত্তর লিখিয়াছেন। আশানুরূপ না হইলেও তিনি যেরূপ গবেষণাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন এবং প্রবন্ধটীকে সর্ব্বসম্প্রদায়েরই একাদশী ব্রতপালন করা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরিশেষে গোস্বামিমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে ধীর ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইনিই প্রবন্ধ-লেখকগণের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন। ইহাঁকে সুবর্ণপদক ও উপাধি প্রদত্ত হইল।

২য়। প্রাপ্তসংখ্যা ৪৯নং

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ হইতে যেরূপ পরিশ্রম পূর্ব্বক একাদশীতত্ত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িক ভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে তিনি প্রবন্ধ-লেখকগণ মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করিতে পান। কিন্তু আমাদিগের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা নহে, একারণ তিনি দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

৩য়। প্রাপ্তসংখ্যা ৩৪নং

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধে কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ না থাকায় তিনি ৩য়, স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

৪র্থ। প্রাপ্তসংখ্যা ৩৪ নং

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র অধিকারী মহাশয় আমাদিগের প্রবন্ধের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলেও তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা মন্দ নহে, কিন্তু তিনি প্রবন্ধ মধ্যে অন্যসম্প্রদায়ির উপর দ্বেষভাব প্রকাশক ভাষা প্রয়োগ করায় তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে, একারণ তিনি ৩য় স্থান অধিকার করিলেও, ঐরূপ অপ্রাসঙ্গিক লিখন-প্রণালীতে উৎসাহ প্রদান অকর্ত্তব্য বোধে তাহার প্রবন্ধ ৪র্থ, স্থান প্রাপ্ত হইল।

৫। প্রাপ্তসংখ্যা ২৫ নং

শ্রীযুক্ত অনিলকিশোর গোস্বামী মহাশয় ৫ম, হইয়াছেন।

৬ষ্ঠ। প্রাপ্তসংখ্যা ২২ নং

শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র মহাশয় ৬ষ্ঠ হইয়াছেন।

উপসংহারে—

১ম। শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী, উপাধি ও সুবর্ণপদক পাইয়াছেন।
২য়। শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, প্রশংসাপত্র ,,
৩য়। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য, ,, ,,
৪র্থ। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র অধিকারী, ,, ,,

৪২৭ চৈতন্যাব্দের ২৪ পৌষ বুধবার অপরাহ্নে প্রবন্ধ-পুরস্কার সভার অধিবেশনে ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণের অনুমোদনক্রমে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতিশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয় প্রবন্ধ-লেখক শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী মহাশয়কে "গোকুলচন্দ্র সুবর্ণপদক" ও "ব্রতরত্ন" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
সম্পাদক।
শ্রীরাধাকান্ত গোসাঞি
সহকারী সম্পাদক।
ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল,
১৬১ নং হ্যারিসন রোড
কলিকাতা।

ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণ—
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামি সার্ব্বভৌম।
,, ,, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।
,, হরিকিশোর গোস্বামি শাস্ত্রী।
,, সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন।
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী।
,, দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামি পুরাণতীর্থ।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

১১শ বর্ষ। ফাল্গুন ১৩১৯। ৭ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরণ্যং
ত্বমেকং জগৎ-কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্"॥

হে জগদীশ্বর! জীবের একমাত্র আশ্রয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কারণ তুমি, তোমারই অনন্ত শক্তির বলে এই বিশ্ব নিয়ত চালিত পালিত হইতেছে; তুমিই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, তুমিই নিত্য সত্য পরব্রহ্ম স্বরূপ, তোমার ভাবনা করিলেই জীব সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, নিন্দা স্তুতি প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। আমি কাতর প্রাণে তাই ভীষণ সংসারানলে দগ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, দয়া করিয়া তোমার সর্ব্ব সুখ-শান্তি-প্রদ রাতুল শ্রীচরণ যুগলে আমাকে স্থান দাও।

প্রভো! জুড়াইব বলিয়া, সংসারে যাহাকে সুখ ভাবিয়া,—আপন ভাবিয়া ধরিয়া ছিলাম, ক্রমে ক্রমে দেখিয়াছি তাহারা আমাকে নিরন্তরই অশান্তি

অনলে দগ্ধ করিতেছে, যাহাদের ভালবাসায় মত্ত হইয়া প্রকৃত ভালবাসার বস্তু যে তুমি, তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম, তাহারা এখন বেশ বুঝাইয়া দিতেছে যে, ইহাতে কিছু মাত্রই সুখ নাই, প্রকৃত আনন্দের বিন্দু মাত্রও ইহাতে পাওয়া যায় না।

সুখ সুখ করিয়া এমন দেবদুর্লভ মনুষ্য জীবনের বহু সময় বৃথা নানারূপ কুকার্য্যে ব্যয়িত করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত সুখ যে কি, আর কি করিলেই যে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারা যায়, তাহা তো কিছুই বুঝিলাম না। হৃদয় তো দিবানিশি অশান্তি অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, মায়ার ঘোরে বুঝিয়া ছিলাম যে, এই সংসারের আত্মীয় স্বজনগণই আমাকে সুখের অধিকারী করিবে, হায়! হায়! এখন তোমার কৃপায় বেশ বুঝিতেছি যে, ইহারা সুখের পরিবর্ত্তে নিরন্তর দুঃখ,—নিরন্তর অশান্তি—নিরানন্দই দিতে পারে; প্রকৃত আনন্দের, প্রকৃত সুখশান্তির কণা মাত্র প্রদানেও ইহারা সমর্থ নয়।

দয়াময়! তবে আর কেন? কর্ম্মফল তো অনেক ভোগ হইল, নিজ কর্ত্তৃত্ব তো যথেষ্ট খাটাইলাম, কৈ সুখ তো অনুভবও করিতে পাইলামনা, তবে আর কেন ভুলাইয়া রাখিতেছ, নিজগুণে দয়া করিয়া আমার নয়ন পথ হইতে মায়ার অজ্ঞান আবরণটী অপসারিত করিয়া তোমার সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোক প্রদান কর, আমি তাহার সাহায্যে তোমার ভুবন-মঙ্গল আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তিদর্শন করিয়া পরম সুখে,—পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করি।

প্রভো! আমি আর সে ধন জন, সে দেহ গেহ, সে সুখ শান্তি, সে আত্মীয় কুটুম্ব প্রার্থনা করিনা যাহাতে তোমাকে ভুলাইয়া দেয়। তোমার মতন যে এমন আমার প্রকৃত ব্যাথার ব্যাথি, অকিঞ্চনবন্ধু কেহ নাই তাহা তোমারই কৃপায় বেশ বুঝিয়াছি এবং ক্রমে বুঝিতেছি। আর না, দয়াল! আর ভুলাইয়া রাখিওনা। দাও—দাও প্রভো! আমাকে তোমার ভালবাসা পূর্ণ প্রেমের পাথারে ডুবাইয়া দাও, আমি আর সংসারে ধনজনাদির অনিত্য ভাবনার জ্বালায় জ্বলিতে পারিনা। কৃপাকর, তোমার ভাবসাগরে ডুবিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালার শান্তিকরি এবং পরমানন্দে প্রাণ ভরিয়া তোমার সুধামধুর নামগানে বিভোর হইয়া যাই। দীনে দয়া কর।

"দীনে দয়া কর ভগবান।
পতিতপাবন হরি করি ওপদে মিনতি,
ওহে যদুপতি কর পতিতে শ্রীপদ দান॥
দৈত্য বিনাশন ওহে নারায়ণ,
করুণা নিদান (কর) করুণা অর্পণ,
এঘোর যন্ত্রণা, সহেনা সহেনা,
হ'য়োনা দাসে পাষাণ॥
নিয়ত নিখিল কুপথেতে মন,
ভ্রমেও না ভাবে ও রাঙ্গা চরণ,
তাই বড় ভয় হয় দয়াময়,
সুমতি কর বিধান॥"

দীন—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাণের ডাক।

—:০:—

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিত।)

শ্রীভগবান্ ও জীবে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শ্রীভগবান্ প্রেমসিন্ধু, জীব তাঁহারই প্রেমবিন্দু। প্রেমই জীবের স্বরূপ। মায়ার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তি জীবের এই স্বকীয় স্বরূপ-জ্ঞানের অন্তরায়। প্রেমিক জীবের প্রেমের লক্ষ্য, প্রেমময় ভগবান্। কিন্তু মায়ার আবরণে—মায়ার বিক্ষেপে জীবের প্রেম নানা বিষয়ে প্রধাবিত হয়, মায়িক জগতের নানা পদার্থের মধ্যে আপন পিপাসা চরিতার্থ করিতে চায়, কিন্তু তাহাতে পিপাসার তৃপ্তি হয় না, আশা মিটে না, প্রাণের দীনতা ঘোচে না। জীব যাহা চায়, যখন তাহা পায় তখন কিয়ৎকাল তাহা সম্ভোগ করে কিন্তু সম্ভোগে তাহাতে বিরক্তি জন্মে। সুস্বাদু খাদ্য, সুশ্রাব্য সঙ্গীত, নয়ন রঞ্জন জগতীয় সুদৃশ্যাবলী সম্ভুক্ত হইতে হইতে, সম্ভোগী জীবের নিকট আপন আপন আকর্ষিগুণ হারা হইয়া পড়ে। স্বার্থপর জীব ভোগান্তে উহাদিগের অনাদর

পূর্ব্বক আবার নূতন কিছুর অন্বেষণ করে। জীব যত দিন তাহার প্রকৃত স্বরূপ না জানিতে পারে, যতদিন তাহার প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যকে না বুঝিতে পারে, ততদিন জীবের এই দশা অনিবার্য্য—কেবল বিক্ষিপ্তি—কেবলই বিরক্তি।

এ সংসারে রাজাধিরাজের এই দশা,—পথের কাঙ্গালেরও এই দশা,—কোথাও শান্তি নাই, কোথাও তৃপ্তি নাই। দুর্ব্বাসনা ও অতৃপ্ত কামনা রাবণের চিতার ন্যায় নিরন্তর ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, আর তাহার মধ্যে আমাদের সমগ্র জীবন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া কাঠের আগুন নিভিয়া যায়, বনের আগুন বন দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাপিত হয়; কিন্তু মানুষের কামনার অনল দেহ দগ্ধ হইলেও নিভে না, দেহ ভস্ম করিয়া চিতার আগুন নিভিয়া যায় কিন্তু জীবের কামনার আগুন চিতার পরপারেও স্বীয় লেলিহমান শিখা প্রসারিত করিয়া স্বীয় প্রতাপময় অস্তিত্বের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে।

গোলকের ভাবে যে প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ সাধক,—অবিদ্যার জগতে সেই প্রেম দুষ্কামনার বিষবহ্নি শিখা;—এক বস্তুরই এইরূপ ভিন্ন প্রকাশ—পৃথক্ আবির্ভাব। শ্রীচণ্ডীতে লিখিত আছে,—যে দেবী সুকৃতি লোকদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করেন, সেই দেবীই আবার পাপাত্মাদের গৃহে অলক্ষ্মীরূপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। প্রেমের কার্য্যও এইরূপ। দারাপত্যে, গৃহে, বিত্তে, মানে ও যশেই সংসারে প্রেমের বিনিয়োগ; ফলে কেবল অন্তরের জ্বালা।

জীব যখন আপন প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে, যখন জীবের সাধনায়, বিশেষতঃ গুরুর কৃপায় এবং শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে মায়ার আবরণ ও মায়ার বিক্ষেপ অপগত হয়, তখন প্রেম উহার আপন লক্ষ্যের জন্য ব্যাকুল হয়। তখন জীব আর কিছুতেই লক্ষ্য রাখেনা, আর কাহারও তল্লাস করে না, সে তখন চায়, কেবল তাহার প্রাণের প্রাণ প্রিয়তম প্রেমময় প্রাণপতিকে;—সে তখন আকুলভাবে দিন যামিনী কেবল সেই প্রাণবল্লভের অন্বেষণ করে, এবং ব্যাকুল অন্তরে সেই প্রাণবল্লভকেই ডাকিয়া ডাকিয়া ব্যাকুল করিয়া তোলে।

বিশুদ্ধচিত্ত বৈদিক ঋষি সামগানে ইহারই আভাস দিয়াছেন যথা :—

"ইমা উ ত্বা সুতে সুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ গাবো বৎসন্নধেনবঃ।—ঋক্।"

হে গির্ব্বণ ইন্দ্র! দুগ্ধবতী গাভীসকলের হাম্বা-রব যেমন বৎসদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে, আমাদের স্তুতিসকলও সেইরূপ তোমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলুক।

বৈদিক ঋষিগণের ব্যাকুলতাময়ী প্রার্থনায় দেবদেবের হৃদয়ও ব্যাকুলিত হইত, সে আহ্বানের ফল সদ্যসদ্যই প্রতি ফলিত হইত। সামগানের কোমল অথচ হৃদয়-স্পর্শী তরল তানে দেবতার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। পুরাণ-সমূহেও এই আহ্বান,—স্তোত্রের আকারে পরিলক্ষিত হয়।

মানুষ চিরদিন আপনার প্রাণনাথকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। মায়ার ঘোরে,—মোহের ফেরে মানবহৃদয়ের প্রেম যত বাহিরের বস্তুতেই অর্পিত হউক না কেন, কিন্তু অচিরেই মানুষ আপন ভ্রম বুঝিতে পায়, যাঁহারা সুবুদ্ধি তাঁহারা তখন হইতেই সতর্ক হয়েন,—সতর্ক হইয়া স্বীয় প্রেমের প্রকৃত লক্ষ্যের অনুসন্ধান করেন। ব্যাকুলতা যতই বাড়িতে থাকে, ততই আহ্বানেরও ব্যাকুলতা উৎপাদিকা শক্তি বাড়িতে থাকে, এবং প্রাণবল্লভকে ততই নিকটে আকর্ষণ করে।

বৎসহারা ধেনুর হাম্বারব, উহার নেত্রযুগলের প্রগাঢ় সতৃষ্ণ ব্যাকুলতাময় চাহনি, ও বদনমণ্ডলের ভাবগতি, যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই উদ্ধৃত সামগানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ ধেনুর সেই ব্যাকুলতাজনক হাম্বারবে অন্যত্র ক্রিড়াশীল বৎসের হৃদয় অচিরে ব্যাকুলিত হয় এবং সে তাহার মায়ের ডাকে ব্যাকুল হইয়া ঝটিতি মায়ের নিকটে উপস্থিত হয়।

মানুষ যদি এইরূপ ব্যাকুলভাবে প্রাণের প্রিয়তম শ্রীভগবানকে ডাকিতে পারে, তবে জীবও ভগবানের সত্বর মিলনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ডাকার মত ডাকিলে শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া বলেন—

আমি এলেম রে তোর হরি।
গোলোক পরিহরি॥

ইহাই দয়াময়ের দয়া। তাঁহার যদি এদয়া নাথাকিত, যদি এরূপ প্রীতি না থাকিত, তবে যুগে যুগে মানব হৃদয় তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইত না, তাঁহাকে ডাকিত না, তাঁহার নামও স্মরণ করিত না।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ মোহনমুরলীধারী গোপীকার চিত্তহারী। গোপীকাগণ যেমন বনে বনে মনচোরা বনবিহারী শ্রীহরির জন্য ব্যাকুল, তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া,—তাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া দিনযামিনী আকুল,—আবার অপর দিকে ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর ও বাঁশীর রবে নিরন্তর গোপীকাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া সততই ব্যাকুল।

ভক্ত ভগবানকে যেমন ডাকিতেছেন, ভগবানও তেমনি আবার ভক্তগণকে বাঁশরীর আহ্বানে স্বীয় চরণান্তিকে টানিয়া লইতেছেন; প্রেমময়ের রাজ্যে সম্মিলনের জন্য এইরূপ ডাকাডাকি, এই যে অভিসার,—বাসক-শয্যা ও উৎকণ্ঠা ইহা চিরদিনই সুপ্রসিদ্ধ। ভক্তের প্রতিডাকেই ভগবান্ সাড়া দিয়া বলেন "এই আমি আছি;—তোমার কাছেই আছি, তোমার প্রাণের মাঝেই আছি"। ভক্ত কখন তাহা শুনেন, কখন শুনিতে পান না, যখন তাঁহার কোমলধ্বনি শুনিতে পান, তখন নয়ন মুদিয়া আপন হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিতে পান, নয় খুলিয়াও নয়ন সমক্ষে সেই ভুবন-ভুলান রূপের ছটা দেখিয়া বিমুগ্ধ হন।

বাস্তবিক কথা এই যে, প্রাণের ডাকের প্রত্যুত্তর অবশ্যই পাওয়া যায় মানুষের এই সাধনা যেমন সহজে সিদ্ধ হয়, অন্যান্য সাধনা তেমন সহজে সিদ্ধ হয় না। ডাকিলে দয়াময় শ্রীভগবান্ তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন। তাঁহার এই দয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত লক্ষ প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—ইহাতে কোন সন্দেহ বা সংশয় নাই। প্রাণের সহিত ডাক প্রত্যুত্তর অবশ্যই শুনিতে পাইবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

বৃন্দাবন ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথ দর্শন।

আজ ৫ই কার্ত্তিক ১৩১৭ সাল শনিবার—রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, কড় কড় করিয়া টিকারী রাজ বাড়ীতে ও শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরে নবহৎ

বাজিতেছে। কার্ত্তিক মাস মঙ্গল আরতি নিয়ম সেবা। মঙ্গল আরতি দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল, বিছানা হইতে নীচে যাইয়া শৌচাদি সমাপনান্তে করতাল লইয়া "জয় ভবতারিণী" এই মায়ের নাম গাহিতে গাহিতে বাহির হইলাম। পথ ঘাট কিছুই চিনি না, একদিকে চলিয়া গেলাম, বড় রাস্তা পেলাম, লোক জন বড় নাই কেবল বানর গুলি গাঁদি মারিয়া দেওয়ালের পাশে ঠেসা ঠেসি হইয়া আছে। করতাল বাদ্য শুনিয়া কেহ কেহ বিরক্ত বোধ করিতে লাগিল। মনের ইচ্ছা আজ গোপীনাথ দর্শন করিব এই সময় একটী বৃদ্ধ ব্রজমায়ির দর্শন পাইলাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ৺গোপীনাথ-মন্দিরের পথ বলিয়া দিলেন। একটু যাইতে অনেক সাধু ভক্তসঙ্গ মিলিল। সকলেই মঙ্গল আরত্রিক দর্শনে চলিয়াছেন, সেই ব্রজ মায়িদের অনুগা হইলাম। তখনও দেউড়ীর বড় দরজা খোলা হয় নাই, তবে পেটকাটা ছোট দরজা দিয়া ভক্তগণ যাইতেছেন তাঁহারা শ্রীযমুনা স্নানান্তেই মালা হাতে করিয়া আসিয়াছেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে দুটী চত্বর পার হইয়া একটী বড় অঙ্গনে পৌছিলাম, তথায় সুবৃহৎ শ্রীমন্দির। বুঝিলাম এই খানেই শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিরাজ করিতেছেন। তখনও মন্দিরের কপাট উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, ভিতরে কিন্তু খুট খাঁট শব্দ হইতেছে, বোধ হয় কিশোর কিশোরীকে উঠাইয়া সেবা পরা সখীগণ বিলাস বিত্রস্ত বেশ ভূষা সামলাইয়া দিতেছেন, অলকা তিলকাদির পুনঃ সংস্কার করিতেছেন। ভক্তেরা তথায় কেহ কেহ স্তব পাঠ, কেহ কেহ ভৈরবী সুরে "ভোর ভঁয়ো পক্ষীগণ বোলে, উঠে নন্দলালজী" গাহিতেছেন, কোন সখী-ভাবাবিষ্ট ভক্ত প্রিয়াজীকে কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন "কত আর ঘুমাবে রাই কালোমাণিকের কোলে" একটু পরে ঝনাৎ করিয়া পিতলের দরজা সরিয়া গেল। অমনি সেই নীল পরদা বাহির হইল, তাহাও অবিলম্বে সরিয়া গেল। তখন অপূর্ব্ব দর্শন। দর্শনে মন আরো প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এযে আমার শ্রীনন্দদুলালের মত :—

স্ব মাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা লতিকা করেন সেবন॥

গোপীনাথের মাথায় এখন চূড়া নাই; শীতকাল তাই মাথায় লট্‌পটি পাগ বাঁধিয়া দিয়াছে। কৃপা নেত্রে যেন অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন,

পরমানন্দে আরতি দর্শন করিলাম। তথা হইতে ইচ্ছা হইল যে, শ্রীরাধারমণের বাড়ী যাই কিন্তু পথের ঠিক পাইলাম না। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া বিষয়ীকে স্বচরণে টানিয়া লইলেন, ষড়ভুজ মহাপ্রভুর মন্দিরে যাইয়া পৌঁছিলাম। তখনই কেবল পরদা পড়িয়া গেল, আমার ভাগ্যে পূর্ণ দর্শন ঘটিল না। পরদার পাশ দিয়া ষড়ভুজের মাত্র চারিখান ভুজ নেত্রগোচর হইল, বাকি দর্শন হইল মনে ভাবিলাম কেশে ধরিয়া আনিয়া যাহা দিলে সেই উত্তম। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেলা ১০টার সময় বাসায় ফিরিলাম আহারান্তে বেলা ৩টার সময় প্রহ্লাদ দাদা শশী ও নৃপেন্দ্র আসিলেন। যমুনা পুলিন দর্শনে সকলে যাত্রা করিলাম। পথে সুন্দর কয়েকটী ব্রজবালক আমাদের পাছু লাগিল, "মেরা নন্দলালকি হাতী ঘোড়া পালকি" :—

ধূলী নয় বালু নয় গোপীর পদরেণু,
এই ধূলি মেখেছিল নন্দের বেটা কানু।"

বালকদের মোহন নৃত্য এবং বচন মাধুরী বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল তাদের কিছু দেওয়া হইল কিন্তু একটী ছোট বালক তবু ছাড়িল না অনেক দূর আসিল তাহাকে আরও এক পয়সা দিলাম সে "কানাইয়া লালকি কৃপা হোক্" বলিয়া আনন্দে ছুটিল। কলনাদিনী কালিন্দী তীরে একটী অতি মনোরম উদ্যানে আসিলাম। অতি নির্জ্জন স্থান কল্পবৃক্ষ রাজি বেশ ছায়া করিয়া আছে। পক্ষীকুল আনন্দে কাকলী করিতেছে, নানা প্রকার পুষ্প স্বচ্ছন্দে ফুটিয়া আছে এই স্থানে পরম প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য ভক্তপ্রবর শ্রীল হরিদাস স্বামীর সমাজ ও তদীয় সেবা দেখিলাম; ভক্তরাজ যেন শ্রীবৃন্দারাণীর শান্তি প্রদায়িনী ক্রোড়ে পরম সুখে শুইয়া নিজাভিষ্ট বস্তু দর্শন করিতেছেন। মহাভক্ত হরিদাস স্বামী নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ী। তিনি নাকি শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ কৃপা পাত্র ছিলেন, তিনি সঙ্গীতে ও বীণা বাদনে সিদ্ধ হয়েন। যখন তিনি বীণা লইয়া মধুর কৃষ্ণলীলা আলাপ করিতেন তখন বিমানচারী জলধর নামিয়া আসিত ও দ্রবীভূত হইয়া অমীয় ধারা বর্ষণ করিত। শ্রীবৃন্দাবনের পক্ষীকুল তাঁহারা চারিদিকে ঘেরিয়া তাঁহার সহিত গান, করিত, সঙ্গীত প্রিয় কুরঙ্গ কুরঙ্গিনী ছুটিয়া আসিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণলীলা গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়া যাইত।

এমন কি প্রবাদ আছে যে, তাঁহার মধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রকট হইতেন এবং দুই জনে ভক্তের দুই জানুপরি বসিয়া মধুর সঙ্গীত শুনিতেন। অদ্যাবধিও শ্রীরাধাষ্টমীতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্যগণ মিলিত হইয়া দুই দিন ভজন গীতাদি আলাপ করিয়া থাকেন।

যাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব বিনোদ বেশে বিনোদরায় বঙ্কুবিহারী নিধুবনে প্রকট হইলেন সেই মহাভক্ত হরিদাস স্বামীর মহিমা অভক্ত কপটী আমরা কি বুঝিব।

বঙ্কুবিহারী ঘোরতর বাবু, চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল বিলাস বিভ্রম লইয়া আছেন, অনবরত পরদা পড়িতেছে আর উঠিতেছে। পাঁচ মিনিট অন্তর নূতন নূতন শিঙ্গার হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভোগ চলিতেছে। শ্রীমন্ হরিদাস স্বামীকে কৃপা করিয়া কিরূপে শ্রীবঙ্কুবিহারী প্রকট হইলেন তাহা শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে যেরূপ পাইয়াছি পাঠকগণ তাহাই আস্বাদন করুন।

শ্রীমন্ হরিদাস স্বামী প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীমন্ বঙ্কুবিহারীর কৃপা পাত্র মতে॥
শ্রীমন্ বৃন্দাবন ধামে নিধুবনে বাস।
বিরক্ত উদার প্রেম-ভক্তি-রস রাস॥
স্বতঃপ্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী।
নিধুবনে আছিলেন মৃত্তিকা ভিতরি॥
হরিদাস স্বামি-প্রতি প্রত্যাদেশ কৈলা।
স্বামী যত্ন করি মাটী খুঁদি উঠাইলা॥
পরম সৌন্দর্য্য মণিময় অপ্রাকৃত।
ভুবন মোহন রূপ অতি চমৎকৃত॥

ভুবন মোহন রূপতো ভুবন মোহন রূপ—সে রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন।

ভক্ত প্রবর হরিদাসের আনন্দের অবধি নাই, পুলক পূরিত অঙ্গে অভিষেকাদি সমাপন করিয়া রত্ন সিংহাসনে শ্রীমূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল, মহা সৌখীন বঙ্কুবিহারীর যশঃ সৌরভ অল্প দিন মধ্যেই পশ্চিমাঞ্চল ছাইয়া ফেলিল।

দিব্য রত্নালঙ্কার ও দ্রব্য সম্ভার লইয়া বহু ধনী, মহাজন, রাজা, মহারাজা, সেবা করিতে ছুটিলেন। এক আতরওয়ালা মহাজনও বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটা আতরের কুপি লইয়া হাজির হইল। "বড়িয়া আতর বিহারী জীউকা ওয়াস্তে" কিন্তু রাসবিলাসী সৌখীন বিহারী জীউর দিবানিদ্রাটী কিছু বেশী, তিনি বেলা ১১টার সময় শয়ন করিয়াছেন আর বেলা চারিটার সময় উঠিবেন। সুতরাং কাহারও দরজা খুলিবার হুকুম নাই। তখন আতরওয়ালা ভক্ত যমুনা পুলিনে স্বামীজীর খোঁজে গেলেন, স্বামীজী তখন স্মরণ মননে আবিষ্ট; ভক্ত আতরের পাত্র তাঁহার হস্তে দিতেই তিনি খুব খুসি হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আতর বালু মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে সুদূর প্রদেশ হইতে আগত ভক্ত মহাজন বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন "আমি বহু দূর হইতে বহু কষ্ট করিয়া শ্রীঅঙ্গ সেবার জন্য আনিলাম আপনি ইহা কি করিলেন? আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন?" হরিদাস বলিলেন "কেন বিহারী জীউকেইত দিলাম তিনিও ত অঙ্গীকার করিয়াছেন, আচ্ছা তুমি একটু অপেক্ষা করিয়া নিজ চক্ষে দেখিয়া যাও"। যথা সময়ে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। শ্রীবিহারী জীউ গাত্রোত্থান করিলেন তখন সকলে দেখিয়া অবাক :—

শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া সেই আতর পড়িছে।
সদ্‌গন্ধেতে দশদিক্ আমোদ করিছে॥ ভক্তমাল।

রঙ্গিয়া বিহারী জীউর গুণের কথা যখন বলিলাম তখন আরো দুই একটী বলি।—খেলিবার সাথীকে দেখিলেই অমনি খেলা রসে খেলুড়ের মন যেমন ঝুঁকিতে থাকে; নর্ম্ম ভক্ত পাইলে লীলারসময় ভগবানেরও সেইরূপ আনন্দ কৌতুক বাড়িয়া যায় ভক্তের সঙ্গে নাচানাচি আরম্ভ হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নর্ম্ম সখা ভক্ত মাধবদাস যাঁহার সহিত জগবন্ধু কাঁঠাল চুরি করিতে গিয়া শেষে ধরা পড়িয়াছিলেন, তিনিই শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন।

নিধুবনে বিহারী জীউর রূপমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন—

শ্রীল নিধুবনে শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী।
হেরিয়া মোহিত হইল রূপের মাধুরী॥ ভক্তমাল।

কিন্তু মাধবজী ভিক্ষুক, সখার জন্য কিছু আনেন নাই দেখিয়া যে লজ্জা পাইলেন, তাহাতে বেশীক্ষণ না থাকিয়া শ্রীযমুনা পুলিনে চলিয়া গেলেন।

মাধবদাস বিরক্ত বৈষ্ণব, কিছুই ভিক্ষা প্রার্থনা নাই; সমস্ত দিন চলিয়া গেল, কিছুই মিলিল না সখ্য ভাবে মাধবদাস মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন "আমি কিছু তোমায় দেই নাই তা তুমি দেবে কেন?" সায়ং কালে শ্রীরাধারাণী কতকগুলি চানা ভাজা পঠাইলেন মাধব দাস ব্যস্ত হইয়া তাহাই শ্রীবঙ্কুবিহারীকে ভোগ লাগাইয়া দিয়া সেই প্রসাদ পাইলেন। বঙ্কুবিহারী মহা সৌখীন ঘোরতর বিলাসী। আহারেও যেমন ব্যবহারে ও তেমনই। উত্তম ভোগ ভিন্ন কিছুই উদরস্থ হয়না, এক দিনের বাসি তাঁহার হজম হয়না দুর্গন্ধ লাগে, প্রিয় সখার বস্তু কিন্তু ছাড়িবারও যো নাই, তাহাতে যে তাঁহার দুর্জ্জয় লোভ। লোভে লোভে বিহারী জীউ সব চানাগুলি উদরস্মাৎ করিলেন কিন্তু শেষে উদর স্ফিত জন্মিল। পর দিন যখন প্রিয় সেবক হরিদাস বিবিধ সুখাদ্য উত্তম ভোগ লাগাইলেন তখন মুস্কিল হইল। বিহারী জীউ আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সিদ্ধ ভক্ত বুঝিলেন যে, আজ তাহার নিবেদিতান্ন গৃহিত হইল না, সাভিমানে কৈফিয়ৎ তলব করিলেন।

কেনে আজ নাহি খাও কি বিঘ্ন হইল?
বিহারী কহেন মোর, ক্ষুধা না জন্মিল॥ ভক্তমাল।

তবু ভক্ত ছাড়িলেন না "কেন, কি হইয়াছে, ক্ষুধা না হইবার কারণ কি, কোথায় কি খাইলে?" তখন কাজেই খুলিয়া বলিতে হইল।

"জগন্নাথী মাধবদাস যমুনার তীরে
খাওয়াইলে চানা ভাজা অপূর্ব্ব আমারে॥
তাহাতে ভরিল পেট ক্ষুধা নাহি লেশ।
উদর স্পন্দন তাতে হইল বিশেষ॥

বিহারী জীউর লোভ দেখিয়া ভক্ত হরিদাস মুচ্‌কিয়া হাসিলেন। একটু হিংসাও হইল, মনে মনে বলিলেন "আমার ঘৃত মাখন যদি একটু বাসি হয় তখন রোচেনা এবেলায় দেখি চানা ভাজাও চলে।" বিহারী জীউ ধরা পড়িয়াছেন একথার উত্তর নাই। সেই মাধবদাস কেমন প্রেমিক ভক্ত দেখিতে স্বামীজীর

বড় ব্যাকুলতা হইল। চেলা পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন "দেখ দেখি কোন্ ভক্ত চানা খাওয়াইয়া বিহারী জীউর পেট গরম করিয়া দিয়াছে, তাঁকে খুজে নিয়ে এস" ধীর সমীরে যমুনাতীরে মাধবদাস ধরা পড়িলেন।

চেলা কহে তাঁরে এখনি উঠহ।
আজ্ঞা বিহারী জীউর এখনি চলহ॥ ভক্তমাল।

চেলার কড়া হুকম শুনিয়া ভাবাবিষ্ট মাধবদাস উচ্চবাচ্য না করিয়া চেলার পিছনে পিছনে আসিলেন, তখন মনি-কাঞ্চন সংযোগ হইল। হরিদাসের সহিত মাধবদাসের মিলন হইল। অনিমেষ নয়নে পরস্পর চাহিয়া রহিলেন—

"অনিমেষে আঁপাদ মস্তক নিরখয়"। ভক্তমাল।

চক্ষে চক্ষে কি কথা হইল বুঝি না, শেষে পীরিতি মাখা মধুর স্বরে রসিক হরিদাস হাসিয়া বলিলেন। "গুপ্ত প্রণয় যে ধরা পড়িল? বঁধুকে নিয়ে চুলে চুলে কি অমৃত মাখা চানা খাওয়াইয়া ছিলে, ঠাকুরটী যে সামলাইতে পারেন নাই, এখন যে দেখছি পেট ফুলিয়াছে"। সরল মাধবদাস ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া রহিলেন, কিছুই বুঝিলেন না—

শুনিয়া স্বামীর বাণী শ্রীমাধবদাসে।
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি চাহে অদ্ভুত রসে॥ ভক্তমাল।

মাধবদাস সেদিন দেখিলেন সত্যই মিষ্টান্ন পক্কান্ন সব পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবিলেন আমি কি কুকার্য্য করিয়াছি, প্রভুর যে দেখ্‌চি বিষম ক্লেশ হইয়াছে। এই বলিয়া হাপুষ নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

"দর দর ধারা বহি পড়ে দুনয়নে।
শ্রীবদনে চানা আমি খাওয়াইনু কেনে"॥ ভক্তমাল

শেষে দুই ভক্তের প্রেমালিঙ্গন ও পরমানন্দে নৃত্য আরম্ভ হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীবামাচরণ বসু।

হতাশের নিবেদন।

হোলনা এবার বুঝি সাধন ভজন।
অমূল্য জীবন বৃথা গেল অকারণ॥
মায়ের কোমল কোলে,
শৈশব গিয়াছে চ'লে,
যাপিয়াছি কুতুহলে কিশোর জীবন।
কে জানে কণ্টক আছে শেষেতে এমন॥

চঞ্চল করিল মন, বশে না রহিল
রিপু ছয় তাহে বাদি বিপদ ঘটিল॥
কুপথে লইল সদা,
কি এক লাগিল ধাঁধাঁ,
নারিনু ধরিতে পথ যথা শান্তি রাজে।
অমূল্য সময় হায়, গেল বৃথা কাজে॥

এখনও বুঝিতে নারি যেন অচেতন।
কেমনে হইবে বশ দুষ্ট রিপুগণ॥
মনে করি মনে ধরি,
রাখি নিজ বশ করি,
রিপু দলে জয় করি কেন পরাধীন।
পারিনা পলকে হই শকতি বিহীন॥

নিরন্তর অন্ধকারে অনন্ত নরকে।
উঠি পড়ি পথ নাই যেন ঘুর্ণিপাকে॥
রক্ষা কর দীন জনে,
গুরুদেব নিজ গুণে,
ত্রাণ কর মহাঘোরে বাঁচাও জীবন।
ভরসা কেবল তব ওদুটি চরণ॥

ওদুটি চরণ তব ভরসা আমার।
বুঝিনু এখন দেব সকলি অসার॥
এই ভিক্ষা যাচি পদে,
যেন আর পদে পদে,
আপদে সম্পদ ভাবি তামসে ডুবিয়া
আমার আমার করি মরি না কাঁদিয়া॥

আমার আমার ক'রে কত যে ঘুরিনু।
দুর্ল্লভ মানব জন্ম বৃথায় খোয়ানু॥
আমার ভেবেছি যাহা,
আমার না হ'য়ে তাহা,
কত যে দিয়াছে দুঃখ কেমনে বলিব।
গরলে অমৃত ভাব কবে গো ত্যজিব॥

অনিত্য বাসনা ল'য়ে কত দিন র'ব।
কত দিনে জ্ঞান চক্ষু মেলিতে শিখিব॥
শীতল হইবে প্রাণ,
বাসনার অবসান,
কত দিনে হবে, মম ঘুচিবে জঞ্জাল।
কত দিনে হ'ব গুরু-পদের কাঙ্গাল॥

পাপ সহচর অতি দুর্দ্দান্ত ভীষণ,
দুর্ব্বল পাইয়া মোরে করিয়া পীড়ন॥
দুঃখ-সিন্ধু মাঝ খানে,
ফেলিয়া কঠিন প্রাণে,
কত যে দিতেছে শাস্তি কি আর বলিব।
তোমার করুণা বিনা আর না বাঁচিব॥

যেতেছি ভাসিয়া দেব! কালাম্বুর পানে
রক্ষ দীনবন্ধু গুরো! রক্ষ নিজগুণে॥
শান্তির বিমল ছবি,
দূর করি দুঃখ রবি,
রাজ' গো হৃদয়ে জ্বালি সুস্নিগ্ধ কিরণ,
যথা জলে সুধাকর হাসে ত্রিভুবন॥

এ মিনতি তব পদে হে দীন শরণ।
অধম সন্তানে কর কৃপা বিতরণ॥
তোমার করুণা বলে,
যেন সেই ভাবে ভুলে,
যাঁহার চরণে বাঁধা এ তিন ভুবন।
অনায়াসে লভিতে পারি শান্তি নিকেতন॥

দীন—শ্রীবনমালী দাস ঘোষ।

ধর্ম্ম।

—:০:—

"ধর্ম্মেনৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু কিঞ্চিদপি নাস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈনমঃ॥"

পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া—জীব জাতিতে অসংখ্যবার ভ্রমণের পর, মনুষ্য জন্ম লাভ হয়, একথা বিজ্ঞান ও শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। অশেষ কষ্ট ও বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া মানব জন্ম পাইয়াও মানবের দুঃখ ভোগ শেষ হয় না, কারণ দুঃখ ময় জগৎ এবং মানব মাত্রই পরীক্ষার অধীন। যদি এ পৃথিবী পরীক্ষার

সৃষ্ট না হইত, এবং মানব মাত্রই সমান সুখ উপভোগ করিতে, পারিত, ও সকলে সমান হইত, তাহা হইলে মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্ম চিন্তা, ঈশ্বর চিন্তা, পাপ পুণ্য ইত্যাদি স্থান পাইত না। সুখ, দুঃখ, ছোট, বড়, জ্ঞানী, অজ্ঞানী ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকাতে আমরা ধর্ম্ম ও ঈশ্বর চিন্তায় রত হইয়া থাকি এবং এই প্রকার ভেদাভেদের কারণ অনুসন্ধান করিতে উৎসুক হইয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই পরম পিতা পরমেশ্বর মনুষ্যগণকে "একই উপাদানে সৃজন করিয়াছেন অর্থাৎ সকল মনুষ্যই; অস্থি, চর্ম্ম, রস, হস্ত, পদাদি যুক্ত তথাপি সকল মনুষ্য সমান নয়। কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর, কেহবা পথের ভিখারী, কেহবা দয়া মায়া, বুদ্ধি বিবেক যুক্ত মহা পণ্ডিত, কেহবা নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বিবেক বুদ্ধিহীন পাষণ্ড। ইহার কারণ কি? এই বৈচিত্রের মূল কি? সব মনুষ্য কেন এক হইল না, এক জনের ভাগ্যে সুখ শান্তি বিদ্যা বুদ্ধি কেন উদয় হইয়া থাকে, অপরের ভাগ্যে কেন হয় না এই প্রশ্নের উত্তর,— এই বৈচিত্রের কারণ বুঝিবার জন্য ধর্ম্ম চিন্তা আবশ্যক। ধর্ম্ম চিন্তা না করিলে এরহস্য ভেদ করা কঠিন। ধর্ম্ম কি পদার্থ না জানিলে মনুষ্যের মধ্যে উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ইত্যাদি ভেদাভেদ কেন হইয়াছে এপ্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। ধর্ম্মশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবগত হওয়া সুকঠিন। অতএব ধর্ম্ম কি তাহা একবার দেখা আবশ্যক।

আমরা ধর্ম্ম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, যেমন অহিংসা পরম ধর্ম্ম; এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে মনোবৃত্তি বুঝায়। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যেমন চক্ষুর ধর্ম্ম-দর্শন। কর্ত্তব্যের নামও ধর্ম্ম, যেমন পিতার ধর্ম্ম। গুণের ক্রিয়াকেও ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন অগ্নির ধর্ম্ম। বৃত্তানুসারিণী কার্য্যকেও ধর্ম্ম বলা হয়, যেমন কৃষকের ধর্ম্ম। দেশ ভেদে মানবের শ্রেণীগত ও আচার গত ব্যবহারাদির বিশেষত্বকেও ধর্ম্ম বলা হয়, যেমন মুসলমানের ধর্ম্ম। কাল যুগাদি ভেদে মানবাচারের ভেদকেও ধর্ম্ম বলা হয়, যেমন কাল ধর্ম্ম, মনুর সময়ের ধর্ম্ম এবং দৈহিক ধর্ম্ম, মানসিক ধর্ম্ম, সমাজিক ধর্ম্ম ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের সমষ্টিকেও ধর্ম্ম বলা হয়। এই প্রকার ধর্ম্ম শব্দের অর্থ লইয়া বড় গোলযোগ হইয়া থাকে। কেহ নীতি, কেহ আচার কেহগুণ ইত্যাদি ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন

কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে ধর্ম্মের ব্যাখা সম্পূর্ণ বিভিন্ন করা হইয়াছে। শাস্ত্রের কথা বলিলে একটি কথা আসিয়া পড়ে যে :—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অর্থাৎ বেদসকল পরস্পরে বিভিন্ন বিধান দাতা, স্মৃতিগুলিও সেইরূপ, এমন মুনি নাই যিনি স্বতন্ত্র মতের পোষকতা না করেন এবং ধর্ম্মের তত্ত্বগুহা-মধ্যে নিহিত অতএব মহাজনেরা যেরূপে গিয়াছেন তাহাই পন্থা। বলা বাহুল্য যে, আমরা সামান্য জীব আমাদের দ্বারা ধর্ম্ম মীমাংসা করা অসম্ভব। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাজনগণ যে পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত, যদিও নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে, তথাপি শাস্ত্র বলেন :—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্,
নৃনামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব॥

অর্থাৎ বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত শাস্ত্র, বৈষ্ণব শাস্ত্র এইরূপ নানা মার্গ প্রচারিত আছে এবং ঐ সকল মার্গের পথিকেরা সকলেই মনে করেন, আমরা যে পথে বিচরণ করিতেছি সেই পথই উত্তম। মনুষ্যের রুচি বিচিত্র তদনুসারে পথও বিচিত্র অর্থাৎ পথেরও বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। তাহা ঘটিলেও এক মাত্র গম্য তুমি। যে যে পথে যাউক সকলেই তোমাতে যাইবে। সমুদায় মনুষ্যেরই গম্য তুমি যেমন নদী সকল ঋজু ও কুটিল ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন দেশ দিয়া গমন করিলেও সকল প্রবাহেরই গম্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সকলেরই গম্যস্থান তুমি। ইহার ভাবার্থ এই যে, নানা মুনির নানা মত হইলেও তাহা আমাদের বিচার করিবার আবশ্যক নাই, কারণ তাঁহারা যে ভাবেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করুন না কেন সকলেরই চরম লক্ষ এক; অতএব আপ্তবাক্য লইয়া তর্ক করিবার আবশ্যক নাই এবং তর্কের দ্বারা সত্য নির্ণয় হয় না। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন :—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর"।

অর্থাৎ কেবল তর্কের দ্বারা সত্য নির্ণয় হয় না। যে সব মহাপুরুষগণ ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইয়া জগতের হিতের জন্য কেবল সত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি ভক্তিও অনুরাগ রাখিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে বিচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষিগণ বলেন যে, ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই। এই ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সুহৃদ্ :—

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

অর্থাৎ ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু বা হিতাকাঙ্খী। শ্রীধরস্বামী সুহৃদ্ শব্দের অর্থ করিয়াছেন :—

"সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী" গীতা ৬।৯

মৃত্যুর পর কেহই অনুগমন করে না। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই অনুগামী হইয়া থাকে। তাহা হইলে ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র পরম বন্ধু। এই পরম-বন্ধু ধর্ম্মের সাহায্যেই আমরা দুস্তর তম অর্থাৎ নরকাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকি :—

"ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং।" মনু,—

এবং এই পরম বন্ধু ধর্ম্ম হইতে বিদ্যা, ধন শৌর্য্য, কৌলিন্য, আরোগ্য এবং সংসার-নিবৃত্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে। যথাঃ—

"বিদ্যা বিত্তং বপুঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম নিরোগিতা।
সংসার-চ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে॥" মহাভারত।

এই বন্ধু ধর্ম্ম প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হইলে পরম পুণ্য মুক্তি মার্গও প্রাপ্ত হাওয়া যায়।

"ধর্ম্মঃ প্রজ্ঞাং বর্দ্ধয়তি ক্রিয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ।
বৃদ্ধপ্রজ্ঞ স্ততো নিত্যং পুণ্যমারভতে পরম্॥" মহাভারত।

আর কি পাওয়া যায়?

"ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ ধর্ম্মাদ্ভয় মাপ্নুয়াৎ।" স্কন্দ পুরাণ।

অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান হয় ধর্ম্ম হইতে লৌকিক ও পারত্রিক সকল ফল পাওয়া যায়। তজ্জন্য পুরাণ কর্ত্তা বলিতেছেন ঃ—

"তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য বিদ্বান্ ধর্ম্ম সমাচরেৎ।" স্কন্দ।

তজ্জন্য বিদ্বান্ জন অপর সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র ধর্ম্মই আচরণ করিয়া থাকে, প্রশ্ন হইতে পারে যে, অপর সমস্ত ত্যাগ করিয়া মানুষ যদি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া জড় পিণ্ডে পরিণত হয় তাহা হইলে সংসার যাত্রা কি প্রকার নির্ব্বাহ হইবে? ধর্ম্মাচরণে বা ধর্ম্ম সেবায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্ন ঘটে না, বরং ইহা উৎকর্ষতা সাধনের সহায়তা করিয়া থাকে। জনকাদি রাজগণ ধর্ম্মসেবা পরায়ণ হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নত হইয়া ছিলেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। ধর্ম্মের দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবর্গের ফল লাভ করিয়া থাকে ইহা মহাভারতে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পুরাণ কর্ত্তা আরও পরিস্কার রূপে বলিতেছেন ঃ—

"ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোঽভিজায়তে।
ধর্ম্মাদেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ॥" স্কন্দ।

অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে জ্ঞান, অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, ধর্ম্ম হইতে পরব্রহ্ম-কেও পাওয়া যায়। অতএব ধর্ম্মাশ্রয় করা সর্ব্বথা বিধেয়। এ ত্রিতাপ যুক্ত সংসারে আমরা কি চাই? আমরা চাই সুখ বা শান্তি। সে সুখ বা শান্তি অর্থ ও কামের দ্বারা হয় না। অর্থে পিপাসা পূর্ণ হয় না কেননা কামনা দুষ্পূর অর্থাৎ কিছুতেই কামনা নিবৃত্তি হয় না। অতএব যাহা সুখ বা শান্তি তাহা মনুষ্য ভাগ্যে ঘটে না। মনুষ্যগণ যদি কেবল অর্থের ও কামনার সেবা না করিয়া ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে তাহা হইলে সুখ ও শান্তি তাহাদের হৃদয়ে সদা বিরাজমান থাকিবে। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্ম-সেবার বিধান করিয়া গিয়াছেন।

এখন দেখা আবশ্যক যে, পরম বন্ধু ধর্ম্ম কি প্রকার সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকে। যদি সত্য সত্যই ধর্ম্মের দ্বারা এ প্রকার উপকার হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্ম্মই মানুষের একমাত্র সুহৃদ্ ও ইহার সেবা করা মনুষ্য-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আপ্ত-বাক্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে সত্যই উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য, অতএব

ঋষিদিগের মতে ধর্ম্ম কি ইহার লক্ষণই বা কি ইত্যাদি তত্ত্ব প্রথমে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত অতএব কোন্ মুনির মত অবলম্বন করা আবশ্যক। বেদান্ত ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে :—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ অবগত হইতে চেষ্টা করেন তিনিই যথার্থ সত্য নির্ণয় করিতে পারেন অন্যে পারেন না। বেদই ধর্ম্মের মূল তজ্জন্য বেদ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কি বলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া অবশ্যক। ঋগ্বেদ সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে :—

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥" ঋক্ ১।২২।১৮

অর্থাৎ পরমপিতা পরমেশ্বর আকাশের মধ্যে ত্রিপাদ পরিমিত স্থানে ত্রিলোক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের মধ্যে "ধর্ম্ম সকল ধারণ করিয়াছেন। এ স্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ জগন্নির্ব্বাহক নিয়ম সমূহ বুঝিতে হইবে। তাহারপর ভাগবত প্রসিদ্ধ শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য মাহামুনি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

"য এব শ্রেয়স্কর স এব ধর্ম্ম শব্দেনোচ্যতে।" মীমাংসা ১.২ সূত্র ভাষ্য।

অর্থাৎ যাহা কিছু শ্রেয়স্কর বা মঙ্গল জনক তাহার নাম ধর্ম্ম। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ধর্ম্ম মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য। যে সকল কার্য্যে মনুষ্যের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হিত হয় তাহাই ধর্ম্ম।

ক্রমশঃ—

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

আশ্রম ধর্ম্ম।

—:০:—

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামি মহোদয় লিখিত।)

ধর্ম্মোরক্ষিত ধার্ম্মিকং" ইহলোকে ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু, পরিণামে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কেহই সহগামী হয় না। ধর্ম্মই মনুষ্যকে সমুদায় সঙ্কট হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ। যে সময়ে যে দেশে ধর্ম্ম চিন্তা প্রবল হয়, সেই সময়ে সেই দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধর্ম্মে যখন এতদূর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হইতেছে, তখন ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সকলেরই আবশ্যক। ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ পরোপকার। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধারণের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক।

"পরোপকারোহি পরমো ধর্ম্ম"

এই প্রসিদ্ধ মহাবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরোপকার রূপ ব্রত পালনের তুল্য অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, এই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ কেবল সন্ধ্যার উপাসনাকেই ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাই কেবল ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যার উপাসনায় অনুরক্ত অথচ পরোপকার বিহীন তাহাকে কখনই ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। বেদে সন্ধোপসনা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত থাকিলেও কার্য্যানুরোধে যথা সময়ে উহা নির্ব্বাহিত না হইলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পরোপকার বিমুখ স্বার্থপর ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মচ্যুত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পরোপকার নিরত সাধারণের হিতচিকীর্ষু মহাত্মা যে ধার্ম্মিক পদবাচ্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যাঁহারা কেবল সন্ধ্যার আরাধনাকেই ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া কাল হরণ করিতেছেন, তাঁহারা সাধারণের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, তাহাতে প্রতিদিন ধর্ম্মের ও দেশের

উন্নতি হইবেক সন্দেহ নাই। সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষার্থ শ্রীভগবান্ মানবজাতির সৃষ্টি করিয়া এই জাতিকে ধর্ম্ম ভূষণে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত একমাত্র চতুষ্পাদ বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক ঐ চতুষ্পাদ বেদ চতুর্দ্ধা বিভক্ত হয়। এই বেদই ধর্ম্ম লাভের একমাত্র নিদান। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম চতুষ্টয় এই বেদ বিধিরই অন্তর্ভূত। মানবগণ যথাক্রমে এই বেদ বিহিত আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিবার বিধি আছে। অতএব ব্রাহ্মণ বালকগণ উপনীত হইয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারী সমাহিত হইয়া গুরু গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক যথোচিত যত্ন সহকারে গুরু শুশ্রূষা করতঃ তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা এবং গুরুকে অভিবাদন করা ব্রহ্মচারির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই আশ্রমী, গুরু অবস্থিত হইলে অবস্থান, গমন করিলে গমন, এবং উন্নত প্রদেশে উপবেশন করিলে নিম্ন প্রদেশে উপবেশন করিবে। গুরুর নির্দেশবর্ত্তী হইয়া না থাকিলে এই আশ্রমের ফল লাভ হয় না। গুরু প্রসন্ন হইলে স্বতই শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এই ছয় অঙ্গ, ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ, মীমাংসা ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, 'অর্থশাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যা প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু প্রসন্ন না হইলে জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব সাবধানে সতত গুরুর পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করা ব্রহ্মচারিগণের নিতান্ত আবশ্যক। তাহারা গুরুর প্রসাদে সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাশ্রম অবলম্বন করিবেন।

ক্রমশঃ

শ্মশান।

—:০:—

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভক্তিবিনোদ মহোদয় লিখিত।)

জীবনের সুখ রেখা শীতল চরণে
এনেছি তোমারে দিতে সুখ উপহার
বেদ মন্ত্রে করি পূজা বোল হরিবোল।
যা ছিল আমার ঘরে শেষ উপহার
সঁপিয়া তোমার কোলে শিখিলাম ভাল
তুমি বল, আমি বলি বোল হরিবোল॥

প্যাতিয়া সুখের ঘর আছিলাম সুখে
ভেবেছিনু এই মত যাবে চিরকাল
ভাঙ্গিল সুখের নিদ্রা পলাল সকলে।
ফেলি একা এ প্রশান্ত সাগরের মাঝে
চারিদিকে বিভিষিকা, ঝঞ্ঝাবাৎ রাশি
তিল মাত্র নাহি ঠাঁই জুড়াতে বিরলে॥

শ্রবণে সদাই পশে ওই উচ্চরোল
টানাটানি ভাঙ্গাভাঙ্গি উদ্দণ্ড নর্ত্তন
নাচিছে তাণ্ডব নৃত্যে ভৈরব হুঙ্কারে।
নব যৌবনোন্মত্ত অক্ষি পুট ভাঙ্গি
ছুটিতেছে অবিরল স্রোতস্বিনী যথা
ভাসায়ে বিমল গণ্ড বিভৎস্য ঝঙ্কারে॥

বিহ্বল অন্তর হ'তে হরিবোল ধ্বনি.
উঠিতেছে জল স্থল কাঁপায়ে অম্বর
করিতেছে ক্ষুণ্ন প্রাণ বৈরাগ্য আশ্রয়।

মোহ নিদ্রা ভাঙ্গাইতে, উন্নত অধীর
চিরশান্তি লভে জীব তব পদ দেশে
বলনা তোমার সম বন্ধু কে? কোথায়?

দ্বেষ, হিংসা নাহি হেথা চৌর্য্য প্রতারণা
আসে হেথা চ'লে যায়, না চায় ফিরিয়া,
বহু শ্রম উপার্জ্জিত অর্থ বিনিময়।
স্তরে স্তরে পড়ে আছে সাজ শয্যা কত
আত্মীয়ের প্রেম ভরা অন্তিমের দান
অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠ রাশি কলস মৃন্ময়॥

অন্তরের সুখ রেখা বহু মূল্য ধন
নিমিষের অন্তরালে জীবন সংশয়
কোথা যায় দেখ চাই কেন রে বিমনা।
ওই যে র'হেছে পড়ি স্মৃতি চিহ্ন তার
একবার দেখ মন রয়েছে লুকায়ে
ওই ভষ্ম রাশি মাঝে তোমার কামনা॥

এসেছি তোমার কাছে উত্তপ্ত পরাণে
হেরিয়া তোমার কোলে গঙ্গা বহমানা
শীতলকারিণী শুভা কৈবল্যদায়িনী।
শান্ত জন যেই পদ করিয়া আশ্রয়
মন সুখে গায় গান মৃদু মন্দ তানে
সুধা ধারা প্রেম ভরা পতিত পাবনী॥

মনে আছে বড় সাধ আশ্রয়ে তোমার
গঙ্গা কূলে বসি বসি কাঁদিব শুনিয়া
গঙ্গা মন্ত্র 'কারি নাম বোল হরিবোল।
ভালবাসি দিয়ে ছিলে সাধের সংসার
একে একে লইলে গো শেষ বিন্দু তার
পূর্ণাহুতি লও এবে মোরে দিয়ে কোল॥

উজ্জ্বাপন হোক মোর সংসারের লীলা
ভুলে যাই ব্রহ্মাণ্ডের নশ্বর আরতি
দাও দাও কোল দাও ব'লে হরিবোল।
কে কে আছ এস সবে শান্তি নিকেতনে
দাও মোরে সাজাইয়ে বৈরাগ্যের বেশে
বল গো বলাও নাম বোল হরিবোল॥

বলিতে বলিতে নাম সবার ইঙ্গিতে
যাই চলি জীবনের ভাঙ্গি খেলা ঘর
তুলিয়া আনন্দ ভরে রোল হরিবোল।
জ্বলুক সাধের চিতা চিরদিন তরে
পুড়ে যাক্ সংসারের পাপ স্মৃতি যত
বেড়াই উন্মত্ত প্রাণে বলি হরিবোল॥

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া।

—:০:—

মাতার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া যান।
সুরধুনী তীরে করিবারে স্নান॥
শচী দেবী সনে পথেতে মিলন।
মাঝে মাঝে হয় মধু-সম্ভাষণ॥
যখনি দেখেন শচী দেবী তাঁরে।
কোলেতে তুলিয়া লয়েন আদরে॥
বালিকাও তাঁরে সম্ভ্রমে প্রণমে।
মুখ পানে চেয়ে দাঁড়ায় সরমে।
কি এক স্নেহের ভালবাসা ডোরে।
বালিকা বাঁধিল প্রভুর মায়েরে॥

মন নাহি সরে ছাড়িয়া যাইতে।
ভুলে যান শচী নাইতে খাইতে॥
মাতার সহিত স্নানের সময়।
পথেতে দাঁড়ায়ে কত কথা হয়॥
কত শত লোক গঙ্গা স্নানে আসে।
বালিকাটী দেখে সুখ-নীরে ভাসে।
সকলেরই লক্ষ্য মুখ খানি পানে।
হেন রূপ কেহ দেখিনি নয়নে॥
মহালক্ষ্মী রূপে সনাতন সুতা।
সকলের মন করে হরষিতা॥
তার মধ্যে কিন্তু এক জন তাঁর।
বড় প্রিয়তম প্রীতি পারাবার॥
বৃদ্ধা শচীদেবী মাতার সঙ্গিনী।
বালা কিন্তু প্রিয়া দিয়াছে পরাণি॥
কি জানি কেন সে বৃদ্ধারে দেখিলে।
জগতে যা 'কিছু' সব যায় ভুলে॥
নিকটে থাকিতে বড় ভাল বাসে।
দেখা হইলে যায় তার পাশে॥
সলজ্জ নয়ন করিয়া বিনত।
পা' দু'খানি পানে, চাহে অবিরত॥
শচী দেবী কহে, যোগ্য পতি হবে।
লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, চির সুখি ভবে॥
মনে ভাবে শচী ঘর আলো করা।
এ মেয়েটী যদি পাই আমি ধরা॥
নিমায়ের সনে, বিভা দিয়ে এরে।
ঘরে ল'য়ে যাই, মাধুরী ভবের॥
ভণে হরি দাস পুরিবারে সে আশা।
বিষ্ণুপ্রিয়া চাহে, প্রভু-ভালবাসা॥

দীন—শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

বৈষ্ণব পণ্ডিত গঠন।

—:০:—

(প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন লিখিত।)

ভক্তি—বৈষ্ণব পত্রিকা,—বৈষ্ণবগণের পাঠ্য। কিন্তু কেবল বৈষ্ণবগণের পাঠের উপযোগী বিষয় লিখিত হইলে অবৈষ্ণবগণ তাহা পাঠ করিতে প্রায়শঃই ইচ্ছুক হয়েন না। এই অবস্থায় অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই এইরূপ পত্রিকা সাধারণতঃ প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য,—বহু লোকের মনে ভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করা।

যদি অভক্ত ও অবৈষ্ণব, পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত জনগণের উপযোগী প্রবন্ধ ইহাতে না থাকে তবে এতদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হইবে না। আমরা কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রচার করিব, অবশ্য এরূপ সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য আমাদের নহে। মরুভূমিতেই স্নিগ্ধ শীতল সলিল-প্রবাহের সমধিক প্রয়োজন। গাঢ় গভীর ঘোর অন্ধকারেই স্থির সমুজ্জ্বল আলোক-রাশীর একান্ত আবশ্যক। শুষ্ক রুক্ষ প্রতপ্ত হৃদয়েই ভক্তির সুধা-ধারা প্রবাহে সরস করিয়া তোলা ভক্তি প্রচারের মহান্ উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সুশিক্ষিত পণ্ডিতজনের চিত্তাকর্ষ প্রবন্ধ ভক্তিতে প্রকাশিত হওয়া উচিত। পণ্ডিতজনগণের পক্ষে তাদৃশ প্রবন্ধ প্রথমতঃ চিত্তাকর্ষক হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদিও ক্রমশঃ তাঁহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইবে। এইরূপে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তও অবশেষে তাঁহাদের রুচিজনক হইবে।

অপর কথা এই যে অধুনা পণ্ডিত সমাজে শিক্ষা বিস্তারের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বৈষ্ণব পণ্ডিত গঠন করিয়া তুলিতে না পারিলে—বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিয়া তুলিতে না পারিলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের আদর-বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

আমরা বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উপলম্বনে বৈষ্ণব সমাজে অতি শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিতে পাইতেছি। তথা কথিত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া স্মার্ত্ত মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন এবং বৈষ্ণব সমাজেও তদনুরূপ বিধি ব্যবস্থা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

এই দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণব পণ্ডিত গঠনের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অধুনা ব্যাকরণে ও কাব্যাদিতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই কেহ কেহ শ্রীভাগবত পাঠ করেন, এবং শ্রীভাগবত পাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য যে, ষড়্‌দর্শনের সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকিলে শ্রীভাগবতের তাৎপর্য্য বোধ অনেক স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। শ্রীভাগবত কাব্যাংশে যেমন শ্রেষ্ঠ, দর্শনাংশে তদপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ, আবার ভক্তি শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। এই জন্যই প্রাচীন প্রবাদ এই যে—

"বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা।"

বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা ব্যতিরেকে ভাগবত পাঠেরই অধিকার জন্মে না। ভক্তি শাস্ত্র অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা ভক্তি শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে চাহেন, ভক্তি তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীহরিভক্তি বিলাস-পাঠের পূর্ব্বে মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি জানিয়া লওয়া উচিত। মীমাংসা ন্যায়ের সহিত নব্য ন্যায়ের বিচার পদ্ধতির জ্ঞানলাভ প্রয়োজনীয়। মীমাংসা শাস্ত্র ও নব্য ন্যায়ের জ্ঞানলাভ ভিন্ন বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ পণ্ডিত সমাজে সমাদর লাভ করিতে পারিবেন না, শাস্ত্রের সুবিচার করিতেও সমর্থ হইবেন না। শঙ্কর ভাষ্য ও শ্রীভাষ্য পাঠ না করিলে ষট্‌ সন্দর্ভ বা শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিয়া উঠা সম্ভব পর নহে। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপনিষদ ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ও গীতাভাষ্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। বেদান্তের বহুল গ্রন্থ পরবর্ত্তী কালে ন্যায় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে আলোচিত হইয়াছে। মাধ্ব সম্প্রদায়ের বেদান্ত গ্রন্থগুলি ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ। ন্যায় শাস্ত্র পাঠ না করিলে এই সকল গ্রন্থে অধিকার জন্মে না। বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের বেদান্ত গ্রন্থেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অধিকার আশা

কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বেদ সংহিতা সমূহেরও আলোচনা রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহাতে ভক্তিতে এই সকল বিচারের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক মহোদয়গণের এখন হইতে তৎসম্বন্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

নিবেদন।

(ওহে) পরাণ-তম ! মানস-রম !
কোমল করো হৃদয় মম,
কুসুম জিনি নবনী সম'
ডাকিব যবে তোমারে।

তোমার নামে উথলি হৃদি,
অশ্রুধারা বহে গো যদি,
(তবে) সফল হবে জীবন মম,
ভাসিব প্রেম পাথারে॥

বিরলে বসি তোমারে আমি,
ডাকিব যবে নিখিলস্বামি !
তখনি তুমি হৃদয়ে এসো
আঁধার হৃদি উজলি।

ধেয়ান মাঝে তোমারে হেরি
নয়ন ধারা পড়িবে ঝরি,
দুকূল ভাঙ্গি হৃদয় নদী
ছুটিবে প্রেমে উথলি॥

বাহিরে আসি', যখন সখা !
জগত রণে যুঝিব একা,
বজ্র সম হৃদয় মম,
অটুট ক'রো তখনি।

তখন যেন বেদনাভরে,
যুদ্ধ হতে না যাই স'রে,
অটল হয়ে যুঝি গো যেন
শতেক ব্যাথা না গনি'॥

রণের শেষে ক্লান্তি ভরে,
ফিরিব যবে নিরালা ঘরে,
মোহন রূপে তখনি পুনঃ
আসিও হৃদি নিলয়ে !

যুঝিয়া রণে পেয়েছি যত,
মরমঘাতী আঘাত শত,
সে ব্যথা রাশি জুড়াবে মম
তোমারে লভি হৃদয়ে॥

(মম) শতেক তাপে তাপিত হৃদি
স্নিগ্ধ করো করুণা নিধি !
বরষি তব চরণ সুধা
ধন্য ক'রো অধমে।

নিখিলপতির চরণতলে,
নিবেদি আজি পরাণ খুলে
দিবস নিশি উজলি রহ
অধম-হৃদি-ভবনে॥

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী।

বাসনা।

—:০:—

বাসনা কি? বাসনা জীবের বাঞ্ছা বা ইচ্ছা, ইহা জীব হৃদয়ে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

বাসনা দুঃখ চায় না, চায় কেবল সুখ, সুতরাং সুখ ভোগ করিতে হইলে ধনের প্রয়োজন, তাই জীব বিষয় বাসনায় ব্যতিব্যস্ত। বিষয় সংগ্রহ ও স্থাপন করিতে হইলে মিথ্যা, বঞ্চনা ও শঠতা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহারা উপস্থিত হইলে সত্যের সুপ্রসস্ত দ্বার রুদ্ধ হইয়া, মিথ্যাদির গ্লানি পূর্ণ দ্বার ক্রমে ক্রমে উন্মিলিত হইতে থাকে। জীব মিথ্যাদি অন্ধকার ময় কুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে, পর ধন লুণ্ঠিত করিতেও কুণ্ঠা হয় না, আত্মপর ভিন্ন ভাব দর্শন করিয়া ঘোর নরকে নিমজ্জিত হইবার উপায় করিয়া থাকে।

যেই খানে অভাব সেই খানেই বাসনা, একটা প্রচলিত কথা আছে যে, "অভাবে স্বভাব নষ্ট" জীবের কোন বস্তুর অভাব হইলেই হৃদয় মধ্যে বাসনা সমুৎপন্ন হইয়া কর্ম্মের দিগে লক্ষ্য করে ও কর্ম্মে গিয়া প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্ম করে, কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে অভাব পূর্ণ হইয়া বাসনাও নিবৃত্তি হইয়া যায়।

বাসনা নিবৃত্তি হইয়া যায় ইহা বলাও ঠিক নয়, বাসনা ছাড়া জীব নাই, জীব-অঙ্গে বাসনা মখান, যেমন কোন অভাব জন্য বাসনা করিলাম, অভাব পূর্ণ হইল বাসনা নাই। আবার অভাব হইয়াছে, বাসনাও আসিয়াছে, জীবের যত অভাব তত বাসনা, জীবের অভাবের ইয়ত্তা নাই, বাসনারও সীমা নাই।

বাসনা সাগরের গভীরতার পরিচয় করা বড়ই কঠিন। সাগরের অসীম তরঙ্গের ন্যায় বাসনার অসীম উত্তাল তরঙ্গাঘাতে জীব-হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে, বাসনার অবধি করে কার সাধ্য?

বাসনা জীব হৃদয়ে সমদ্ভূত হইলেও জীব বাসনার অধীন, গুঁটিপোকা যেমন গৃহ রচনা করিয়া আপন গৃহে আপনিই বদ্ধ হয়, জীব তেমনি বাসনা

করিয়া বাসনার অনুগামী হইয়া থাকে জীবের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে বাসনা বহুরূপী সাজ সাজিয়া, জীবকে যখন যে পথে চালাইতেছে জীব সেই পথেই চলিতেছে।

জীব বাসনার গণ্ডিমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার সীমাবদ্ধ স্থান পরিত্যাগ করিবার আর একটুও অবসর পাইতেছে না। বহুরূপী বাসনার নানা প্রলোভনে, জীব কোনটী দেখে, কোনটী না দেখে, কোনটি করে কোনটি না করে, কেবল ইতস্ততঃ হইয়াই, উদ্দেশ্য পথ বিস্মৃতি হইয়া যায়। ভগবানের কৃপা ব্যতিত, জীবের সঙ্কল্পিত বাসনাই মিথ্যা। অনেকের বাসনা; ছুটা পাখা থাকিলে পাখীর মত আকাশে উড়িয়া ক্রীড়া করে। বাসনা জীবকে সোণার খাটে বসিয়া, রাজা রাণী লইয়া বিলাস রসে মজিবার লোভ দেখাইতেছে, বাসনা কাঙ্গালকে ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন খাওয়াইবার লালসা দেখাইতেছে, অলীক বাসনা কি জীবকে একটীও ফল লাভ করাইতে পারে?

"জীবের বাঞ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা না হইলে বঞ্ছা নাহি স্ফুরে॥"

কেবল সেই বাসনা-ফল-প্রদ বঞ্ছা-কল্প-তরু হরি জীবের বাসনা পূর্ণ করিলে করিতে পারেন; ভ্রান্তি পূর্ণ জীব কেবল বাসনার ঊর্দ্ধ গতির দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিতে চায়না, যে দরিদ্র, তাহার বাসনা লক্ষপতি হইব, লক্ষপতির বাসনা নরপতি হইব, নরপতির বাসনা সার্ব্বভৌম হইব, বাসনা এইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াই চলিতেছে, অলীক বাসনার প্রতি তরঙ্গে আশা প্রতিফলিত হয়, তাই জীব বাসনার মায়ায় মুগ্ধ, তাই জীব বাসনা পথের পথিক, তাই জীব বাসনার দাস। বাসনা হইতেই জীবের অধঃপতন হয়, আবার ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকে।

জীব অভিলষিত পুণ্যোদ্দেশে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, ঐ ধর্ম্ম কর্ম্মের নামই কাম্য কর্ম্ম, কাম্য কর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতীক্ষা করে, শাস্ত্র পঠন ও শ্রবণ এবং ভগবানের গুণ কীর্ত্তন ও স্বরূপাদি বর্ণন করিতে করিতে রাগ হয়, রাগ হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হয় রাগাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হইলে, তখন জীব অন্য বাসনা শূন্য হইয়া ইন্দ্রপদ,

ব্রহ্মপদ, এমন কি যোগ সিদ্ধি কি মোক্ষপদ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, কেবল সেই পরম পুরুষ, পরমানন্দ ভগবানের পদারবিন্দের মকরন্দ পান করিয়া, একেবারে ভগবানের প্রতি তদ্গত চিত্ত হইয়া যায়। ইহা ভগবানেরই কৃপা, কৃপা শক্তির স্ফুরণে বাসনা চালিত হইয়া কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করে জীবে সেই কর্ম্ম সূত্র ধরিয়া যোগ পথে চালিত হইতে থাকে। কর্ম্ম ও যোগ দ্বারা জীবের চিত্ত সত্ত্ব ধৌত শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের উদ্দিপ্ত হয়, সেই দিপ্তিমান জ্ঞানের সহিত ভগবৎকৃপার সংযোগ হইয়া রাগাত্মিকা অহৈতুকি ভক্তির উদয় হয়, তখন বাসনা নানা প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, এক ভগবানের চরণ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়া যায়।

আমরা কলির কলুষিত জীব, বাসনা সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইয়া মরিতেছি, যদি ডুবুরি হইয়া ঐ সাগরে ডুব দিয়া একবার সাগর গর্ভস্থিত রত্ন অনুসন্ধান করিয়া কুড়াইয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলে জানিতাম বাসনা বড়ই সুখের সাগর ; [illegible]রে মকর কুম্ভীরাদি বাস আছে, আর রত্নও আছে, তাহা আমার ভাগ্য দোষে জানিতে পারিলাম কৈ ? কৃপাকর দয়াময় ! আমার বাসনা যেন কামিনী কাঞ্চনের লালাসা,—যশের আকাঙ্খা ছাড়িয়া, তোমার পদ রত্নের ভাণ্ডার হইয়া যায়।

ভক্ত দাসানুদাস—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য।

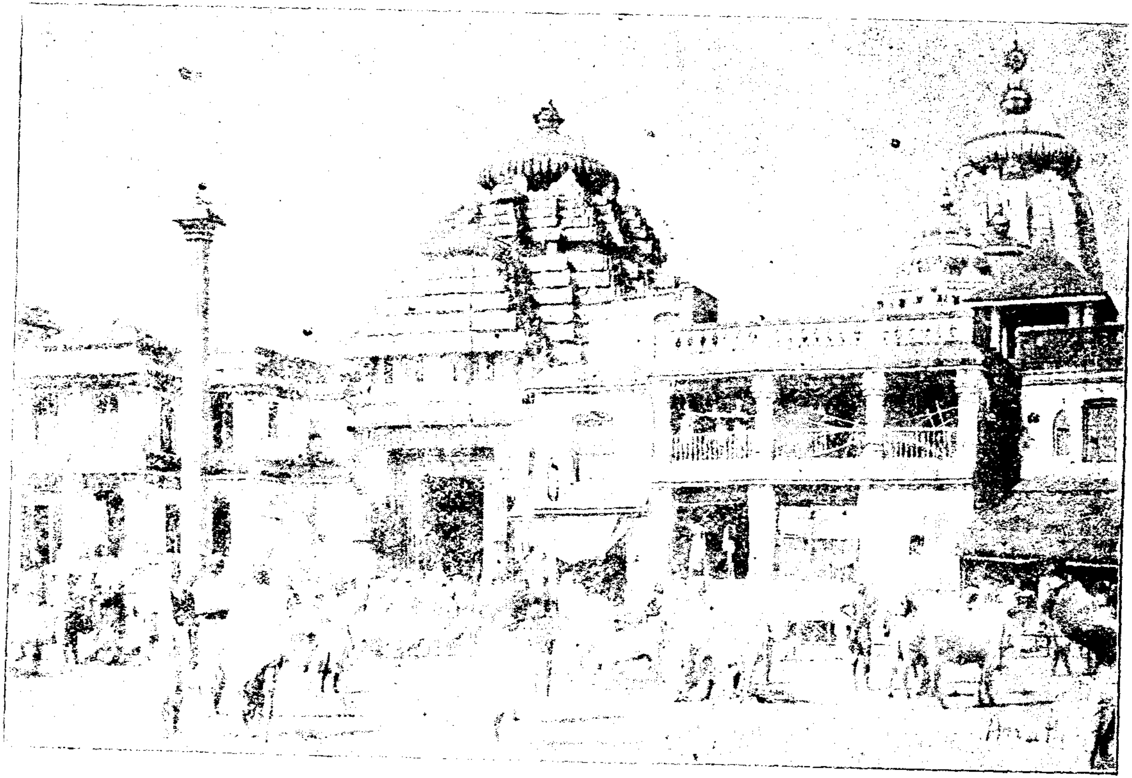

শ্রী শ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১১শ বর্ষ। চৈত্র, ১৩১৯। ৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥

দেব! তুমি সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্ব-ভয়-বিনাশন, অর্থাৎ তোমার আশ্রয় লইতে পারিলে আর কোনরূপ বিপদের বা কোনরূপ অশান্তির ভাবনা থাকেনা; তুমিই প্রাণিগণের একমাত্র গতি, তোমার আশ্রয় করিলে জীব অনায়াসেই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে, তোমার কৃপাতেই জাগতিক সমস্ত বস্তু পবিত্র হইতেছে, তুমিই পরাৎপর, তুমিই জীবের পিতা মাতা আশ্রয়-দাতা। এই ঘোর কলিকলুষিত জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায় তোমার ঐ অভয় রাতুল চরণ। তুমি কৃপা করিয়া এইবার জগজ্জীবকে উদ্ধার কর।

লীলাময়! জগজ্জীবকে লইয়া প্রতিনিয়ত কি ভাবের—কত খেলাই যে খেলিতেছ, আর কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যে নানারূপ সুখ দুঃখাদির মধ্য দিয়া ইহাদিগকে চালিত করিতেছ তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মায়ামুগ্ধ ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর আমরা কি বুঝিব! কত শত অসংখ্য ভাব, অসংখ্য কামনা বাসনা লইয়া, কত লক্ষ লক্ষ জন্ম ভ্রমণের পর বহু পুণ্য বলে এই সুদুর্লভ সাধন ভজনোপযোগী মনুষ্য দেহ লাভ হইয়াছে; কিন্তু প্রভো! জীব এমনই মোহান্ধ, এমনই চঞ্চল, মায়ায় মাদক

শৃঙ্খলে এমনই আবদ্ধ যে, প্রতি মূহূর্ত্তে প্রত্যেক কার্য্যে তোমার মঙ্গলময় সত্ত্বা পুনঃপুনঃ উপলব্ধি করিয়াও তোমাতে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। জগতের মূল সত্যরূপে তুমিই যে একমাত্র বর্ত্তমান, তোমা হইতেই যে জগত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। নানা নাম, নানা মূর্ত্তি ও নানা প্রকার উপাসনা পদ্ধতি-ভেদে এক তোমারই যে উপাসনা হইতেছে, তোমা ভিন্ন যে আর দ্বিতীয় কেহ নাই তুমিই আদি, তুমিই মধ্য তুমিই যে অন্ত এই স্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। যাবতীয় জীবই নিরন্তর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে কিন্তু তোমার মঙ্গলময় আদেশমত কার্য্য না করিয়া, আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া "নিত্য কৃষ্ণ দাস" না হইয়া "মায়ার দাস" হইয়া কষ্ট পাইতেছে। তোমারই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াবতীর কুহক-জালে জীবকুল একেবারে আত্ম সমর্পণ করিতেছে, তাই অনর্থকে অর্থ জ্ঞানে হিতাহিত, পাপপুণ্য, সদসৎ জ্ঞান হারাইয়া সুখের পরিবর্ত্তে,—শান্তির পরিবর্ত্তে অনিত্য দেহ গেহাদিতে অত্যাসক্ত হইয়া নিরন্তর দুঃখই ভোগ করিতেছে।

তুমি দয়াময়, এই দুর্ব্বল মায়াহত কলুষিত চিত্ত জীবের প্রতি যদি তুমি সদয় না হও তবে আর ইহাদের উপায় নাই। তুমি অনুপায়ের উপায়, দয়া করিয়া ইহাদের শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হৃদয়-ক্ষেত্রে তোমার অমীয় প্রেম-মন্দাকিণীর প্রবল ধারা প্রবাহিত কর, যেই ভাবে একবার নদীয়ানাগররূপে আসিয়া আপনি আচরিয়া জীবকে শিখাইয়াছিলে তেম্নি ক'রে আর একবার এস প্রভো! আবার তোমার ভাব বুঝাইয়া, তোমার প্রেমামৃতের আস্বাদন করাইয়া ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের প্রাণে শান্তি-সুধা বরিষণ কর। এবার আমার আর কিছু প্রার্থনা নাই কেবল এই প্রার্থনাটী পূর্ণ কর, যেন যে দিকে চাহিব সেইদিকেই তোমার মঙ্গলময় নামের ধ্বনি শুনিতে পাই, যাহার পানে চাহিব তাহাকেই যেন তোমার ভাবে ভাবিত দেখিতে পাই, আর যেন জ্বালা-যন্ত্রণাময় অভাবের হাহাকার ধ্বনি কর্ণে না আসে। সকলকেই যেন তোমার ভাবে বিভোর দেখিয়া সদানন্দ লাভ করিতে পারি, প্রভো! জীবের প্রাণে শান্তি দাও, সকাতরে এবার এইটীই আমার প্রার্থনা।

দীন দীনেশ—

ক্ষমা।

সংজ্ঞাহীন মানবের গর্ব্বিত বদন প্রান্তে
অঙ্কিত দেখিতে পাই তব পদ চিহ্ন।
সুতীব্র কঠোর দৃষ্টি রোষ পূর্ণ আঁখিপাশে
লুক্কাইত থাক তুমি গুপ্ত অবিচ্ছিন্ন॥
জননীর স্নেহ ল'য়ে আবির্ভাব মর্ত্ত ভূমে
শান্তির নিশান তুলি দয়া সহচরী।
বৈরীনাশ, প্রতিহিংসা প্রতিশোধ, অত্যাচার,
কটাক্ষে নিবার তুমি ওগো শুভঙ্করি!
দুর্দ্দান্ত রিপুতাড়িত দয়া শূন্য মানবের
কঠিন হৃদয়োপরি তব বাসস্থান।
বেগমান রোষ, দ্বেষ, খলতা, প্রতিহিংসার,
জান তুমি দয়াময়ি! সিদ্ধ রসায়ন॥
ক্ষেমঙ্করি! শান্তিময়ি! বিচর নিঃশঙ্ক চিত্তে
বিপদ্ সঙ্কুল এই ঘোর অবনীতে।
দুর্জ্জনের সহবাস প্রতিকার্য্যে প্রতিবাদ
সতত নিযুক্ত তুমি সন্তানে রক্ষিতে॥
সাক্ষাৎ ধরম তুমি শিখাও ধরম নীতি
নীতি শাস্ত্র সাম্যবেদ অবোধ মানবে।
পলকের অন্তর্ধানে জগতে প্রলয় হয়
শান্তিদাত্রী তুমি মাগো! সংসার আহবে॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

বৃন্দাবন ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ণচন্দ্রের সুবিমল জ্যোতি কি কখনও চাপিয়া রাখা যায়? বৃন্দাবনের নিভৃত কাননে প্রস্ফুটিত বনকুসুমের অপূর্ব্ব সৌরভ দিল্লির বাদসাহের রাজ-দরবারে পৌঁছিল।

হিন্দু ভাবাপন্ন সম্রাট আকবর সাহ শুনিলেন শ্রীল হরিদাস স্বামী সঙ্গীত কলা বিদ্যায় সিদ্ধ, আবার পরম ভাগবত।

মেঘ ছাপান্ন কোট্ রাগ সীচত যাঁহা।
মুক্তি যাহারা আঁয়া ভরত পানি"

আকবর গুণের আদর করিতে জানিতেন, বিশেষতঃ সাধু ভক্তের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তাই সিদ্ধ পুরুষকে আনাইবার জন্য আকবর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পাঠাইলেন।

মহা অনুভব সিদ্ধ শুনিয়া পাত্সা।
দেখিবার মনে বড় হইল তিরিষা॥
লইয়া যাইতে রাজা এই সিদ্ধ জনে।
যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবৃন্দাবনে॥ (ভক্তমাল)

ভজনানন্দী ভক্ত, সম্রাটের ঐ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তবে তাঁহার শিষ্য তনুশ্যামকে পাঠাইলেন। এই তনুশ্যামই দিল্লিশ্বরের দরবারের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন বলিয়া পরিচিত। আকবর সাহ নিরস্ত হইবার লোক নহেন, বিশেষতঃ তিনি আরও দুইজন সিদ্ধ ভক্তের কথা শুনিলেন, তাঁহাদের একজনের নাম শ্রীহরিরাম ব্যাসজী, অন্যজনের নাম শ্রীআনন্দঘন। তখন তিনি দীন ভাবে ভক্তগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বিশেষ ঐকান্তিকতা সহকারে পীড়াপীড়ি করিয়া লইয়া গেলেন।

ইহাঁরা যাইতে কেহ সম্মত নহিলা।
তথাপিহ একান্ত করিয়া নিয়া গেলা॥
কৃষ্ণ-কথা পুঁছে রাজা সুসন্দর্ভ মতে।
সাধুগণে অতি তুষ্ট হইলা তাঁহাতে॥ (ভক্তমাল)

কৌতুহলাবিষ্ট সম্রাট তাঁহাদিগের স্ব স্ব প্রেম সেবা জানিতে চাহিলেন, তাঁহারা হিন্দিতে দোঁহা বলিয়া কৌশলে প্রকাশ করিলেন। হরিদাসের সেবা চামর বীজন, আনন্দ ঘনের সেবা পাদ সংবাহন, আর ব্যাসজীর সেবা পিক দানি বহন। সম্রাট ব্যাসজীর সেবার বিষয় শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন, কেননা তাঁহার সেবা যে সর্ব্বক্ষণ চলিবে। আর দুইজনকে কিছুদিন রাখিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! প্রসঙ্গ ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি, আবার হরিদাসের সমাজ দর্শনে চলুন। হরিদাস স্বামীর সমাজের শিরোদেশেই শ্রীবঙ্কুবিহারীর সুন্দর তৈলিক চিত্র। নশ্বর দেহ রাখিয়া অপ্রাকৃত চিদানন্দ তনু আশ্রয় করিয়া ভক্ত যেন প্রাণবল্লভ বিহারীজীউর সেবার অনুক্ষণ ডুবিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার এই মধুর প্রেম সেবার ভাবে স্থানটী যেন মধুময় হইয়া রহিয়াছে। ললিত দাদাত এইস্থান ছাড়িয়া অনেকক্ষণ উঠিতেই চাহিলেন না। এখানে এক জন সেবক থাকেন, তিনি পশ্চিম দেশীয় অতি মিষ্টভাষী, মিতভাষীও বটেন। আমি চঞ্চল স্বভাব দোষে ফুল ছিড়িতে যাইতে ছিলাম তিনি অতি মিষ্ট ভাবে বলিলেন "ভাই বৃথা ফুল তুলিয়া কি হইবে?" প্রহ্লাদ দাদা তখন আমাদিগকে সমঝাইয়া দিলেন। এখানকার সমস্ত বৃক্ষই কল্প বৃক্ষরূপে এই নিত্যধামে বাস করিয়া প্রভুর সেবা করিতেছেন; একবার একজন এই তত্ত্ব না জানিয়া রাস রাণীর উদ্যানে একটী কল্প বৃক্ষে অস্ত্রের চোট মারিয়াছিলেন তাহাতে সমস্ত বৃক্ষটী কাঁপিতে লাগিল এবং দর দর ধারে রুধির ধারা বহিতে লাগিল—

অস্ত্রের আঘাতে রক্ত দেখিতে লাগিল।
ভয়ে না কাটিল আর বিস্ময় হইল॥ (ভক্তমাল)

শ্রীব্রজমণ্ডলে বৃক্ষ কর্ত্তনত দূরের কথা কেহ কৃষ্ণসেবা ভিন্ন পত্র পুষ্পও ছিন্ন করেন না।

শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বারে আমরা গবর্ণমেণ্টের একখানী সাইনবোর্ড দেখিয়া ছিলাম বটে "কেহই এই বৃন্দাবনে জীব জন্তু স্বীকার করিবেন না করিলে দণ্ডনীয় হইবেন।" শুনিলাম এইরূপ আদেশ শ্রীরাধা-কুণ্ডে শ্রীকাম্যবনে শ্রীগোবর্দ্ধনে নন্দগ্রাম বর্ষাণে প্রচারিত আছে। যখন শুনিলাম এই মন ও নেত্রাভিরাম স্থানটীর নাম রাধাবাগ তখন ইহার মাধুর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; বামা স্বভাবা শ্রীমতী পিয়ারীজীউ শ্রীরাস বিলাসের বহু বল্লভ নাগর রাজের বেয়াদবি দেখিয়া মানভরে কুপিতা ফনিনীর ন্যায় রাসস্থলী ছাড়িয়া এই নিভৃত পুস্প বটিকা মধ্যে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন, রাধাহারা নিলাজ রাধাকান্ত নানা স্থান ঘুরিয়া শেষে এইখানেই আসিয়া রাধার চরণ ধরিয়া পড়িলেন,'আর বিনাইয়া বিনাইয়া কত গাহিলেন—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্;

বহু কষ্টে সেই দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিল। এইস্থানে আসিয়া আমাদের মনে হইল বুঝি হয়তো এই বন সন্নিবিষ্ট কোন কেলীকদম্ব তলায়; সেই দুর্জ্জয় মান ভঙ্গের অভিনয় এখনও হইতেছে, কৃপা অঞ্জনে আমাদের চক্ষু রঞ্জিত হইলে আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতাম। ঐ সমাজ বাটী হইতে বাহির হইয়াই আমরা কেলী কদম্ব বীচিকায় পড়িলাম, ঠিক শ্রীযমুনার উপকুলে, ইহার নিকটেই পানিঘাট। বাল্যাবধি ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা কীর্ত্তনে শুনিয়া আসিতেছিলাম—

কালিন্দীরকূলে কেলীকন্দম্বেরী বন।
রতন বেদিকা পরে বসাব দু'জন॥

আজ পিতৃ পুণ্যফলে সেই মাধুর্য্য-ভাব-পূরিত মন-মুগ্ধকর রমণীয় স্থান নয়ন গোচর করিয়া ধন্য হইলাম। কেলীকদম্বের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলাম বঙ্গদেশীয় কদম্ব বৃক্ষের সহিত সম্বন্ধ খুব নিকট বোধ হইল না। বৃক্ষগুলি বড় ও শক্ত হয় এবং পত্রগুলি এখানকার কদম্ব পত্র অপেক্ষা কিঞ্চিত ছোট ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ আর ফুলগুলি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু সৌন্দর্য্যে ও গৌরভে খুব বড়, গায়ের বাকল স্থানে স্থানে

উঠিয়া গিয়াছে তাহাতে ভক্তচক্ষু রাধা কৃষ্ণ নামাঙ্কিত দেখিলেন; আমি হতভাগ্য ভাল বুঝিলাম না তবে একস্থানে "রাধা" নামের মত যেন বুঝিলাম। "কেকা" রবে দুই একটী ময়ূর অপূর্ব্ব রূপৈশ্বর্য্য বিস্তার করিতে করিতে আমাদের নিকটস্থ হইতে লাগিল। তাহাদের ভয় নাই, ভাবিয়াছে আমরা সেই শান্ত রাজ্যের লোক, আমরাও হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত কৃষ্ণ-সহচর ব্রজবাসী। কোম্পানীর কড়া হুকুম না থাকিলে ডানা বান্ধিয়া খাঁচায় পুড়িয়া সটান যে দেশে আনিতাম তাহা তাহারা বুঝে নাই, তাই গায়ের উপর আসিতে ছিল; শুনিলাম যাত্রীরা সকলেই চানা ইত্যাদি দেন, তাই ঐরূপ করে, আমরা কিছুই নিয়া যাই নাই তাই অনেকক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া অনেকবার পুচ্ছ শোভা বিকীরণ করিয়া শেষে বোধ হয় ভুল বুঝিল তাই ছট ফট করিয়া চলিয়া গেল। মনোহর বৃক্ষ রাজিতে নানা জাতীয় পক্ষী বিশেষতঃ শুক ও শারি ভরিয়া আছে তাহাদের স্বচ্ছন্দ নৃত্য এবং মধুর কাকলীতে বনভূমি মুখরিত। প্রকৃতির এমন সুমনোহর দৃশ্য বুঝি জগতে আর কোথাও নাই দেখিলেই শ্রীবৃন্দাবন মাধুরী জাগিয়া উঠে।

আমরা আনন্দে বনমধ্যে নানা স্থলে বিচরণ করিতেছি এই সময়ে প্রহ্লাদ দাদা বলিলেন "এক মজা দেখ্‌বে?" এই বলিয়া তিনি কোকিল কণ্ঠে "রাধে রাধে" করিয়া উঠিলেন অমনি "কিষণ্‌ কিষণ্‌ কিষণ্‌" শব্দে মধুর কুঞ্জবন মুখরিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম অসংখ্য শুক তরু-শাখায় বসিয়া উচ্চকণ্ঠে "কিষণ্‌ কিষণ্‌" বলিতেছে আর মধুর মধুর দুলিতেছে। যাত্রীরা সকলেই শুকের সঙ্গে এই রঙ্গ করেন।

শ্রীযমুনা এই স্থানে দক্ষিণ বাহিনী, পশ্চিম পাড় ভাঙ্গিতেছে, অনেক পাকা ইন্দারা নদীগর্ভে গিয়াছে তাহারা এখনও যমুনায় নামিয়া মাথা উচু করিয়া আছে। যমুনার কিনারা দিয়া বেশ বন্য রাস্তা, সেগুলি সুন্দর পরিচ্ছন্ন, যেন ঝাঁটা দিয়া ঝাট দেওয়া বোধ হইল। শুনিলাম এখানকার ভাঙ্গিরা (ভুই মালীরা) ভক্ত সেবার জন্য এই পথে বা শ্রীযমুনার কোন পথে কণ্টক বা নোংড়া জিনিষ থাকিতে দেয় না। শ্রীযমুনায় কেহ কুলি করিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিদের ধমক খাইতে হয়। পথে আমরা এক জনকে ঐরূপ পথ পরিচ্ছন্ন করিতেছে দেখিলাম,

প্রহ্লাদ দাদার কথায় তাহাকে একটি পয়সা দিলাম পয়সা পাইবা মাত্র সে "জয় রাধা রাণী" ধ্বনি করিয়া উঠিল, অপূর্ব্ব বটে, এখানে স্থাবর জঙ্গম সকলেই রাধা মন্ত্রে দীক্ষিত বটে। বৃক্ষ গুলিরও একটী বিশেষত্ব দেখিলাম পত্র রাজির নিম্ন মুখ যেন জীবকে দীনতা শিখাইতেছে।

কতকদূর যাইতেই উদাসীন সাধু ভক্তগণের মনোহর আশ্রমে পৌছিলাম, ঠিক পৌরাণিক কালের তপোবন। পশু পক্ষী সকলেই সচ্ছন্দে বিহার করিতেছে হিংসা দ্বেষ মাত্র নাই। প্রথমেই একটি বিরক্ত বৈষ্ণব নবীন উদাসীনের ক্ষুদ্র পর্ণ কুটিরে গেলাম। কুটির বলিলেই বুঝায় সেগুলি ঠিক গরুর গাড়ীর ছত্রীরও অর্দ্ধেক। কোনরূপে একজন মাথা গুজিয়া থাকিতে পারে, সাজ সরঞ্জম ছিন্ন কন্থা ও মাটীর ২।১টী বাসন মাত্র। দরজায় একটা চঠ বা লতা পাতার ঝাপ। নবীন সাধুটী বেশ গৌরাঙ্গ, বয়স ২১।২২ বৎসর মাত্র কৌপীন পরিহিত নগ্ন দেহ, অনুরাগ রঞ্জিত চক্ষু, স্মিতবদন সেই নবানুরাগোদ্দীপ্ত কান্তি দেখিলেই চক্ষু জুঁড়াইয়া যায়। তিনি অতি প্রত্যুষে একবার মাত্র বাহির হন আর ঐ ঠোরে বসিয়া কঠোর ভজন করেন। শুনিলাম তাঁহার গুরুদেবও সম্মুখস্থিত পৃথক কুড়েতেই রহিয়াছেন। বাজে কথা কহিবার ভয়ে ইনি প্রায় কাহারও সহিত কথা কহেন না। কোন প্রার্থনাও করেন না সম্পূর্ণ নির্ভর শ্রীরাধা রাণীর উপর। প্রহ্লাদ দাদাকে সঙ্গি পাইয়া আমাদের খুব সুবিধা হইয়াছিল তিনিও নিস্কিঞ্চন ভক্ত, লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ছাড়িয়া এক্ষণে প্রায় বনে বনেই বাস। ভাল সাধু ভক্তেরা কোথায় কোন নিভৃত স্থানে আছেন তাহা প্রহ্লাদের অগোচর নাই, অনেকে প্রহ্লাদকে ভাল বাসেন ও কৃপা করেন দেখিলাম। কথা বার্ত্তা নাই প্রহ্লাদ দাদা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলিয়াছেন, কিছুদূর যাইয়া চাদর খানি গুটাইয়া ধুলিতে গড়াগড়ী দিলেন, বুঝিলাম এইখানেতে নিশ্চয়ই কোন ভাল ভক্ত আছেন, যাইয়া দেখিলাম তাহাই বটে। উপবনের আরো কিছু দূরে একটী ভক্ত পল্লীর মধ্যে পড়িলাম, সেখানে আর একটী অপূর্ব্ব বস্তু মিলিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবামাচরণ বসু।

বৈষ্ণব লক্ষণ।

—:০:—

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন :—

"অহং প্রাণা বৈষ্ণবানাং মমপ্রাণাংশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
অনেব দ্বেষ্টি যো মূঢ়ো মমাসুনাং স হিংসকঃ॥
পুত্রান্ পৌত্রান্ কলত্রাংশ্চ রাজলক্ষ্মীং বিধায় চ।
ধ্যায়ন্তে সততং যে মাং কো মে তেভ্য পরঃ প্রিয়ঃ॥
পরাভক্তা নু মে প্রাণা ন চ লক্ষ্মীর্ন শঙ্করঃ।
ন ভারতী ন চ ব্রহ্মা ন দুর্গা ন গণেশ্বরঃ॥
ন ব্রহ্মা ন চ বেদাশ্চ ন বেদজননী সুরা।
ন গোপী ন চ গোপাল ন রাধা প্রাণতঃ প্রিয়া॥

অর্থাৎ আমি বৈষ্ণবগণের প্রাণ বৈষ্ণবগণও আমার প্রাণ, যে মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের প্রতি দ্বেষ ভাব করে সে আমার প্রাণহিংসক। স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি ও নানা প্রকার ঐশ্বর্য্যাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আমার ধ্যান-রত, তাহা অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কে হইতে পারে? তাহারাই আমার প্রাণ তুল্য প্রিয়। লক্ষ্মী, শিব, ভারতী, ব্রহ্মা, দুর্গা, গণপতি, বেদ, বেদমাতা, দেবগণ, গোপীগণ, ব্রজগোপালগণ, এমন কি প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকাও আমার তত প্রিয় নহে, যত প্রিয় আমার ভক্ত বৈষ্ণব। আরও বলিয়াছেন :—

---

* এই প্রবন্ধটীর অতি সামান্য অংশ গত ১০ম বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় বাহির হইয়া কয়েক মাস যাবৎ কোনও কারণে প্রকাশ বন্ধ ছিল, বর্ত্তমানে প্রকাশ আরম্ভ করায় পূর্ব্ব প্রকাশের পর হইতে দিলে অনেকের পাঠের অসুবিধা হইতে পারে, এমন কি অনেক নূতন গ্রাহক যাঁহারা গত ১০ম বর্ষের পত্রিকা একবারেই গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে এই বিবেচনায় পুনর্ব্বার আমরা পূর্ব্ব প্রকাশিত সামান্য অংশটুকু বর্ত্তমান গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়া দিলাম। (ভক্তি—সম্পাদক।)

প্রভবোঽহঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ পরিপালকঃ।
তথাপি ন সতন্ত্রোঽহং ভক্তাধীনে দিবানিশম্॥
গোলোকে বাথ বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজঞ্চ চতুর্ভুজং।
রূপ মাত্র মিদংসর্ব্ব প্রাণা মে ভক্তসন্নিধৌ॥

অর্থাৎ আমি সকলের ঈশ্বর, আমিই জীবের পরিপালক স্বরূপ, কিন্তু ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা টুকু নাই, আমি দিবানিশিই ভক্তের অধীন, গোলোকে এবং বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজ করি বটে কিন্তু সে কেবল আমার রূপমাত্র প্রাণ ভক্তগণের নিকটেই থাকে।

আহা! এ হেন ভাগবত বৈষ্ণবগণ নাজানি কতই না সদ্‌গুণে—সুলক্ষণে বিভূষিত। শাস্ত্র বলেন "বৈষ্ণবানাং লক্ষণানি কল্পকোটী শতৈরপি!" অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের লক্ষণ শতকল্পকোটী—অনন্ত। বৈষ্ণবগণ ভুবনমঙ্গল ও বিষ্ণু-সদৃশ জগৎ পূজ্য। তাঁহাদের দর্শনে, স্মরণে ও স্পর্শনে মহা মহাপাপের ধ্বংশ হয়, বৈষ্ণব-পদ দেব দুর্ল্লভ বস্তু। তাই বলিয়া কেবল লোক দেখানি বাহ্যিক তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করতঃ জপের মালা হাতে করিয়া বেড়াইলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। শাস্ত্রানুযায়ী সমস্ত গুণ না থাকিলেও অন্ততঃ কয়েকটা বৈষ্ণব লক্ষণাদি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। বিষ্ঠা-পূর্ণ পাত্র শুদ্ধ পট্টবস্ত্র দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে তাহা যেমন পবিত্র হয় না, অপবিত্রই থাকিয়া যায়, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের অন্তরে পবিত্রতা না থাকিলে অথবা তাঁহাদের জপের মালা তদ্‌গতচিত্তে ঈশ্বরারাধনা না হইয়া কপটাচার অর্থাৎ কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য অথবা লোকের নিকট প্রশংসা লাভের উদ্দেশে হইলে তাঁহারা কদাচ বৈষ্ণবপদ বাচ্য হইতেই পারেন না বরং এই শ্রেণীর পাপাচারিগণ বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক স্বরূপ ইহাঁদের অসদাচরণেই আজ কাল বৈষ্ণবের নাম শ্রবণেও অনেকের মনে কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। এবম্বিধ নামবলে পাপে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোক্তি অনুসারে মহা অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশিত হন।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ, কোনরূপ কলঙ্কই তাঁহাদিগের সুপবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে পারেনা। "বৈষ্ণবেষুগুণাঃ সর্ব্বে দোষ লেশো ন বিদ্যতে।"

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু বিগ্রহ, সুতরাং বৈষ্ণব শরীরে মহা মহা গুণাবলী দৃষ্ট হয় শ্রীচরিতামৃত মহাকাব্যে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্ব মহা গুণ গান বৈষ্ণব শরীরে।"

কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥

বৈষ্ণবগণের হরি ভজন সাত্বিক ও সর্ব্বপ্রকার কামনা বর্জ্জিত, অর্থাৎ তাঁহারা কোনও রূপ ফলাকাঙ্খী হইয়া কার্য্য করেন না, তাঁহারা ধন, জন, সুখ সম্পদাদির প্রার্থী নহেন, হরিভক্তি দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে, মোক্ষ লাভকেও তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এমন কি শ্রীহরি তাঁহাদিগকে হরি করিয়া দিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন কারণ তাঁহারা শ্রীহরিপদের প্রার্থী নহেন শ্রীহরিপদ-সেবানন্দেরই প্রার্থী।

বৈষ্ণবগণ শ্রীহরির অর্চ্চন পূজনে রত থাকাই তাঁহাদের দুর্লভ মানব জীবনের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন এবং সেই জ্ঞানেই শ্রীহরির ভজন করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ হরির ভজনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন তাই ভজনানন্দের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কেবল হরিপ্রেমে বিভোর থাকিয়া সর্ব্বদা হরি কথা শ্রবণ, হরি গুণানু-কীর্ত্তন, হরি ভজন পূজন, হরি মূর্ত্তি দর্শন, হরি ক্ষেত্র তীর্থাদিতে বাস, হরি ভক্তের সহিত সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ মননে মগ্ন থাকিতে ভালবাসেন।

বৈষ্ণবগণ শ্রীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও গীতাদি শাস্ত্র যুক্তিতে সুনিপুণ, হরি ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। হরিই তাঁহাদের উপাস্য, হরিই তাঁহাদের ধ্যান ধারণা, হরিই তাঁহাদের তন্ত্র মন্ত্র, হরিই জপ, যজ্ঞ, তীর্থ, হরিই তাঁহাদের ধন, জন, সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, হরিই তাঁহাদের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু। বৈষ্ণবগণ বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তুকেই হরির বিভূতি বলিয়া জানেন। তাঁহারা যাহা দেখেন, যাহা শুনেন, যাহা করেন সমস্তই হরির ক্রিয়া বলিয়া বোধ করেন, তাঁহারা যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গাদিতেও সেই ভুবনমোহন হরিরূপ দেখিতে পান; এমন কি তাঁহারা নয়ন মুদিয়া থাকিলেও হৃদয় মধ্যে শ্যাম সুন্দরের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম মূর্ত্তি দর্শন করিতে থাকেন। এক কথায় তাঁহারা হরিময় বিশ্ব দেখিয়া থাকেন। না দেখিবেনই বা কেন?

সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইলেও তিনি জল, স্থল, অনল, অনীল, প্রান্তর, কানন, গিরি-গহ্বর প্রভৃতি সর্ব্বত্রই সতত বিরাজ করিতেছেন। আমাদের প্রাকৃতচক্ষু থাকা সত্বেও ভাবচক্ষু না থাকায় ভগবদ্দর্শনে আমরা অন্ধ; সুতরাং তাঁহার অপরূপ ভুবন ভুলান রূপ আমাদের ভাগ্যে দর্শন লাভ ঘটে নাই।

সূর্য্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পান সেইরূপ ভগবান হরি তাঁহার অনন্ত জীবে পরমাত্মারূপে অনন্ত প্রতীয়মান হয়েন; ফলে, সকলই একমাত্র তিনি। ব্রহ্মসংহিতা বলেন :—

"যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ড কোটি-
কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অস্যার্থ—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বসুধাদি বিভূতির দ্বারা যিনি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ পৃথ্বী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশাদি পৃথক পৃথক ভূতরূপে যিনি অধিষ্ঠিত সেই নিষ্কল অনন্ত ও অশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার দেহ প্রভা সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভগবান স্বয়ং গীতাতে বলিতেছেন :—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" অর্থাৎ—আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং, সেই বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর অনন্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন এবং তাঁহার ভক্তগণ তদীয় প্রেমে পুলকিত হইয়া যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

আর তাঁহার এইরূপে দর্শন লাভ, গাঢ় প্রেমের পরিচায়ক জানিবে। করুণা নিধান শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

এ স্থলের উক্তি অবশ্য ভাগবত শাস্ত্র নহে ভক্তি-রস পাত্র অর্থাৎ ভক্তির আধার—ভক্ত। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তিগুণে শ্রেষ্ঠ তাঁহারাই মহা ভাগবত বা ভাগবতোত্তম।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

তথাহি,—

"শাস্ত্র যুক্তে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান॥
ক্রমে ক্রমে তিঁহ ভক্ত হইবেন উত্তম।
রতি প্রেম তারতম্যে ভক্ত তর তম॥
যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
একাদশ স্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

ভক্ত পাঠকগণ! এক্ষণে দেখুন রতি ও প্রেমের তারতম্যানুসারে সাধক উত্তম অধিকারী মধ্যম অধিকারী, ও লঘু অধিকারী নামে অভিধেয় হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি সম্প্রদায় বিভক্ত, যথা ঃ—

"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রাদায়িনঃ।
শ্রী,ব্রহ্ম,রুদ্র,সনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ॥

ক্রমশঃ

শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র।

ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

"বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্য ধর্ম্মঃ পুংসা গুণোর্মতঃ।
প্রতিসিদ্ধ ক্রিয়া সাধ্যঃ সগুণোহধর্ম্ম উচ্যতে॥"

অর্থাৎ—বেদাদি শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া জীবের ইহপারলৌকিক মঙ্গলের কারণ বলিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জন্য পুরুষের যে সংস্কার বিশেষ (গুণ) জন্মে তাহার নাম ধর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে দোষ জন্মে তাহার নাম অধর্ম্ম।

সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ জীবের কল্যাণের জন্য যে সকল ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ধর্ম্মের মূল বলিয়া অভিহিত হয় কারণ সে সকল কর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মনুষ্যের কল্যাণ হইতে পারেনা। শাস্ত্রে ধর্ম্মের দশটী অঙ্গ উল্লেখ হইয়াছে ;—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্দ্ধতে।
এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥"

অর্থাৎ—ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ও তপস্যা এই তিনের দ্বারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সুশান্তি ও অস্তেয় ইহার দ্বারা ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয়। মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

"অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ॥
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরা সদম্।"

অর্থাৎ—অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবগণের প্রতি দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনুক্রোশ, ক্ষমা, ও ধৃতি এই সকল সনাতন ধর্ম্মের মূল। মনু বলেন :—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ—ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা, দম, (বাহ্য বিষয় হইতে মনের দমন) অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ, বিষ্ণু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে:—

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয় সংযমঃ।
অহিংসা গুরু-শুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জবং লোভশূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য, উচ্যতে॥"

অর্থাৎ—ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অহিংসা, গুরু শুশ্রূষা তীর্থানুশরণ, দয়া, ঋজুতা, লোভ সম্বরণ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ দিগের পূজা ও অসূয়ারাহিত্য এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলি তাহা কেবল মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং উহা ইহপরকালে সুখের বিধান করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ ইহা অবলম্বন ভিন্ন মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেনা। ব্রহ্মাচর্য্য রক্ষা না করিতে পারিলে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। শরীর সুস্থ না থাকিলে দৈহিক শ্রম করা অসম্ভব এবং মানসিক তেজও উৎপন্ন হইতে পারেনা। মনের তেজ না থাকিলে মানুষ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারেনা। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়, স্মৃতিশক্তি কমিয়া যায়, শারীরিক বল ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় এবং কোন বিষয়েই চিত্ত নিবিষ্ট হইতে পারেনা এই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্যই ভারতে একদিন ধর্ম্মের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, ইহার জন্যই আর্য্যগণ ধী, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার অভাবে আজ ভারত কাঙ্গাল, হিন্দু জাতি সকল জাতি অপেক্ষা অধম। ইহাদের শরীরে প্রাণ নাই মস্তিষ্কে তেজ নাই গৃহে অন্ন নাই, কিন্তু এক সময় ইহাদের সব ছিল, আজ ইহাদের কিছুই নাই। কেন নাই? ইহার একমাত্র উত্তর কেবল ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। ব্রহ্মচর্য্যের

অভাবে শরীর দুর্ব্বল হয়, শরীর দুর্ব্বল হইলে মন দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এবং মন দুর্ব্বল হইলে মানুষের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হয়। যখন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব ছিল তখন ভারতে ধন, মান, গৌরব সমস্তই ছিল। আজ আমরা সে রত্ন হেলায় হারাইয়া অবনতির অধস্তরে অবতীর্ণ হইয়াছি। আর যে জাতি আমাদের এই অমূল্য রত্নের মর্ম্ম বুঝিয়াছে তাহারা আজ জগতে বল বীর্য্যে, ধনে ঐশ্বর্য্যে অদ্বিতীয়। যে রত্ন আমরা পায়ে ঠেলিয়াছি সে রত্ন আমেরিকাবাসিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া উন্নতির উচ্চ শিখায় আরোহণ করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিতেছে। সেই দেশে—সেই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠিত দেশে ভীম, অর্জ্জুন নকুল সহদেবের মত বীর এখনও জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং ভারতে বিশেষত বাঙ্গালীর গৃহে কেবল বাক্যবীর অকাল কুষ্মাণ্ডদলের বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের আর ৪৮।৩৬।২৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের নিয়ম নাই কিন্তু ইংরাজগণ এব্রত গ্রহণ করিয়া অন্তত ২৫ বৎসরও অবিবাহিত থাকিতেছেন, তাই তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক বলের উৎকর্ষতা সাধিত হইতেছে। তাঁহারা অবশ্য এজগতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্মচর্য্যের কদর করিয়া থাকেন। তাঁহাদের তুলনায় আমরা বর্ত্তমানে অতি সামান্য জীব। এজগতে যাহারা সামান্য পর জগতে যে তাহারা কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইব তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। যাহা হউক ব্রহ্মচর্য্য যে একটী অমূল্যনিধি তাহা সহৃদয় পাঠকগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, এবং ইহা যে আমাদের পরম-বন্ধু ও মঙ্গলদায়ক তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তারপর সত্য, দয়া, ধৃতি, লোভসম্বরণ অস্তেয় ইত্যাদি যে পরম কল্যাণকর তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে,—ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বচন অবহেলা করিলে আমাদের ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইতে পারেনা। চুরি করিয়া, মিথ্যা বলিয়া, স্বেচ্ছাচারী হইয়া আমরা ধার্ম্মিক হইতে পারিনা, এবং যদিও লোক সমাজে কোন রকমে দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়াও অব্যাহতি পাইয়া থাকি তথাপি যিনি একমাত্র ধর্ম্মবিচারক সেই ঈশ্বরের নিকট অব্যাহতি পাওয়া যাইবেনা তজ্জন্য মনুষ্যগণের ধর্ম্মপথের পথিক হওয়া আবশ্যক শ্রুতি বলেন:—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা" এবং "ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং"।

"অর্থাৎ ধর্ম্মেই জগতের প্রতিষ্টা এবং ধর্ম্মেই সকল প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্মের প্রভাব ইহলোক ও পরলোক পর্য্যন্ত, ইহার হাত হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই। ইহার সম্মান রক্ষা না করিলে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। চুরি কর জেলে যাইবে, যদি না ধরা পড় ঈশ্বর তোমাকে ধরিবেন, তাঁহার নিকট সাজা পাইবে। ধর্ম্মাচরণ করাই একমাত্র ঈশ্বরের আদেশ। তিনি সর্ব্বদা ধাম্মিকগণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত এবং ধর্ম্মের গ্লানি হইলে তিনিই সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন :—'

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতা ৪।৮

তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই বুদ্ধদেব, তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে জগতে আসিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনিই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া অবশেষে বলিয়াছেন :--

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥"

অর্থাৎ :—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এই মহামন্ত্র হরেকৃষ্ণ নাম ভিন্ন কলিতে অপর মন্ত্র নাই। হরিনাম, কৃষ্ণ নাম, রাম নাম জপিলে আচার ভ্রষ্ট, কর্ম্ম ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি দশ বিধ ধর্ম্ম বিনা সাধনে লাভ হইবে, কেননা ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের সমস্ত গুণই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, যথা :—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনা সতি ধাবতো বহিঃ ॥"

ভাগবত ৫।১৮।১২

অর্থাৎ—যাঁহার শ্রীভগবানে নিষ্কাম ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে দেবগণ সকল গুণের সহিত নিত্য বসতি করেন, কিন্তু যে লোক হরি ভক্তি

বিহীন তাঁহার সেরূপ গুণের সম্ভাবনা কোথায়? সে বিষয় কামনায় উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বেড়ায়।

ভক্তির উদয় হইলে মনুষ্যগণ ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবে তজ্জন্য ভক্তি যোগই কলিকালের প্রধান ধর্ম্ম। ভাগবত বলিতেছেন :—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

অর্থাৎ—যে ব্যক্তির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান জন্মে নাই অথচ সংসারেও নিতান্ত আসক্তি নাই কিন্তু আমার (ভগবানের) প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ভক্তি যোগ তাহার সিদ্ধি প্রদ।

এই অতি সহজ মন্ত্র হরিনাম চর্চ্চা ভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের আর সহজ উপায় হইতে পারে না। এই মন্ত্র-সাধনে জাতিকুল ভেদ নাই। শাণ্ডিল্য বলিতেছেন :—

"আনিন্দ্য যোন্যধিক্রিয়তে।"

অর্থাৎ—ভগবদ্ভক্তিতে নিন্দ্য যোনি অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতিরও অধিকার আছে। ভক্তি সকল ধর্ম্মের মূল ইহার নিকট মুক্তি অকিঞ্চিৎকর। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

অতএব বন্ধুগণ! সকলেরই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া উচিত; কারণ মৃত্যু করাল বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কখন যে গ্রাস করিবে তাহার ঠিক নাই। মৃত্যুর অবধারিত সময় নাই, আজ বা কাল ইহার সহিত নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেই; ইহাতে তোমার একমাত্র সুহৃদ্ কেবল ধর্ম্মই তোমাকে নরকাদি দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। মৃত্যু সময় তোমার সঙ্গে কোন ধন জন যাইবেনা, যাইবে কেবল, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, ধর্ম্ম তোমায় উদ্ধার করিবে আর অধর্ম্ম তোমায় ডুবাইবে। সুতরাং যদি সুখী হইতে চাও তবে সরলপ্রাণে ধর্ম্ম-ধনই সঞ্চয় কর, ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কোন সময়ের অপেক্ষা করিওনা। আজ করিবনা কাল করিব, এখন করিবনা বৃদ্ধ বয়সে করিব বলিয়া সময় নষ্ট করিওনা। বৃদ্ধ বয়সে রসনা যখন অবশ হইবে তখন এ নাম লইতে পারিবেনা তখন তোমার মনে চিরাভ্যস্ত কার্য্য সকলই উদয় হইবে; কিন্তু সময় হইতে যদি

হরিনামের অভ্যাস করিয়া রাখ তাহা হইলে মৃত্যুকালে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে ও নামের গুণে অনায়াসে অপার ভবনদী তরিয়া যাইবে। ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং।
কোহি জানাতি কস্যাগ্ন মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ যুবা বয়সে ধর্ম্মশীল হইবে, কারণ জীবন অনিত্য, কে জানে আজ কে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে ঃ—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য ধ্রুব মর্থদং॥"

অর্থাৎ বাল্য কালেই ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিবে জীবন কয় দিনের জন্য? মনুষ্য জন্মই দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে সফল কাম জীবন নিতান্তই অধ্রুব। ধর্ম্ম সকল সময়ে আচরণীয়, শ্রীহরি সকল সময়ে ভজনীয়। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন :— অজরামরবৎপ্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

গৃহিতাইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

অর্থাৎ অজর অমর ভাবিয়া বিদ্যা এবং অর্থ উপার্জ্জন করিবে কিন্তু মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিয়া আছে মনে করিয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মাচরণ করিবে।

যথা সময়ে ধর্ম্মাচরণ ও গোবিন্দের ভজন না করিলে মানুষ বিষয় ও বাসনার দাস হইয়া পড়ে এবং এই বাসনা সকল সংস্কারে পরিণত হইয়া মানুষের অদৃষ্ট * লিপি প্রস্তুত করিয়া স্বর্গ ও নরকের রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সাধনের জন্য,—ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের জন্য সহজ সাধ্য একমাত্র হরিনাম ধর্ম্ম, বন্ধুগণ! সকলে গ্রহণ কর। ভক্তি মার্গের পথিক হইয়া শ্রীহরিতে ভক্তি বা শ্রদ্ধা জন্মিলে সাধু সঙ্গের ইচ্ছা হইবে, সাধু সঙ্গ হইতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন, রুচি, আসক্তি, রতি জন্মিবে এবং তদ্বারা প্রগাঢ় প্রেমের আবির্ভাবে হৃদি সিংহাসনে পরমানন্দময় সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি নিত্য বিরাজ করিবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

* সূক্ষ্ম শরীরের প্রস্তাবে সংস্কার ও অদৃষ্ট আলোচনার মানস রহিল।

ভক্তি।

(সার কথা।)

(পণ্ডিত শ্রীল নিত্যানন্দ গোস্বামি মহোদয় লিখিত।)

—:০:—

অধুনা অনেকেই এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন—

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"

"সুতরাং এই উক্তি হইতে যখন কৃষ্ণভজনকারীর শুচিত্ব শ্রবণ করা যায়, তখন উহাকে লইয়া কেন একত্রে আহারাদি করা যাইবে না?"

এই প্রশ্নের উত্তরে; প্রশ্ন কর্ত্তার সংশয় অপনোদন জন্য সংক্ষেপে বৈষ্ণব শাস্ত্রের কতিপয় অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভগবৎভক্তের মহিমা অনেকানেক স্থলে, অনেকানেক রূপে উক্ত হইয়াছে; ভাষা গ্রন্থে এই ভগবৎভক্তের মহিমা প্রকাশ কারণেই "মুচি হয়ে শুচি হয়" ইত্যাদি বাক্য দর্শন করা যায়।

এই প্রকার ভজন কারীর মাহাত্ম্য বর্ণন জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

"যন্নাম ধেয় শ্রবণানু কীর্ত্তনাৎ, যৎ প্রহ্বনাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে, কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ দর্শনাৎ॥"

অর্থাৎ—হে ভগবন্, তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন ইত্যাদি একাঙ্গ ভক্তির অনুষ্ঠানেই যখন, কুক্কুর ভোজী চণ্ডাল পর্য্যন্ত সোম যাগ করিবার যোগ্যতা লাভে সক্ষম হইয়া থাকে; তখন জীব তোমার দর্শন লাভে যে কৃতার্থতা লাভ করিবে ইহার আর বিচিত্রতা কি?—

কি ভাষা গ্রন্থ, কি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ, সকল গ্রন্থেই যে এই ভক্তির এতাদৃশী মাহাত্ম্য শ্রুত হইয়া থাকে, ঐ ভক্তির স্বরূপ কি? ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তি জীবের কোন্ কোন্ পাপকে হরণ করিয়া থাকেন? এই গুলি সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক।

প্রথমতঃ লক্ষণ উক্ত হইতেছে—

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

সকল প্রকার উপাধি পরিশূন্য হইয়া তৎপরত্বে নির্ম্মলাশয় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয় সকলের চালক স্বরূপ সেই হৃষীকেশের সেবাই ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অচিন্ত্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য পূর্ণ; আশ্চর্য্য লীলা দ্বারা যিনি চরাচর বিশ্বকে আকর্ষণ করিতেছেন; সেই পরমপ্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা তাঁহার সম্বন্ধি আনুকূল্য বিশিষ্ট অনুশীলনই ভক্তি।

অনুশীলন:—অর্থাৎ প্রবৃত্ত্যাত্মক, ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীরিক মানসিক ও বাচিক চেষ্টা, এবং প্রীত্যাত্মক মানসাভাব। আনুকূল্য বিশিষ্ট ঐ ঐ ভাব, অর্থাৎ ঐ সকল চেষ্টা যদি তাঁহার অরুচিকর না হইয়া রুচিকর হয় তাহা হইলে উহা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যদি ঐ অনুশীলন, অন্যপ্রকার অভিলাষ, অর্থাৎ সকল প্রকার ভোগ বাসনা ও মোক্ষ বাসনা শূন্য এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদি—অর্থাৎ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম; শুষ্ক বৈরাগ্য, সাঙ্খ্য ও অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত না হইয়া, কেবল বিশুদ্ধ ভক্তি মাত্র কামনায়, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিময় হইলে উত্তমা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই ভক্তির বহুবিভাগ থাকিলেও, সাধারণতঃ সাধন, ভাব ও প্রেম, এই অবস্থা ভেদে ভক্তি তিন প্রকার।

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শনাদি কার্য্য দ্বারা সাধনীয়া; এবং যে সাধন দ্বারা ভাব ও প্রেম সাধ্য হয়, সেই ভক্তি সাধন ভক্তি, নামে অভিহিতা হন।

এখানে "ভাব ও প্রেম সাধ্য হয়," এই কথায় কেহ যেন "প্রেমকে অন্য এবং কৃত্রিম বলিয়া আশঙ্কা না করেন। কারণ—ইহা সে প্রকার ঘট পটাদির ন্যায়

সাধ্য নহে। এখানে সাধ্য বলিতে কেবল, হৃদয়ে নিত্য সিদ্ধ ভাবের প্রাকট্য মাত্র ; বুঝিতে হইবে—

"নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।"

জীবের হৃদয়ে প্রেম বর্ত্তমান থাকিলেও, জীব, মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঐ প্রেম প্রাপ্ত হইতেছিল না। সাধন দ্বারা মোহের ক্রমাপসরণ হইয়া, সেই নিত্য-সিদ্ধ ভাবের উদয়কেই সাধ্য ভক্তি বা প্রেম বলা যায়।

ইহা, বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। রাগের অপ্রাপ্তে, কেবল শাস্ত্র শাসনের দ্বারা যে ভক্তি জন্মাইয়া থাকে উহাকে "বৈধী ভক্তি" বলা হয়।

রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তি রাগানুগা নামে অভিহিতা হয়েন। অর্থাৎ অভীষ্ট সেই ব্রজেন্দ্র নন্দনে স্বাভাবিক প্রেমময়ী তৃষ্ণাকে (পরম আবিষ্টতা) রাগ বলা যায়। ঐ রাগাত্মিকা ভক্তি প্রকাশ্য ভাবে ব্রজবাসী জনাদিতে বিরাজমানা রহিয়াছেন ; এতাদৃশী রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি ; তাহাই রাগানুগা ভক্তি।

জীবের পক্ষে সাধন পরিপাক ব্যতিরেকে নির্ম্মল রাগের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত সাধন ভক্তি নবম প্রকার। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন।

ইহার এক একটীর দ্বারাই প্রেমলাভ হইয়া থাকে ; অথবা, কোথাও বা মিশ্রিত হইয়াও, প্রেমের সাধন করিয়া থাকেন।

প্রেমের প্রথম অবস্থা "ভাব" আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহাতে অল্প মাত্রায় অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক ভাবের প্রকাশ হয় উহাই "ভাব ভক্তি"।

ঐ সকল সাত্বিক ভাবের যখন পরিপক্কতা লাভ ঘটিয়া পূর্ণ মাত্রায় আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে প্রেম বলা যায়। অর্থাৎ যখন চিত্ত সম্যক প্রকারে নির্ম্মল হইয়া অভীষ্ট ভগবানে অতিশয় মমতাপন্ন হয়, তখন প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ অবস্থা "প্রেমের" অবস্থা। উহাকেই প্রেম ভক্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

"সম্যক্ মসৃণিত স্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥"

স্থূলতঃ ভক্তি কাহাকে বলে, এবং সাধারণতঃ উহাঁর তিনটি অবস্থা লিখিত হইল ।

এই সকলগুলিরও বহু ভেদ আছে, তাহার বিস্তার এখানে আবশ্যক নাই ।

প্রেম লাভই জীবের প্রয়োজন, এবং তাহার নিমিত্তই এই সকলের অনুষ্ঠান । ঐ অনুষ্ঠান এই ক্রমানুসারে হইলে তবে প্রেম লাভ হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমে, শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ, পরে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ সকলের নিবৃত্তি, তৎপরে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি এবং তাহা হইতে ভাব, এবং ঐ ভাব হইতে প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

ইহার, ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষ লঘুকারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা, এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী এই ছয়টি ধর্ম্ম আছে ।

ঐ ক্লেশঘ্নী লইয়াই আমাদিগের আবশ্যক । কারণ জীবের দূর্জ্জাতিতে জন্মই ক্লেশের কারণ, ঐ ক্লেশ বা পাপ হইতেই জীবের এবম্প্রকার দুঃখ ঘটিয়া থাকে । এবং ভক্তি উহা নষ্ট করিয়া থাকেন, একথা বলিলে কোন্ কোন্ পাপ নষ্ট করেন, তাহা জানা আবশ্যক ।

ইনি পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা, এই সকল গুলিকেই নষ্ট করেন । ঐ পাপ, প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার ।

যে পাপ সঞ্চিত হইয়া আত্মার অদৃষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথচ এখনও যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই "অপ্রারব্ধ পাপ । এবং যে পাপ, ফলোন্মুখ হইয়া নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণাদি করাইয়া ক্লেশ ভোগ করাইতেছে উহাই "প্রারব্ধ পাপ" ।

অতএব "ভক্তি", যখন এই সকলপ্রকার পাপকেই নষ্ট করিয়া থাকেন, তখন মুচি প্রভৃতি দূর্জ্জাতির দুর্জ্জাতিত্ব নষ্ট হইয়া অবশ্য ব্রাহ্মণাদির ন্যায় শুচিত্ব লাভ সম্ভব হইলেও, তাদৃশ শুচিত্বের প্রতি জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকিবে ।

অর্থাৎ এই জন্মে ঐ শ্রবণাদি ভক্তির একাঙ্গের দ্বারা শুচিত্বের প্রতিকুল দুর্জ্জাতির প্রারতক প্রারব্ধ পাপের নাশ হইয়া, সুজাতিত্বের জনক পুণ্যের লাভ হইয়া থাকে । কিন্তু তাদৃশ পাপের নাশ হইলেও এজন্মের এদেহের পবিত্রতা হয় না, যেহেতু দেহটী দুর্জ্জাতীয় শুক্র শোণিত সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং বুঝা যাইতেছে. যে যে পাপের দ্বারা ভবিষ্যতে, পুনর্ব্বার দুর্জ্জাতিতে

জন্মিবার সম্ভব ছিল, ভক্তি লাভের দ্বারা ঐরূপ পাপ নষ্ট হইয়া যায়, শুচিত্ব লাভের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকে।

যেমন ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মলাভ করিলেও অর্চ্চনাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ কুমারের পুণ্যময় সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা থাকে, তদ্রূপ এখানেও মুচির ভগবদ্ভক্তি দ্বারা প্রারব্ধ পাপের ক্ষয় হইয়া পুণ্য লাভ ঘটিলেও পাপের ব্যবহার বিরোধিকারূপ ধর্ম্ম জন্মান্তরের অপেক্ষায় থাকিবে।

এই ভক্তির আবৃত্তির প্রতি পূর্ব্বে যে ক্রম লিখিত হইয়াছে ঐ ক্রমানুসারে ভক্তির আবৃত্তি হইতে থাকিলে, ক্রমে, পাপাদি নাশ হইয়া পরে প্রেম লাভ হইয়া থাকে, ইহাই ভক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

নিমাই আমার কাঁদে কেন?

(পণ্ডিত শ্রীল দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামি পুরাণতীর্থ লিখিত।)

—:o:—

অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-মহোদধি শ্রীভগবান ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূভার হরণার্থ অথবা লীলাবিনোদী লীলার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে অসংখ্য অসংখ্য সেনা পরিবৃত দুর্ব্বৃত্ত রাজন্যবৃন্দকে বিনাশ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেব-বৃন্দও তদীয় ভক্তবৃন্দ মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু তিনি যে কেবল সভৃত্য বলবাহনের সহিত দুর্ব্বৃত্ত রাজন্যবৃন্দের বিনাশ করিয়াই পৃথিবীর শান্তি স্থাপন ও তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিলেন তাহা নহে। তাঁহার নিজেরও যাহা কিছু কর্ম্ম ছিল, তাহাও তিনি ঐ অবসরে সারিয়া লইলেন। যদি বলা যায়, তিনি জগদীশ্বর তাঁহার আবার কর্ম্ম কি? তদুত্তরে বলিতে হইবে কর্ম্ম আছে, যে যেমন ব্যক্তি তাহার তেমন কর্ম্ম না করিলে চলিবে কেন? তাঁহার নিজের কর্ম্ম আর কি আছে? কেবল লীলা খেলা, লীলা খেলা ব্যতিরেকে ত তিনি মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। তাই তিনি ঐ সময় আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ

লীলা খেলাও খেলিয়া লইলেন। তাঁহার বয়সের ইয়ত্তা নাই, তিনি পিতামহেরও পিতা। তথাপি নবীন কিশোর একদিনও খেলা ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি স্বয়ং জগৎ-পালক হইয়াও ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে বৎস-পালক বা গোপালক-পদে নিযুক্ত হইয়া কত খেলাই যে খেলিলেন তাহা কে বলিতে পারে? কখন বা পাহাড় লইয়া তোলপাড় করেন, কখন বা স্বয়ং অদ্বিতীয় হইয়াও স্বজাতীয় সমবয়স্ক বালকের সহিত বাহুযুদ্ধ খেলা করেন, আবার কখন কখন বা অসংখ্য অসংখ্য গোপ-যুবতীর সহিত রাত্রিতে সুমধুর রাসলীলা করেন। এই প্রকারে ভক্তজন-মনোরম নানারূপ লীলা খেলা করিয়া অবশেষে দৃশিমন্মহোৎসব শ্যাম সুন্দর বপুঃ লোক লোচনের অদৃশ্য হইলেন এবং মনে করিলেন যে, পৃথিবীর শান্তি স্থাপন করা হইয়াছে। সংপ্রতি আর পৃথিবীতে কোন ভয় নাই। এই ভাবিয়া ক্রীড়াচপল নিশ্চিন্ত মনে আবার নানা ক্রীড়ায় মগ্ন হইলেন। এদিকে অবসর পাইয়া কলিরূপ কাল সর্পও সসৈন্যে আসিয়া পৃথিবীতে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। কৃষ্ণ-সর্পের দুর্দ্দম্য বিষে সকলে জর জর, কাহারও প্রাণে শান্তি নাই। চির পরিচিতা শান্তিদেবী আজ কলি-কলুষিত জীবের হৃদয় মন্দির পরিত্যাগ করিয়া যেন প্রাণভয়ে গিরি গহ্বরে প্রবিষ্টা হইলেন। প্রকৃতি সতী যেন স্বভাব সুলভ ধৈর্য্য লজ্জাদি ও সতীত্ব-রত্ন অগাধ সাগরে বিসর্জ্জন দিয়া, চাপল্য ও কুটিলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বৈরিণীর ন্যায় নূতন সাজে সজ্জিত হইলেন। সকলেই উন্মত্ত—সকলেই কুক্রিয়া রত। ইহারা অমৃত ভ্রমে কালকূট ভক্ষণ করিতে লাগিল। কলিরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা পিপাসার শান্তি বিধানার্থ ভ্রমে মরুভূমিতে ধাবিত হইতে লাগিল। বেদ বিধি আর ইহাদের হৃদয়ে আশ্রয় না পাইয়া যেন বিষাদে মলিন হইয়া গেল।

মর্ত্ত্যবাসীর ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া ভগবৎ শক্তি শ্রীমতী করুণা দেবী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ভগবদ্বিগ্রহ হইতে মূর্ত্তিমতী হইয়া নির্গত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া মর্ত্ত্যবাসীর দুরবস্থা নিবেদন করিলেন। করুণা কহিলেন "হে জগদেকপাল ভগবন্। একবার মর্ত্ত্যবাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুণ। বর্ষাকালে অবিরল নিপতিত বারিধারা পূর্ণ ক্ষুদ্র নদী সকল যেমন

বেলাকুল অতিক্রম করিয়া নানাদিকে ধাবিত হয়, কলি প্রভাবে জীবগণও সেই-রূপ বেদ বিধি অতিক্রম করিয়া উন্মার্গ-গামী হইয়াছে। তাহারা সামান্য স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া নশ্বর সুখাভিলাষী হইয়া মহাজন-সেবিত ও চিরপরিচিত সুখময়-পথকে কণ্টকাকীর্ণ মনে করিয়া অনন্ত নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! তাহারা প্রকৃত স্বার্থও বুঝিতে পারিতেছেনা। এখন তাহারা —"কামোপ ভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতঃ"। প্রভো! এখন তাহাদের উপায় কি হইবে। আপনার কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত যে তাহাদের কোনও উপায় নাই। হে জগদ্বন্দ্য! আপনি যে উহাদের পিতা, উহারা সকলেই আপনার পুত্র। পুত্র সকলের ঐ প্রকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া আপনার নিশ্চিন্ত থাকা কখনই উচিত হয়না, চলুন! শীঘ্র চলুন! অবোধ শিশুর দুরবস্থা দূর করুন। হে লীলাবিলাসিন! সর্ব্বদা লীলারস পানে মত্ত হইয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজনকেও কি বিস্মৃত হইয়াছেন? তাহাদের ঈদৃশ অবস্থা কি আর একবারও আপনার স্মৃতি পথে উদিত হয়না। দেখুন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিটি যুগ জগতে ক্রমান্বয় চলিয়া আসিতেছে, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ বাসিগণ সকলেই আপনার প্রাজ্ঞ অর্থাৎ উপযুক্ত পুত্র। তন্মধ্যে প্রথম যুগবাসিগণ আপনার প্রথম পুত্র। ত্রেতাযুগ বাসিগণ দ্বিতীয় ও দ্বাপর যুগবাসিগণ তৃতীয় পুত্র। শেষ কলিকালবাসী জীবগণ আপনার চতুর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠ পুত্র। এই চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্রটি বিকলাঙ্গ অর্থাৎ সাধন ভজন হীন। ইহার কোনও উপায় করিবার ক্ষমতা নাই। কাজেই তাহার প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখা আপনার কর্ত্তব্য। কেননা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র অর্থাৎ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগবাসিগণ ইহারা প্রায় সকলেই সুচতুর ও কর্ম্মক্ষম। তাহারা সকলেই আপনার অনুগ্রহে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তপঃ সম্পত্তি সম্পন্ন। সুতরাং তাহাদিগকে বেশী কিছু দেন বা না দেন, তাহাতে তাহাদের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহারা আপন আপন অর্জ্জিত সম্পত্তি দ্বারাই একপ্রকার উত্তীর্ণ হইতে পারে। তাহা-দের জন্য আপনাকে বেশী কিছু ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু এই অসভ্য অশিক্ষিত বিকলাঙ্গটিকে বেশী কিছু না দিলে চলিবে কেন। ও যে একবারেই নিরুপায়। কাজেই তাহার সম্পূর্ণ ভার আপনাকেই লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এইটি আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ স্নেহের পাত্র এবং চিরসঞ্চিত গুপ্ত সম্পত্তির একমাত্র

প্রকৃত অধিকারী। অতএব যাহা কিছু আপনার উত্তম সম্পত্তি আছে, যাহা কখনও কোনযুগে বিতরণ করেন নাই এবং যাহা মধু হইতেও সুমধুর তাহাই ইহাকে দান করুন। প্রভো! লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কাহারও চারিটি পুত্র থাকে, তাহা হইলে পিতা আপন সম্পত্তি চারি পুত্রকে যথা-যোগ্য বিভাগ করিয়া দেন সত্য, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রকে মমতাধিক্য প্রযুক্ত যাহা কিছু গুপ্ত সম্পত্তি থকে তাহা তাহাকেই সমর্পণ করেন। এবং যদি কোথাও কিছু মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিজে না খাইয়া এবং অপর কাহাকেও না দিয়া পিতা কনিষ্ঠ পুত্রের হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া যেন পরমানন্দ লাভ করেন। কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি পিতা মাতার ঐ প্রকার অনুরাগ স্বভাবসিদ্ধ ও সর্ব্বজন বিদিত। সুতরাং আপনিও ঐ মতের অনুমোদন করুন।" মূর্ত্তিমতী করুণা দেবী কলিহত জীবের দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপ অনেক ভাবে সমস্ত কথা বলিয়া পুনরায় ভগবদ্বিগ্রহে প্রবিষ্ট হইলেন। করুণার বাক্যে ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তাঁহার হৃদয় করুণারসে আর্দ্র হইল। তখন তিনি জীবের জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নাব্জ কোষ হইতে অবিরল নিপতিত অশ্রুধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত হইল, কিন্তু তাঁহার সে ভাব চিরস্থায়ী হইল না, পরক্ষণেই আবার তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। কিজানি তাঁহার হৃদয়ে যেন তখন কোনও এক অনির্ব্বচনীয়ভাবের উদয় হইল। জীবের জন্য কান্দিতে কান্দিতে অকস্মাৎ তাঁহার কেন এভাব হইল, তাহা কে বলিতে পারে? সর্ব্বান্তর্য্যামির অন্তরের ভাব কে বলিবে? তবে তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি কাহারও কাছে কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা তাঁহাকে সমর্পণ করিতে পারেন নাই। এইবারে তাহাও সম্পন্ন করিবেন? তবে কি উপায়ে তাহা সমাধা করিবেন, তাহার জন্যই যেন তিনি আজ গুরুতর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন। সে যাহা হউক, তার পর করুণাদেবী করুণাময়কে এমন ভাবে আক্রমণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এবং ত্রিলোকের অজিত হইয়াও আজ করুণার নিতান্ত বশবর্ত্তী। তিনি আজ করুণার অধীন। তাঁহারই করুণা তাঁহাকে জীবের জন্য রোদন করাইতেছেন। মহামূল্য রত্ন-রাসি যেন দুঃখনাশার্থ দরিদ্র কুটীরে স্বয়ং আগত হইতেছেন, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; যে ধন আপনার

চিরস্থাপিত গুপ্তসম্পত্তি ছিল যাহা কখনও বিতরণ করেন নাই, সেই সুমধুর প্রেম ভক্তিধন আচণ্ডালে বিনামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া গৌর-রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কি আশ্চর্য্য! করুণাময়ের কি অপার করুণা! জলময় সাগর কি আর তাঁহার উপমা হইতে পারে? এইরূপ করুণা এক তাঁহাতেই সম্ভব হয়; সুতরাং তিনিই তাঁহার প্রকৃত উপমা। কেননা নিপুণব্যক্তিগণ কদাচিৎ অগাধ সমুদ্রও পার হইতে পারেন এবং তাহার গভীরতারও সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু এই শ্রীগৌরাঙ্গের করুণারাশির সীমা নির্দ্দেশ করিতে কে পারে? সামান্য মানবেরত কথাই নাই। যে করুণা রাশির বিন্দুমাত্র লাভে পারাবারকে গোস্পদ বলিয়া মনে করেন, সেই অনন্ত অসীম করুণা রাশির সীমা নির্দ্দেশ করা কি মানবের সাধ্য? সেই অপার করুণার অন্ত নির্দ্দেশ করিতে তিনই পারেন কিনা সন্দেহ। কেমন করিয়া করিবেন? তাহার যে অন্ত নাই। যাহা অন্ত বিশিষ্ট তাহাই সসীম। আর যাহার অন্ত নাই, তাহার আবার অন্ত নির্দ্দেশ কি প্রকার হইবে। অপার করুণার অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই বলিয়াই আজ তিনি করুণার অধীন হইয়া কলিদগ্ধ জীবের জন্য সুমধুর ভক্তিধন লইয়া দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া কান্দিয়া বেড়াইতেছেন।

অতঃ সাধুক্তং তাবত্তদভিজ্ঞৈঃ—

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলাবিতি।

হরি, তুমি আছ।

(পণ্ডিত শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত।)

—:০:—

একটী একটী করিয়া যখন আশার আলোকগুলি নিভিয়া যায়, নিরাশার গভীর আঁধারে বিষন্ন হৃদয় যখন ডুবিয়া পড়ে, সংসারের ধনবল,—জনবল,—বিদ্যাবল,—বা বাহুবল কিছুতেই যখন বিষাদ-নিমগ্ন হৃদয়কে উপরে তুলিতে পারেনা,—তখন বিবশ ভাবে আপন নির্জ্জন কুটীরে হরি তোমার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লই,

তোমাকে ডাকি, তোমার চরণ দর্শন লাভের জন্ম ব্যাকুল হই, অনন্ত প্রান্তরের উপর দিয়া দূরে দূরে চাহিয়া দেখি অনন্ত আকাশের নৈশ-নীলিমায় চন্দ্র তারকার জ্যোৎস্নার দিকে তাকাইয়া থাকি হরি তোমাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু মনে হয়— "হরি, তুমি আছ।"

আকাশে চাঁদ ওঠে,— বাগানে ফুল ফোটে,—শিশুরা আনন্দে কোলাহল করে —পাখীরা কলকণ্ঠে বুঝি তোমারই নাম গান করে, তটিনী কলকল-কুলু-কুলু তানে ছুটিয়া প্রবাহিত হয়, অনন্ত শ্যাম জলধির বক্ষে নিজের হৃদয় ঢালিয়া দিবার জন্য অনন্তের দিকে অনন্ত বেগে ধাবিত হয়। তখন মনে হয় প্রাণের প্রাণ শ্যামসুন্দর! আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় তটিনী কবে তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইবে, কবে তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদয় তোমাতে মিশাইয়া দিব।

পাখীর কল-কুজনে এ পোড়া প্রাণ এম্নি ব্যাকুল হয়, তটিনীর কলতানে তটস্থ তরু, লতা, বল্লরীর শ্যামল শোভায় হৃদয়ে এম্নি একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়। হে চিরসুন্দর, আমি কবে তোমার দেখা পাইব, কবে সকল ভুলিয়া তোমার শীতল চরণ তলে শরণ লইব। আশাবদ্ধ হৃদয়ে, হরি, কতবার তোমায় ডাকি তোমায় দেখিতে পাইনা, কিন্তু প্রতি ডাকে তুমি সাড়া দাও, তাই বুঝিতে পারি,—হরি তুমি আছ।

বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকি, সুপদের সুখ-শয্যায় তোমার কথাই স্মরণ হয়; দুঃখে পড়িয়া অভিমান করিয়া বলি—নিঠুর, আর কতদিন অবিশ্বাসের পাষাণ চাপে এ ক্ষুদ্র হৃদয় নিষ্পিষ্ট করিবে? কত অন্যায় কথা বলি, কত অসঙ্গত কথা মনে তুলি,—কিন্তু দীনবন্ধু পতিতপাবন! তুমি সকল দোষ ক্ষমা কর,—আত্মপরিচয় প্রদান কর। যখন তোমার মহাশক্তির মহিমা এ অবিশ্বাসীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রচারিত হয়, তখন বুঝিতে পারি "হরি, তুমি আছ।"

তোমার ইঙ্গিত অস্পষ্ট হইলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি, তুমি আমায় ভালবাস—বড় গোপনে গোপনে ভালবাস, দেখা দাও না—আড়ালে থাকিয়া ভালবাস, রসময় তোমার এ ভালবাসা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু উহার প্রতিদানে আমি কিছু দিতে পারি না, বড় লজ্জিত হই কি করিব,—আমি ক্ষুদ্র তুমি মহান্— কিন্তু এই তুলনা করিতে গিয়াও—হৃদয়ে ক্লেশ হয়, মনে হয় যেন কত দূরে রহিয়াছি—মনে হয় এ ক্ষুদ্রকীট কি করিয়া তোমার ভালবাসার যোগ্য

হইতে পারে,—কি করিয়াই বা তোমায় ভালবাসিতে পারে—মনে করি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এ কথা মনে তুলিব না, প্রাণ যদি তোমায় চায়, তবে তোমার কাছেই ছুটিয়া যাইব। আমি যোগ্য কি অযোগ্য সে বিচারে আর তখন অবকাশ থাকে না এইরূপ ভাবিয়া নিরাশ প্রাণে, হরি তোমায় ডাকি,—কত দিন-যামিনী এ পোড়া হৃদয়ে নিরাশার আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া হৃদয় দগ্ধ করে; সহসা কোথা হইতে কাণে তোমার মধুর ধ্বনি প্রবেশ করে তুমি ডাকিয়া বল "এই অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ, আমি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, আমাকে মনে করিয়া যখন যেদিকে চাহিবে তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।

দয়াময়! তোমার এ আশার ভাষা সময়ে সময়ে শুনিতে পাই; কিন্তু তাহাতে হৃদয় তৃপ্ত হয় না। আশার পরিবর্ত্তে নিরাশার কালমেঘে এ ক্ষুদ্র হৃদয় ঢাকিয়া ফেলে, তখন ভয়ে ভয়ে, আবার তোমায় ডাকি; তখনও তোমার; আশ্বাস, ধ্বনি হৃদয়ে শুনিতে পাই—তখনও-মনে হয়,—"হরি, তুমি আছ"

কিন্তু তোমার ইঙ্গিতে,—তোমার আশার ভাষায় আমি এই ক্ষুদ্র জীবন আর কতদিন ধারণ করিব। মনে হইতেছে যেন তোমাকে ছাড়িয়া কত দূরদেশে পড়িয়া রহিয়াছি—কিন্তু শুনিতে পাই তুমি আমার অতি নিকট—আমার প্রাণের অপেক্ষাও নিকট। মনে হয় ইহা সত্য কথা, তবে এত লুকোচুরি কেন? আর কত কাল এমন করিয়া আমায় প্রতারণা করিবে! দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে হৃদয়ে তেমন বল নাই যে, তোমাকে ভাল বাসিয়া টানিয়া আনিব,—ভাষায় এমন জোর নাই যে তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিব, আত্মার এমন ক্ষমতা নাই যে ছুটিয়া গিয়া স্রোতস্বিনী তটিনীর ন্যায় তোমার শ্রীচরণ তলে লুটাইয়া পড়িব। এভাবে এ ক্ষুদ্রের সহিত, হে রসময়! আর কতকাল লুকোচুরি করিবে? একটীবার দয়া করিয়া নয়ন-সম্মুখে এস। প্রাণের প্রাণ,—প্রাণবল্লভ! তুমি একটীবার দয়া করিয়া এ ক্ষুদ্রের সম্মুখে উপস্থিত হও, জীবন থাকিতে একবার তোমাকে দেখিয়া লই। আমি বুঝিয়াছি হরি "তুমি আছ" তুমি চন্দ্রে আছ, সূর্য্যে আছ, নীলাকাশের অগণ্য তারায় তারায় তোমারই হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে, ফুলে ফলে, লতায় পাতায়, জলে স্থলে সর্ব্বত্রই তুমি আছ।

তুমি চির-সুন্দর তুমি আমার চিরসুহৃদ্ আমার প্রাণ তোমাকে চায় সাধন জানিনা,—প্রেম জানিনা বৃন্দাবনের বনে বনে যে প্রেমের মোহন তানে

ব্রজগোপিকাবৃন্দ সনে তুমি লুকোচুরি খেলা কর, সেখানে তোমার এ খেলা সাজে,—চতুরে চতুরে, প্রেমিকে, প্রেমিকে. সে রস যে মাধুর্য্য প্রকৃত পক্ষেই মধুময় হইয়া উঠে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র জীব যে প্রেম-সিন্ধুর বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে অযোগ্য, তাই প্রার্থনা তোমার চিরস্বভাব লুকোচুরির ভাব ছাড়িয়া দিয়া সরল ভাবে দেখা দাও,—তাপিত প্রাণ শীতল কর। জীবন থাকিতে একবার তোমায় দেখি ; তারপর—এজীবনের যে গতি হয় হউক ; তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া যেন চিরতরে নয়ন মুদিতে পারি এই কৃপা রেখো।

মুরলী-আহ্বান।

অমানিশি অবসানে উদিত তপন।
আলোকে পুলকে সবে করে জাগরণ॥
অচেতন ছিল ধরা   রূপ রসে আত্মহারা
গৌর রবি পরকাশে হইল চেতন।
কৃতার্থ মানিল নর, দুর্লভ জীবন॥
কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন ছিল কৃষ্ণলীলা।
জীবে দয়া করি গৌর মর্ম্ম প্রকাশিলা॥
সেই লীলা রস পানে   ধন্য বিশ্ববাসিগণে
অমর হইল নর, শঙ্কা বিরহিত।
এক সূত্রে এক মালা হইল রচিত॥

প্রেম—সে সূত্রের নাম, জীব—পুষ্পচয়।
পরিলেন সেই মালা কৃষ্ণ রসময়॥
ভক্তি তার পরিমল,   আনন্দ অমোঘ ফল,
পরাইলা কণ্ঠে পরা প্রকৃতি সুন্দরী।
প্রেমিক-প্রদত্ত আরাধিকা নাম ধরি॥

কমনীয় কৃষ্ণ কণ্ঠে কুসুমের হার।
প্রেমপাশে সংগ্রথিত কি সুষমা তার॥

কিবা স্নিগ্ধ কান্তি ভাতি শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী
কোন জীবে নাই নিজ অসুত্বের লেশ।
ভূমার পরশে পাসরিল হিংসা দ্বেষ॥

সাগর সঙ্গমে আজি সরিৎ সকল।
আপন অস্তিত্ব ভুলি উল্লাসে বিহ্বল॥

আমিত্বের অপগমে আত্ম সুখ বিসর্জ্জনে
বিশ্ব সুখে ব্যস্ত জীব. বিশ্বত্বে মিশিল।
রাস-রসে গোপাঙ্গনা সর্ব্বস্ব সঁপিল॥

ভাস্কর উদয়ে যথা বিশ্ব দৃষ্ট হয়।
গৌর, আবির্ভাব তথা কৃষ্ণ পরিচয়॥

গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী জগদ্ধিত ব্রতধারী
ধর্ম্ম গ্লানি—অপধর্ম্ম অভ্যুত্থান হারী।
সাধুজন পরিত্রাতা অসাধুর অরি॥

যজ্ঞ-হবি-হেতু যাঁর ব্রত গোচারণ।
দ্বিজ-পদ-চিহ্ন রমা নিধানে ধারণ॥

দ্বিজের সম্মান তরে নিজ বংশ ধ্বংস ক'রে,
শিখালেন জীবে এই নীতি রত্নসার।
দ্বিজের কল্যাণে হবে বিশ্ব-উপকার॥

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র।

শ্রী শ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১১শ বর্ষ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

হে অন্তর্য্যামিন্! ধর্ম্ম কিসে হয় তাহা আমি জানি, কিন্তু করিতে পারি না। আর অধর্ম্ম কিসে হয় তাহা জানিয়াও ছাড়িতে পারিতেছি না। তুমি প্রাণ-বল্লভ, হৃদয়েশ্বর, আমার হৃদয়ে হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া আমাকে অধর্ম্ম-পথ হইতে নিবৃত্তি করিয়া ধর্ম্মপথে চালনা কর, এইটীই আমার প্রার্থনা, তোমার কৃপা ভিন্ন আমার আর উপায় নাই, আমাকে কৃপাকর।

প্রভো! বহু জন্মের বহু প্রার্থনা বলে এমন সুদুর্ল্লভ মানব জীবন পাইয়াও কলুর বলদের মত অবিরত সংসার চক্রে বৃথা ঘুরিতেছি, মায়ার অজ্ঞান আবরণে দুইটী চক্ষুই বিশেষ ভাবে আবৃত, কে চালাইতেছে, কেন চলিতেছি, কেনইবা যে একমুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই এসকল তত্ত্ব কিছুই বুঝিতেছি না বা একবার চিন্তাও করিতেছি না, দয়াময়! তুমি কর্ম্মপাশ মোচনকারী তাই তোমার নিকট প্রার্থনা যে, একবার কৃপাকরিয়া আমার এই দারুণ কর্ম্ম-পাশ মোচন করিয়া দাও, একবার প্রাণভরিয়া দেখি, কে আমার চালক। চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিয় দাও অন্ধকারের ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া দেখি পাপবদ্ধ না হইয়া এবং তোমার ভাবে বিভাবিত হইয়া কর্ম্মকরায় কত সুখ-

কত পবিত্রতা। দাও প্রভো! দয়া করিয়া আমার অন্ধকারে ঘোরা ফেরা ঘুচাইয়া দাও।

হে শুভকর্ম্মদায়িন্! কর্ম্মক্ষেত্রে না ঘুরাইয়া কর্ম্ম না করাইয়া যদি তুমি জীবকে রাখিতে না চাও তবে এমন কর্ম্ম দাও যাহাতে বন্ধন নাই, হা হুতাশ নাই, দুঃখ নাই; নিরন্তরই পরমানন্দ, নিরন্তরই সুখ। দয়াল! তুমিই সর্ব্বনিয়ন্তা তুমি যেমন করাইবে জীবমাত্রেই তেমন করিতে বাধ্য কিন্তু বন্ধনের জ্বালা বড়ই কষ্টকর। যাহাতে বন্ধন জ্বালায় জ্বলিতে না হয় তাহা ইচ্ছা করিলে তুমি অনায়াসেই করিতে পার। বলিবার শক্তি সহিবার শক্তি যদিও তুমি কতকটা দিয়াছ তথাপি সকল কথা, সকল রকম ব্যথা কি করিয়া বলিতে হয়, কি করিয়া সহিতে হয় তাহা বলিবার ভাষা বা সহিবার শক্তি সম্পূর্ণ আমার নাই, তাই প্রার্থনা ধৈর্য্য দাও জ্ঞান দাও, তিতীক্ষা, সন্তোষ, সত্যভাব ও প্রাণের ব্যাকুলতা দাও, মনের কথা, প্রাণের ব্যথা যথাযথ তোমায় খুলিয়া বলি, প্রভো! আমার ন্যায় অধমের বাসনানুযায়ী ফলদানে কৃপণতা করিয়া যেন বাঞ্ছাকল্পতরুনামে কলঙ্ক স্পর্শ করাইও না। এইটীই আমার বিনীত প্রার্থনা।

দীনেশ—

শ্রীপদকমল।

—:০:—

কি কর বসিয়া মন? কি ভাবে বিহ্বল?
দেখিয়া কল্পনা বলে কি চিত্র ভীষণ
শিহরিছ ভয়ে,—বহে অঙ্গে স্বেদ জল?
কেন শুষ্ক মসীময় নিরখি বদন?
কু-চিন্তা-নাগিনী বুঝি কালকূটময়
পঞ্জরে পঞ্জরে পশি অন্তরে অন্তরে.
দংশিয়া ঢালিছে বিষ ভরিয়া হৃদয়?
সহিছ দারুণ তাপ মরম ভিতরে?

হায় রে অবোধ মন! কেন অকারণ,
কালফণী আলিঙ্গন করিয়া অজ্ঞানে,
সাধ করি সহিছ এ বিষের জ্বলন?—
কি সুখে বিভোর এত বিষয়ের ধ্যানে?

যে সুখ-সুধার আশে কতই যতন
কর প্রাণপণ ভাই,—ভাবরে হৃদয়ে,—
পাও কি বারেক তার কোথাও দর্শন?

বৃথা অন্বেষণ সুধা, বিনদ বিষয়ে!
কেন এ প্রয়াস তবে, এ আশ বিফল?
কিংশুকে কমল মধু মিলে কি কখন?

ভাইরে! কাতরে কাঁদি, ঢালি অশ্রুজল
সাধি আজি তাই, তোর ধরিয়া চরণ;—
সুধা আস্বাদনে সাধ একান্তই যদি,
একান্ত বাসনা যদি জুড়াতে জীবন
শীতল কমল-মধু পিয় নিরবধি,
পিলে যাহা হয় মহাক্ষুধা নিবারণ;
শ্যামল-সুন্দর-কৃষ্ণ-কমল-চরণে
হ'য়ে ভৃঙ্গ, ওরে মন, ভুলিয়া সকল,
প্রেম-মকরন্দ পান কর প্রাণমনে!

মজরে,—ভজরে সেই শ্রীপদকমল!
বিনা শ্রীচরণ সেই, ওরে মুগ্ধ মন,
নাহি রে—নাহি রে আর জুড়াবার স্থল!

যথা যাও যাহা পাও ভ্রমি ত্রিভুবন,
নাহি আর কোথা নিত্য এ সুখ নির্ম্মল!
'আব্রহ্ম ভুবন' হ'তে,—জানিও নিশ্চয়,—
ফিরিবে আবার জীব এই যন্ত্রণায়;
বিনা সে অভয় পদ, এই মহা ভয়

অবসান আর নাহি হ'বে রে কোথায়!
আয় রে,—আয় রে, ওরে, ভুলিয়া সকল,
হ'য়ে শুদ্ধ, সাধুসঙ্গ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে,
সঁপিরে সর্ব্বস্ব সেই শ্রীপদ-কমল,
পিয়া সুধা চিরতরে জুড়াই জীবনে!!

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণব দর্শন।

(পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত।)

—:০:—

যদ্বারা পরমতত্ত্ব দৃষ্ট হয় তাহারই নাম দর্শন শাস্ত্র! দর্শন শাস্ত্রের ইহাই মুখ্যার্থ। অন্যান্য অর্থ আনুসঙ্গিক মাত্র। এখানে দৃষ্ট হওয়া শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ হওয়া, জগতের প্রাপঞ্চিক বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে উপলব্ধি হয়। আমরা চক্ষু দ্বারা দর্শন করি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শাদি অনুভব করি, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, জিহ্বার দ্বারা রসগ্রহণ করি ও মনের দ্বারা অনুভব করি। কোন অন্তরায় না থাকিলে এইরূপেই আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত অজড় যে চিদানন্দ বস্তু বিদ্যমান, যাহাকে আমরা বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছুই জানিতে পারিনা, সেই পদার্থই নিত্য ও চিদানন্দময়। জীব তাঁহার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই কৃতার্থ হইতে পারেনা। সমগ্র সাধনার মূল তাঁহার দর্শন লাভ। এই যে দর্শনের কথা বলা হইল ইহা ঔৎপত্তিক নহে, এই দর্শন ক্ষমতা জীবের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

---

* আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ৮।১৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বিশুদ্ধ অবস্থায় ভগবৎ রসাস্বাদন ভিন্ন জীবের অন্য কার্য্য নাই, জীব সেই নিখিল অনন্ত প্রেম-সিন্ধুর প্রেম বিন্দুমাত্র। সেই প্রেমসিন্ধুতে আত্ম সমর্পণই জীবন যজ্ঞের পূর্ণ উদ্দেশ্য। বিন্দু সিন্ধুকে চায়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু অনন্ত মহতে আত্ম সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা করে। কিন্তু মায়ার ঘোরে, মোহের আবরণে জীবের বিশুদ্ধ প্রকৃতি যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন জীবের অবস্থা অজীর্ণ রোগাক্রান্ত পীড়িত ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় হইয়া পড়ে। অগ্নি-মান্দ্য জনিত অরুচি রোগে যেমন অন্নের প্রতি রুচি থাকেনা, সুস্বাদু খাদ্যও যেমন বিষবৎ বলিয়া বোধ হয়। মোহাক্রান্ত জীবের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। ভগবানের দিকে আকর্ষণ বা প্রীতি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও মোহাক্রান্ত জীব তাহাকে চায় না বা তাহার অনুসন্ধান করে না। কিন্তু সুবৈদ্যের সুচিকিৎসায় অরুচি রোগাক্রান্ত রোগীর রোগ যখন প্রশমিত হয়, তখন যেমন সে আপনা হইতেই আহারিয় দ্রব্যের অনুসন্ধান করে এবং প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রসন্নতা লাভ করে। সেইরূপ সৎগুরু রূপ সাধু বৈদ্যের কৃপায় যখন পার্থিব মায়া হ্রাস হইতে থাকে তখন জীব তাহার প্রাণের প্রাণ প্রাণবল্লভের জন্য ব্যাকুল হয়।

তাহা হইলে মূল কথা এই যে, ভগবদ্দর্শন জীবের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও মানস নেত্রের আবরণ নিবন্ধন আমরা আমাদের হৃদয়েশ্বরকে দেখিতে পাই না। মানস চক্ষের এই আবরণ উন্মোচন করাই "সাধনা।"

বৈষ্ণব দর্শন এই সাধনার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈষ্ণব সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহারা অবশ্যই তাঁহার দর্শন লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে নৈরাশ্য নাই। আশার আলোক বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া বৈষ্ণব দর্শন তাহার সাধকগণকে আহ্বান করেন। এবং প্রেমময়ের সুন্দর স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর রাজ্যের দিকে পরিচালিত করেন। এই দর্শনের কৃপায় জীব দেখিতে পায় যে, তাহার মানস নেত্রের সম্মুখে আনন্দের মহাসাগর উদ্বেলিত। ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে বৈষ্ণব সাধক সেই আনন্দ সাগরের উদ্বেল তরঙ্গে মহাকীর্ত্তনের নাম রাশীর মধ্যে আনন্দ বাঁশরীর মধুর রব শ্রবণ করিয়া বিহ্বল ও বিভোর হইয়া পড়েন। তাঁহার নয়ন সমক্ষে সমুজ্জ্বল কনক কান্তি উদ্ভাসিত হয়, সেই হৈম জ্যোতীর

তরঙ্গাভিঘাতে সাধকের ধ্যান-স্তিমিত নয়ন উন্মিলিত হয়। তখন তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার সম্মুখে আনন্দ রসময় বিগ্রহ, সুঠাম লাবণ্য মধুর হেম গৌর শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন নয়ন অবলোকন করিয়া সাধক তাঁহারই শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া ধন্য হন।

গৌড়ীয় দর্শনের এই সাধনার প্রারম্ভে আনন্দ সৌন্দর্য্য, সংসারকে শ্মশানে বা মহামরুতে পরিণত করিয়া দেখা বৈষ্ণব দর্শনের উপদেশ নহে। বৈষ্ণব দর্শনের উৎপত্তি ভূমি "ভক্তি" আবার উহার বিকাশও সেই "ভক্তি" ইহার চরম পরিণতি প্রেম। ভক্তির দিব্যনেত্র ভগবদ্দর্শনের এক মাত্র ইন্দ্রিয় তাই শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "ভক্ত্যাহ হমকয়া গ্রাহ্যঃ" অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য। আবার অন্যত্র বলিতেছেন; "ভক্তি লভ্য স্বনন্যয়া" অর্থাৎ আমি একমাত্র অনন্যা ভক্তিরই লভ্য।

ভক্তি অর্থে ভগবানের দিকে টান বা ঝোঁক বুঝায়। এইটীই ভক্তির প্রাথমিক অবস্থা এই অবস্থা হইতেই রতির উদ্ভব হয়। রতি ভাব বিশেষ, রতি লাভ হইলেই উহা প্রেমনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভক্তি প্রথমাবস্থায় ভগবদুদ্দেশ্যে কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া বিশেষ। কিন্তু ইহার প্রগাঢ় অনুশীলনে এই ক্রিয়া যখন ধ্যানে পরিণত হয়, তখন ব্যবহারিক ক্রিয়া সকল নিবৃত্তি হইয়া যায়। ভগবদ্ধ্যান পরায়ণ সাধক তখন মহাযোগির ন্যায় তাহার সেই একমাত্র ধ্যেয় বস্তু, প্রাণের প্রাণ, প্রাণ বল্লভের রূপ-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। এই প্রকার অনুশীলন ভক্তির এক মহাপ্রভাব।

মানুষের হৃদয়ের যতগুলি বৃত্তি আছে তন্মধ্যে এই ভক্তি বৃত্তি অর্থাৎ ভগবানের জন্য প্রাণের টানই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম। এই জন্য বৈষ্ণব দর্শন মনস্তত্ত্বের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া কেবল এক ভক্তি-তত্ত্ব লইয়াই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

দর্শনীয় হইতেছেন শ্রীভগবান, দর্শনের উপায় হইতেছে ভক্তি, আর দর্শনকারী হইতেছে বিশুদ্ধ জীব। সুতরাং এই তিন বিষয়ই বৈষ্ণব দর্শনের আলোচ্য অন্যান্য বিষয় বৃথা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদিও ভগবান, ভক্তি ও জীবের আপাততঃ পৃথক নির্দ্দেশ প্রতীয়মান হইতেছে কিন্তু অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীবকে ভগবৎ শক্তি এবং ভক্তিকেও শ্রীভগবানের সাধকতম স্বরূপ শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব দর্শনের আলোচ্য বিষয় তিন হইয়াও এক।

ভেদ প্রতীয়মানতা এবং নিত্য ও অচিন্ত্য এ সকল বিষয় বারান্তরে বিশেষ ভাবে আলোচনার আশা রহিল।

বৃন্দাবন-ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

"অপূর্ব্ব বালক ঠাম সাক্ষাৎ গোকুল কাম্" কিন্তু গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি।

পদ্ম পলাশ লোচন এতদিন শুনিয়াছিলাম এক্ষণ চক্ষে দেখিলাম! আমিও সেই নবকিশোরের চল চল চক্ষু দেখিয়াই মজিলাম তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলাম; ভাবান্তরে ললিত দাদাও মজিলেন, এই স্মিত বদন সুধাকর দেখিয়া তিনি বালকের রক্তিমাভ পানিতল খানী নিজ কর পুটে লইয়া নির্নিমেষ লোচনে মুখারবিন্দ দেখিতেছেন, বিমুগ্ধ অনঙ্গ দাদা বলিলেন আহা!, বালকটী যেন ননী দিয়ে গড়া, অঙ্গ লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। বালকটী অকুনিত নয়নে আমাদিগের দিকে চাহিতেছে আর মধুর অধর চাপিয়া ঈষৎ হাসিতেছে। জীবনে কত সুন্দর বালক দেখিয়াছি কিন্তু এমন চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই বালকটী গজ গমনে চলিলেন আমরাও অনুবর্ত্তী হইলাম। নিকটেই শ্রীভাগবত পাঠ হইতেছিল সেই খানেই বালকটী আমাদিগের লইয়া গেলেন চারি দিকে ২৫।৩০ জন ঋষি তুল্য নিষ্কিঞ্চন ভক্ত মাটিতে বসিয়া পাঠ শুনিতেছে। বেদির উপরে ব্যাসাসনে জনৈক ব্রজ বাসী ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন সম্মুখে শ্রীবৃন্দারাণী। পুরাকালের বদরিকাশ্রমের চিত্র যে উদ্ভাসিত হইল? যেন সেই সুত বক্তা আর সৌনকাদি ঋষিগণ শ্রোতা। পণ্ডিতজী বুঝাইতেছেন "বর্ষাবসানে শরৎ ঋতুতে শ্রীযমুনার

জল যেমন নির্ম্মল হইয়া যায়, কৃষ্ণ কথামৃত শ্রবণে জীবের মলিন চিত্তও ঐরূপে কামনা শূন্য হইয়া নির্ম্মল শান্ত হয়”। সম্মুখেই দেখিলাম মহাভক্ত রামদাস হনুমান জীব মূর্ত্তি এখানকার অনেক কুঠির মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ সেবাও প্রতিষ্ঠিত, শুনিলাম, ইঁহারা দাক্ষিণাত্যবাসী রামাই বৈষ্ণব। ইহাঁদের কঠোর ভজন নিষ্ঠা দেখিয়া আমাদের ভক্তাভিমান (তখনকার মত) চূর্ণীকৃত হইল। দুইবার নাম জপ করিয়া বা একটুকীর্ত্তন করিয়া আমরা ভাবি যে আমরা খুব ভক্তি আচরণ করিতেছি ইহাদের কঠোর সাধন দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই নিষ্কিঞ্চন উদাসীনগণের মধ্যে দেখিলাম ১০।১২ মূর্ত্তি একেবারে অনিকেতন তাহারা ঝরবৃষ্টিসময়ে বৃক্ষতলে বাস করেন কাহারও কাহারও বৃক্ষের ডালে একটী ছাতা মাত্র অবলম্বন, তথাচ বেশ সুস্থ তেজঃপুঞ্জ দেহ।

“তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষং পরং” শ্রীভাগবতের এই আদেশ ইহারাই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেন।

পরিচিত প্রহ্লাদকে দেখিয়া ইহাঁরা হর্ষে “রাধে রাধে” করিয়া সম্ভাষণ করিলেন, লম্বা জটাজুটধারী তির্ব্বতীয়া ভক্তত মহানন্দে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তিনি তির্ব্বতাদি প্রব্রিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে তির্ব্বতীয়া ভক্ত বলেন। তিনি আমাদের সমধিক কৃপা করিলেন। তখন নিজে বোধ হয় মাধুকুরী পাইতেছিলেন তাহার যাহা অবশেষ ছিল সেই রুটীর টুকরা ও শাকভাজি প্রসাদ ও টেটীর (অম্ল ফল বিশেষ) আচার কিছু দিলেন। মহানন্দে ঐ প্রসাদ পাইয়া শ্রীযমুনায় যাইয়া প্রাণ ভরিয়া কর পুটে যমুনা বারি পাইলাম আর প্রবীণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা আওরাইলাম—

“কবে যমুনা তীরে পরশ করিয়ে নীরে।
পিব পিব কর পুটে তুলি ”।

তথা হইতে আমরা চৌষট্টী মোহন্তের সমাজ দর্শন করিতে চলিলাম। বেলা তখন অবসান প্রায় হঠাৎ কোথা হইতে বেনু বাজিয়া উঠিল আমরাত চকিত হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম দেখিলাম অদূরে একটী ছোট বালক বংশী বাজাইতেছে। ললিত দাদা বলিলেন বোধ হয় ফেরত গোষ্ঠের সময় হইয়াছে তাই বেনু ধ্বনী হইতেছে এখনই “গোঠ হইতে আসিবে

নন্দদুলাল আমার" সেই মধুর ভাবে অনুভাবিত হইয়া প্রেমানন্দে আমরা মোহান্তগণের সমাজ বাড়ীতে পৌছিলাম চারিদিকে ছোট প্রাচির বেষ্টিত স্থান ইহাকে সমাধি কুঞ্জ বলে সেই খানই গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাবের উজ্জল তম রত্ন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদগণ বিরাজ করিতেছেন কিন্তু দুখের মধ্যে, কাহাকেও চিনিলাম না প্রাচীন সমাজবেদীর সম্মুখে আধুনিক ফেশানে প্রস্তর স্তম্ভ প্রোথিত হইলেও তাহাতে কোন পরিচয় লিখিত নাথাকায় কাহার কোন সমাজ বুঝাগেল না এইমহাপুরুষ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামি বলিয়াছেন "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে" আজ উহাদের স্মৃতি এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া বিস্মৃতিতে যাইয়া পৌছিতেছে। অন্য দেশে বা অন্য জাতীর মধ্যে হইলে—বোধ হয় ঐরূপ হইত না। এই খানেই, মহাপ্রভুর প্রিয় পাত্র শ্রীল ভট্ট রঘুনাথ গোস্বামীর সমাজ আছে তাহাও অচিহ্নিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রহ্লাদ দাদা ২।৫টী সমাজ সম্বন্ধে লোক পরম্পরা যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ পরিচয় দিলেন। আর একটী অপব্যবহার দেখিয়া মনে ব্যথা পাইলাম এই মহা মহিমান্বিত মহা পুরুষগণের সহিত একাসনে কতকগুলী নূতন সমাজ দৃষ্ট হইল তাহাতে নাম লিখিত আছে শুনিলাম অর্থ লোভেই এইরূপ বিদৃশ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ইহা আমাদের চক্ষে আদৌ ভাল লাগিল না। সান্ধ্য আরতির সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল দেখিয়া তাড়া তাড়ি সমাধি কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া "গৌরাঙ্গপাদ পদ্ম মধুভ্যো নমঃ"—বলিয়া প্রণাম হইয়া বিশেষ অনিচ্ছা সত্বেও এই গভীর ভাবোদ্দীপক পরম রমণীয় স্থান হইতে চলিয়া আসিতে হইল।

আজ শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর আরতী দর্শন কামনায় কৃষ্ণ কথা রঙ্গে কয়েকটি পরমার্থ বন্ধু মিলিয়া আমরা দ্রুত পদে চলিয়া আসিলাম। শ্রীবিহারী গোপীনাথ জীউর দেউড়ী মধ্যে ঢুকিলাম প্রথমে পরম ভাগবত শ্রীল মধু পণ্ডিতের সমাজ দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া আরতি দর্শনে ছুটিলাম তখন ঘণ্টা কাঁশর বাজিয়া উঠিয়াছে। এখানেও মালা ও কিছু প্রণামী দেওয়া হইল।

গোপী মাঝে গোপীনাথ যে প্রেমানন্দ বিকীরণ করিতেছেন। প্রভুর আরতি দর্শনে চিত্তে বেশ প্রফুল্লতা আসিল। ঘন ঘন জয় গোপীনাথ ধ্বনিতে

মন্দির প্রাঙ্গণ শব্দিত হইতে লাগিল। আরতি কীর্ত্তনান্তে আমরা প্রেমানন্দে জয় ধ্বনি দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এইখান হইতে ললিত দাদা ও অনঙ্গ দাদা প্রভৃতি প্রভুপাদের শ্রীমন্দিরে চলিলেন আমি প্রহ্লাদ দাদার সঙ্গে তাহার কুঞ্জ কুটীরে গেলাম। তথায় যাইয়া সান্ধ্য কৃত্যাদি সমাপন করিয়া আমিও পূজ্যপাদ শ্রীরাধিকনাথ প্রভু পাদের শ্রীচরণ দর্শনে চলিলাম। যাইয়া দেখি আজ উপরের একটী ক্ষুদ্র কুঠীরে ইষ্ট গোষ্ঠী হইতেছে। আমি প্রণাম করিবা মাত্র প্রভুপাদ তাঁহার প্রেম বিস্ফারিত নেত্রে কৃপাদৃষ্টি করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভুপাদ আমাদের অদ্যকার দর্শনের কথাগুলি শুনিয়া বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিলেন বলিলেন শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে রাধা বাগ স্থানটী অতি মধুর বটে এইখানেই অনেকগুলি নৈষ্টিক ভক্ত আছেন আর এই খানে যে সুন্দর ইষ্ট স্ফূর্ত্তি বালক দর্শনে আপনাদের আনন্দ হইয়াছিল উহাও বিশেষ ভাগ্যের কথা শ্রীরাধারাণী কৃপা করিয়া এইরূপে প্রাকৃত বস্তুতেও করিয়া দেন; এবং অনেক মহাত্মা ভক্ত, কত ছলে কৃপাও করিয়া থাকেন। আমি বিজয় দাদার কাছেও শুনিয়াছি যে তিনি এক দিন এইখানে একটী অতি তেজস্বী ভক্ত দর্শন করেন তাঁহার উজ্জল মূর্ত্তিতে যেন বন ভূমি আলোকিত হয় তাহার সহিত বিজয় দাদার ২।১টী কৃষ্ণ কথা ও হইয়াছিল কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই ভক্তটী অন্তর্হিত। আর মনুষ্য মূর্ত্তি দেখেন না সেইখানে দেখিলেন একটী কল্প বৃক্ষ। নল কুবের যেমন যমলার্জ্জুন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন ভাগবতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ নিত্য, ধামস্থ সকল কল্প বৃক্ষই ভাগ্যবান ভক্ত বটেন। রাত্রী ১০টায় আমরা বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি বেলা ১১টার সময় যখন আমরা শ্রীযমুনায় স্নান করিয়া ফিরিতে ছিলাম তখন দেখিলাম টীকারির রাজার ঠাকুর মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। যাইয়া দেখিলাম অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ নব নীরদ শ্যাম তনু এইত বটে; শ্যাম সুন্দর নীল রেখ রুচি মণি নির্ম্মিত; শ্রীমতিকে দেখিলাম কিন্তু শ্বেত বর্ণা। আবার এই যুগল মূর্ত্তির পার্শ্বে পৃথক সিংহাসনে অন্য যুগল বিগ্রহ। শুনিলাম রাজা ও রাণীর পৃথক পৃথক সেবা। এখানে প্রহরে প্রহরে ভজন কীর্ত্তন হয়। একজন শ্রীধাম দ্বারকা বাসী, খর্ব্বাকৃতি গৌর বর্ণ ব্রাহ্মণ

শ্রীমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া জানুপরি উববেশন করিয়া প্রেমভরে গাহিতেছেন "আয়িরে মেরা নন্দ নন্দন মে পিয়ারে" সারঙ্গবাজিল উচ্চ সরু আওয়াজের সঙ্গে গায়কের কণ্ঠস্বর ঠিক মিলিয়া একসুর হইয়া গিয়াছে যেমন পঞ্চম স্বরে গান তেমনি মধুর ভাব। আমাদিগকে আর নড়িতে দিলনা গান সামাধা হইলে আমরা তাঁহার গানের প্রশংসা করিলাম তিনিও আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিলেন ও দীনতা করিয়া বলিলেন "ইয়্যা দরবারি ভজন, বাড়িয়া মিঠ্যা হাম্ কেয়্যা, জানে গরিব পরবার"। আমরা আরো দুটো কাঁচা মিঠে কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর প্রকাট্য বিবরণ।

অচিন্ত্য শক্তি লীলা-কল্লোল-বারিধি শ্রীকৃষ্ণের লীলা রহস্য কে বুঝিবে? ভক্তের ইচ্ছায় ভগবান নাচেন আবার ভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত নাচেন; নাচায় কিন্তু প্রেম। সেই প্রেমের দায়ে পড়িয়া অকার্য্য কুকার্য্য নিন্দা গ্লানি কিছুই মনে থাকেনা। *শ্রীল গোবিন্দ দেব শ্রীল মদন মোহন যখন প্রকট হইলেন তখন গোপী নাথ প্রকট হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এই সময়ে জনৈক মহা প্রেমিক জনৈক নিষ্কিঞ্চন গৌড়ীয় ভক্ত প্রাণ বঁধুকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া গৌড় দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুকে ছুটিয়াছেন তিনি যখন দুর্গম বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছুটিতে ছিলেন তখন ভাবিতে ছিলেন কোন রকমে একবার শ্রীমথুরায় পৌছিতে পারিলে হয় একবার শ্রীযুমনাতীরে পৌছিতে পারিলে, নিশ্চয়ই সেই গোপীমন চোরা আমার প্রাণ বল্লভকে কেলী কদম্বর মূলে দেখিতে পাইব বোধ হয় যাইয়াই দেখিব গোপ বেশ বেণুকর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হয়ে বেণু বাজাইতেছেন ভক্ত আকুল প্রাণে ছুটিয়াশ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিলেন কিন্তু কই তাঁহার মন চোরা কই?

বৃন্দাবনে যাইয়া চৌদিকে নেহারয়।
কৃষ্ণ অন্বেষণ করে দেখিতে না পায়॥ ভক্তমাল।

আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, যাঁহার স্মিত বদন চন্দ্রিমা দর্শন লালসায় ভক্ত চকোর পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন এখানে আসিয়া তাঁহার অভীষ্ট বস্তু না পাইয়া তখন যেন পাগলের পাগলামি বাড়িয়া

গেল একেবারে বাহ্য হারাইয়া ভক্ত ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন উৎকণ্ঠায় তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল—

ফুৎকার করয়ে ধারা বহে দুনয়নে।
দরশন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে॥ ভক্তমাল॥

থাকিয়া থাকিয়া কোথা হইতে মধুর বেণুধ্বনি আসিয়া ভক্তকে আরো উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে, তিনি তখন কৃষ্ণ হারা গোপীর ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি কুঞ্জের কুঞ্জে প্রাণ বঁধূকে খুঁজিতেছেন, আর লতা পুষ্পকে নিকুঞ্জ বিহারীর কথা সুধাইতেছেন, তাহারা মাথা নাড়িতেছে কিন্তু কোনউত্তর করিতেছে না দেখিয়া শেষে বিরহে কাতর হইয়া শ্রীরাস মণ্ডলে গড়াগড়ি পারিতে লাগিলেন—

প্রতিবনে বনে লতা কুঞ্জে কুঞ্জে ঢুঁড়ে।
বিরহে কাতর কভু ভূমিতলে পড়ে।

শেষে যেন কোন এক অনিন্দ সুন্দরী রত্নালঙ্কার ভূষিতা রমণী আসিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন শ্রীবংশী বটমূলে বংশী ধারী বেণু বাদন করিয়া থাকেন—

অমনি সেই বংশী বটমূলে যাইয়া ভক্ত অনাহারে অনিদ্রায় ধর্না দিয়া পড়িয়া রহিলেন সাক্ষাৎ দর্শন না পাইলে ছাড়িবেন না।

যমুনার তীরে বংশী বটের তলায়।
অনাহারে ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহয়॥ ভক্তমাল॥

ভগবান আর কত লুকোচুরী খেলিবেন, প্রেমাধীনকে এইবার ধরাদিতে হইল। ভক্ত চক্ষু চাহিয়া দেখেন শ্রীবংশী বটের নিকটে নবীন মেঘের বর্ণ কি দেখা যাইতেছে অইত আমার মনচোরা ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি যেন উঁকি মারিতেছে তখন আর কে দেখে? মনি হারা ফণি মনির সন্ধান পাইলে যেমন ছুটিয়া যায় ভক্ত সেইমত ছুটিয়া যাইয়া দুই বাহুতে প্রিয়তমকে একে বারে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন দরিদ্র বহু আরাধনার অমূল্য রত্ন চিন্তামনিধন পাইয়াছে, পাছে কেহ কাড়িয়া লয় তাই লুকাইবার জন্য গুপ্তস্থান খুঁজিতেছে।

হেন কালে শ্রীমদ বংশী বটের সমীপে।
দেখে নব ঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে॥

গোপীনাথ স্বয়ং আসি প্রতিমা রূপেতে।
দরশন দিল প্রিয় ভক্তের পীরিতে॥
চমকিয়া উঠি ভক্ত দ্রুত তর গিয়া।
উঠাইয়া লইল যে পাথালি করিয়া।
ছুটিয়া পালায় যথা তস্করের প্রায়।
রতন পাইয়া যেন বিঘ্ন আশঙ্কায়,
রাখিবার স্থান চাহি ইতি উতি ধায়।
মহানিধি কে যেন পাছে কাড়িলয়॥ ভক্তমাল॥

শ্রীযমুনার তীরে কেশীঘাটের নিকট ক্ষুদ্র কুটীর করিয়া ভক্ত গোপীনাথের সেবাপূজা আরম্ভ করিলেন স্বপ্রকাশ দৃপা করিয়া মহিমা বিস্তার, করিলেন কিছুকাল পরে জনৈক পশ্চিম দেশীয় ভাগ্যবান মহাজন আসিয়া শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। যাঁহার প্রেমে বাঁধা পড়িয়া গোপীনাথ প্রকট হইলেন সেই মহাপ্রেমিক ভক্তকে পাঠক কি চিনিতে পারিলেন? ইনিই সেই পরম সুধীর ভক্ত-মহারাজ শ্রীমধুপণ্ডিত। শ্রীযুক্তা জাহ্নবী গোস্বামিনীর মন্ত্র শিষ্য—

অতএব শ্রীমধু পণ্ডিত মহাশয়।
তাঁহার মহিমা গুণ কহনে না যায়॥

তাঁহার চরণে মতি রহুক আমার।
মো সম দুর্ভাগ্য আর, যত্তেকসভার। ভক্তমাল।

ক্রমশঃ

শ্রীবামাচরণ বসু।

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন প্রেমময় দাদার জন্মোৎসব উপলক্ষে স্মৃতি।

—:০:—

সাধিতে আপন কাজ এসেছিলে ভবে
যোগ-ভ্রষ্ট! ফিরে গেছ আপন আলয়ে।
উর দেব দীনবন্ধু! আজি উৎসবে
জাগাও আনন্দ আজি হৃদয়ে হৃদয়ে!
ছুটাও কীর্ত্তন মাঝে তেমনি তুফান!
দুর্ব্বল একণ্ঠে কর শকতি সঞ্চার!
নাচিয়া নাচাও ;—শুনি তব মুখে গান
স্থাবর জঙ্গম তৃপ্তি লভিবে আবার।
আমরি সে সৌম্য মূর্ত্তি দিব্যেন্দু সুন্দর!
কি যে ভাবে ডেকেছিলে ভাবময়ে তুমি।
সার্থক সাধনা তব, ধন্য যতিবর!
তোমারে ধরিয়া ক্রোড়ে ধন্যা জন্মভূমি।
তোমার অতুল কীর্ত্তি ঘোষিছে জগৎ
তোমার প্রাণের "ভক্তি" উঠিছে উজলি।
সাহিত্য সাধনা তব শাস্ত্র "ভাগবত"
ছুটাইছে ভক্ত হৃদে আনন্দ বিজলি॥
দেখেছে জগৎ তব প্রেম-উন্মাদনা।
গৌরাঙ্গ বলিতে তব নয়নেতে নীর!
এস আজি হে সাধক! হে উদার মনা!
বারেক দেখাও মূর্ত্তি প্রশান্ত গম্ভীর।
তেমনি দাঁড়াও দেব দুলায়ে শরীর।
শুনাও সিদ্ধান্ত তত্ত্ব—সরল প্রাঞ্জল!
স্মরি তব পুণ্য পূত চরিত্র গভীর,
শত-কোটী জীব প্রাণে পাবে নব বল!

মনে পড়ে আজি দাদা! অতীতের স্মৃতি,
—সেই ভাষা ভালবাসা, হাসিমাখা আঁখি,
ধন্য আমি—পাপী, কিন্তু, পেয়েছিনু প্রীতি
আজো তাই তব নামে নাচে প্রাণ পাখী॥
আজি গো জনম তব—আবির্ভাব তিথি,
এস এ উৎসবে দাদা! বরণ্যে আমার!
অযোগ্য অধম ভাই আজি গো অতিথি,
আশীষ কর এ দীন দীনেশে তোমার॥

শ্রী—

প্রাচীন বৈষ্ণব স্ত্রীকবি।

(শ্রীমাধবী দেবী)

—:০:—

গৌরভক্ত মাত্রেই শিখি মাহাতীর ভগ্নী শ্রীমতী মাধবী দেবীর নাম শুনিয়া থাকিবেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছোট হরিদাস বর্জ্জন সংবাদে মাধবী দেবীর নাম বৈষ্ণবগ্রন্থে সুপরিচিত। প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস প্রভুর নিমিত্ত মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করার অপরাধে প্রভু কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া শোক ও দুঃখে প্রয়াগ বাসে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাসের অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্ত সকল ভক্তগণে একত্র হইয়া প্রভুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রভু তাহা শুনেন নাই। পুরী গোস্বামী এই জন্য প্রভুর বিরক্তি ভাজন হইয়াছিলেন; ছোট হরিদাস প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন এই অপরাধে বর্জ্জিত হইয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। প্রভুর নিকটে স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ ছোট হরিদাসের অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিয়াছিলেনঃ—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে, প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ (চরিতামৃত)

এই মাধবা দেবী বৃদ্ধ বৈষ্ণবী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত। তিনি বিদুষী, সুপণ্ডিতা এবং পদকর্ত্তী ছিলেন। প্রভুর প্রধান অন্তরঙ্গ সাড়ে তিন জন ভক্তের মধ্যে মাধবা দেবী অর্দ্ধেক বলিয়া পরিগণিত।

শিখি মাহাতীর ভগ্নি শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী তেঁহো পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যবে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ।
শিখি মাহাতী তার ভগিনী অর্দ্ধ॥ (চরিতামৃত)

শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিত আছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীশিখি মাহাতী ও মাধবা দেবী শ্রীরাধিকার দাসী ছিলেন তাঁহাদের আখ্যা ছিল রাগ-লেখা ও কলা-কেলী। তাঁহারা ব্রজ সুন্দরি শ্রীরাধিকার শয্যাদি রচনা করিতেন তাঁহারা উভয়ে শ্রীরাধিকার অতি প্রিয় পরিচারিকা ছিলেন।

রাগ লেখা কলা কেলী রাধা দাস্যৌ পুরাস্থিতে।
তেজ্জেয়ে শিখি মাহাতী তৎস্বসা মাধবীদেবী॥

উৎকল দেশে ইঁহদের নিবাস। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে শিখি মাহাতী লিখনাধিকারী ছিলেন। উৎকলের মধ্যে তিনি পরম বৈষ্ণব এবং তাহার ভগিনী মাধবী দেবী পরমা বৈষ্ণবী। শ্রীগৌরাঙ্গ যে নিগূঢ় ব্রজের রস কলির জীবকে প্রদান করেন, তাহার সম্যক রূপে আস্বাদনের অধিকারী সাড়ে তিন জন। সাড়ে তিন জন বলার তাৎপর্য্য মাধবা দেবী স্ত্রীলোক। শিখি মাহাতীর আর এক ভাই ছিল তাহার নাম মুরারী মাহাতি। মাধবা দেবীকে লইয়া তাহাদিগকে লোকে তিন ভাই বলিত। তাহার উদ্দেশ্য মাধবা পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, পুরুষের ন্যায় ভজন সাধন করিতেন। সর্ব্ব প্রথমে শিখি ও মুরারী মাহান্তিকে নীলাচলে প্রভুর সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন।

মাধবী দাসী সাহস করিয়া প্রভুর নিকট যাইতে পারিতেন না। তিনি দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিতেন।

মাধবী দাসী উড়িয়া ও বঙ্গভাষা উভয়ই জানিতেন। উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীকবি তৎকালে অতি বিরল ছিল। মাধবী দাসী স্বচক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাঙ্গালা পদগুলি রসজ্ঞ গৌরভক্তবৃন্দের বড় আদরণীয়। *প্রাচীন স্ত্রীকবি বলিয়া* মাধবী দাসীর পদাবলীর বিশেষত্ব আছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেদিন শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করেন এবং যাহার জন্য প্রভু ক্রোধাবেশে অগ্রে নীলাচলে গমন করেন এই সময়কার ঘটনা লইয়া শ্রীমাধবী দাসী যে একটী সুন্দর পদ রচনা করেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কলহে করিয়া ছলা　　আগে পঁহু চলি গেলা
　　ভেটিবারে নীলাচল রায়।
চাতক ভকত গণ　　হৈয়া সকরুণ মন
　　পদচিহ্ন অনুসারে যাঁয়॥
　　নিতাই বিরহ অনলে ভেল ধন্ধ।
আঠার নালা হইতে　　কাঁদিতে কাঁদিতে পথে
　　যায় নিতাই অবধৌত চন্দ্র॥
সিংহ দুয়ারে গিয়া　　মরমে বেদনা পাইয়া
　　দাঁড়াইলেন নিত্যানন্দ রায়।
হরে কৃষ্ণ হরি বলে　　দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে
　　নীলাচল বাসীরে সুধায়॥
জাম্বু নদ হেম জিনি　　গৌরাঙ্গ চরণ খানি
　　অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেম ভরে গর গর　　আঁখি যুগ ঝর ঝর
　　হরি হরি বোল বলি যায়॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ　　ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ
　　এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
শ্রীমাধবী দাসী কয়　　অপরূপ গোরা রায়
　　ভক্ত গৃহে করিল প্রবেশ॥

আবার স্থানান্তরে শ্রীমাধবী দাসীর আর একটী পদ দেখা যায় যথাঃ—

নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুন্দ গদাধরে।
দেখিলেন গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘরে॥
প্রতপ্ত কাঞ্চন কান্তি, অরুণ বসন।
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন॥
আজানু-লম্বিত-ভুজ চন্দনে শোভিত।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ তিলক মুণ্ডিত॥
গোপীনাথ, বাণীনাথ, সার্ব্বভৌম, কাশী।
গোরা রূপ দেখে সব নীলাচল বাসী॥
দক্ষিণে বসিল নিতাই বামে গদাধর।
মিলিলেন গোরাচাঁদের যত অনুচর॥
যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হইলা নিজ কর্ম্ম দোষে॥

ক্রমশঃ—

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

পাগলের প্রলাপ।

—:০:—

দেখ ভাই! সংসারে সকলেই কৃষ্ণের জীব। তাঁহার নিকট সকলেই সমান। অতি ক্ষুদ্রতম কীট-পতঙ্গও যেই,—অতি বৃহত্তম অশ্ব মাতঙ্গও সেই। কানন বাসী কড়ার কাঙ্গালও যেই,—সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরও সেই। অতিশয় কুলীন ব্রাহ্মণও যেই,—অতিশয় অকুলীন চণ্ডালও সেই। ভগবানের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জগতের যাবতীয় জীবেই তুল্য। অর্থাৎ সমান। তবে তুমি আমি কেন ছোট-বড় উত্তম-অধম ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া, ভগবানের সৃষ্ট জীবের প্রতি দৃষ্টি বৈষম্য রাখিয়া অযথা অপরাধী হই? দেখ ভাই! আমিও কৃষ্ণের,—তুমিও কৃষ্ণের।—আমিও যেমন মল, মূল ক্লেদ পরিপূর্ণ রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া এই মর জগতে মরিতে আসিয়াছি;—তুমিও

তেমনি আমার মত মল, মূত্র, ক্লেদ পরিপূর্ণ রক্ত মাংসের শরীর লইয়া এই মর-জগতে মরিতে আসিয়াছ। আমিও মরিব,—তুমিও মরিবে। তবে আর পরস্পর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া, আত্মাটাকে নরকাপেক্ষাও জঘণ্য করিয়া লইতেছি কেন? সকলেই তো কৃষ্ণের জীব, সকলেই তো তাঁহারই স্নেহানুগ্রহের পাত্র। সকলেই তো তাঁহার কৃপামৃত লাভে ধন্য। আমরা সকলেই তো তাঁহার শ্রীচরণের দাস। তাঁহার মধুরানন্দময় ভজন পথের পথিক!

মাত্র কয়েকটা দিন এই জঞ্জাল জড়িত অনিত্য সংসারের বৃথা খাটুনী খাটিয়া আমারা সকলেই যার তার মতে চলিয়া যাইব!! তবে আর দুই দিনের জন্য পরস্পরের মধ্যে এই মনো মালিন্যের প্রগাঢ় কালিমা রঞ্জিত হিংসা যবনিকা আলম্বিত করিয়া রাখিয়াছি কেন?

তুমি যদি বল যে, তবে কি মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট নাই? হাঁ! আছে! মানব জাতির এই শ্রেষ্ঠতা, অপকৃষ্ঠতা, বাহ্য জগতের ধন-জন লইয়া নহে, বল বিক্রম লইয়া নহে, উত্তম অধম লইয়া নহে,—অথবা সুরূপ কুরূপ লইয়া নহে,—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল লইয়াও নহে,—একমাত্র হৃদয় লইয়া।

অর্থাৎ যাঁহার হৃদয় সাত্বিক ভাবাপন্ন;—আত্মাভিমানের মাদকতায় বিকৃত নহে,—স্বার্থ পরতার বাতাস লাগিয়া শুষ্ক অথবা সংকীর্ণ হয় নাই,—পরদুঃখ কাতর,—দৈন্য বিনয়ের আকর; দয়ার অমৃত প্লাবনে সর্ব্বদা দ্রবীভূত সম, দম, তিতীক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার,—এবং ঈশ্বরের ভজনে সাধনে নিরত,—তিনিই শ্রেষ্ঠ।

পক্ষান্তরে,—যাঁহার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন,—কাম কলুষিত,—স্বার্থ পরতায় নিতান্ত সঙ্কোচিত,—দুষ্প্রবৃত্তিরূপ প্রেত পিশাচের ক্রীড়া ক্ষেত্র,—দয়া শূন্য-প্রস্তরবৎ—অভিমানে পূর্ণ, হিংসা বিদ্বেষে সমাচ্ছন্ন, এবং ধর্ম্ম ও প্রেম শূন্য মরুভূমি, তিনিই অপকৃষ্ট!

সৌভাগ্য বশতঃ শ্রেষ্ঠ হইয়া,—আপন শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করা বড়ই সঙ্কট। একজন শ্রেষ্ঠ হইয়া যদি মনে করেন,—যে আমি তো শ্রেষ্ঠ;—আর অপকৃষ্টকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তবে তিনি আপন শ্রেষ্ঠত্বকে হারাইয়া অপকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইলেন, সন্দেহ নাই।

দেখো ভাই! এই পাপ্য জগতের মানুষ গুলি "মরা"। মরা বলিতেছি কেন? যে হেতুক, সকলকেই একদিন না এক দিন মরিতেই হইবে! জীবের মৃত্যু যখন অনিবার্য্য, তখন আর মরাকে মরা বলিতে দোষ কি? আমি একমরা, দিন রাত বসিয়া কেবল মরা মানুষের নড়া চড়া দেখিতেছি! এই মর জগতে কেবল মরার হাট, মরার বাজার, মরার মেলা, মরার খেলা!

একটুকু চিন্তা করিয়া দেখ তো ভাই! সংসারের মানুষগুলি মরা না? সকলেই তো মরা! আমি বলি, যদি সকলেই মরা তবে আর মরায় মরায় রাত্ দিন এত কাটা কাটি খুনাখুনি দিয়া আবশ্যক কি? মরায় মরায় এত বাদ-বিসম্বাদ দিয়া প্রয়োজন কি? সকল গুলি মরা দু'টা দিন শান্তিতে থাকিলে ভাল হয় না কি?

মরার কি এত অহঙ্কারাভিমান সাজে? শ্মশানের ছাইয়ের কি এত আস্পর্দ্ধা শোভা পায়? কৃমি কীটের খাদ্যের কি এত জাঁক্ জমক ভাল বোধ হয়? সামান্য স্বার্থের জন্য, ধর্ম্ম ডুবাইয়া মরায় মরায় এত কাড়া কাড়ি, মারা মারি কি শোভনীয়? আমি তো ভাই! এই সব কাণ্ড কারখানা দেখিয়া অবাক্!! দেখ ভাই! হওনা কেন তুমি মহাকুলীন, হওনা কেন তুমি দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, হও না কেন তুমি ধনী, মানী, মহারাজ চক্রবর্ত্তী, কিন্তু একটুকু ভাবিয়া দেখ, বাস্তবিক তুমি মরা!!

যদি কুলের গৌরব, বিদ্যার গৌরব, ধনের গৌরব, কি মানের গৌরব, বিষয় গৌরব প্রভৃতি সকল প্রকার গৌরবের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও,—প্রকৃত মনুষ্যত্বকে আপন আয়ত্বে আনিয়া বিশ্বপতি ভগবানের ভজন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা কর,—তবে খুব নিবিষ্ট চিত্তে নিজে নিজে বুঝিয়া লও যে, আমি "মরা"।

তুমি রাজকীয় কার্য্য কারক। বেশ কথা। ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া সত্য সংরক্ষা করিয়া যথা সাধ্য আপনার কর্ত্তব্য পালন কর। তাহা করিবে না, বরং এই ছিটা ফেঁটা রাজশক্তির বলে জন সাধারণের উপর পাশবিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবে? তোমার উপর যে বিন্দুমাত্র রাজশক্তি অর্পিত হইয়াছে, তাহা পরপীড়নের জন্য নাকি? তুমি একটা মরা না? তবে আর সামান্য স্বার্থ লোভে সত্যকে ছলানুবিদ্ধ করিতেছ যে?

তোমাকে দেখিয়া লোকে ভয় করে কেন? তোমার সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহিতে সাহস পায় না কেন? না,—তুমি বিষয় মদের মাতাল— অভিমান অহঙ্কারে তোমার গ্রীবা স্ফীত দেখিয়া, সর্ব্ব সাধারণে তোমায় মানুষ বলিয়া মানিয়া লইতে চায় না। তুমি যেন রাজশক্তির প্রভাবে মানব সমাজে আর এক রকমের জীব! ভাই মরামানুষ! এই মরাটার কথা মানিয়া একবার ন্যায়ের দিকে আইস। পরিনামের সম্বল হরি নামে মন দেও। আর তাঁর কৃপা প্রদত্ত রাজ শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া মরিয়া যাও। তুমি যে রূপের বড়াই করিয়া মরিতেছ,—তুমি একজন রূপবান্, তোমার রূপের তাণ্ডবেই তুমি অস্থির কিন্তু এক্‌টুকু ভাবিয়া দেখতো তোমার এই রূপের বাহার কয় দিন?

তোমার রূপের ঘরে যে কালাগুণ লাগিয়াই আছে?—ধীরে ধীরে তোমার অজ্ঞাতসারে পুড়িয়া ছাই করিয়া লইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার? দেখিতে দেখিতে ভস্মাতিভস্ম করিয়া দিবে না?

রূপবান্! একবার শ্মশানের দিকে চাও। দেখো, কত কত রূপের ঠাঁলি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে!!

আর যদি কুরূপ বলিয়া তুমি মনে মনে দুঃখ ভাব,—তবে ইহাও তোমার অপরাধ। সুরূপ কুরূপ সামান্য দৃষ্টিতে বাহিরে,—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে;—ভিতরে। জগতে সুরূপ কুরূপ কি কিছু আছে? সকল রূপ সেই এক রূপেরই অনুরূপ।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য

[ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলের ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণের অনুমোদিত]

১৩২০ সাল ৪২৮ চৈতন্যাব্দের

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

—:০:—

বৈশাখ।

শ্রীরামনবমী	২রা মঙ্গলবার।	একাদশী ...	৪ঠা বৃহস্পতিবার।
		একাদশী ...	১৪শে শুক্রবার।
		অক্ষয়তৃতীয়া (চন্দন যাত্রা)	২৬শে শুক্রবার।

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী ... ২রা শুক্রবার।
নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ৫ই সোমবার।
(পূর্ণিমা) পুষ্প দোলযাত্রা ৬ই মঙ্গলবার।
একাদশী ... ১৭ই শনিবার।

আষাঢ়।

একাদশী ... ১লা রবিবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। ৪ঠা বুধবার।
একাদশী ... ১৬ই সোমবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ২২শে রবিবার।
" " পুনর্যাত্রা ২৯শে রবিবার।
শয়নৈকাদশী (চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ) ৩০শে সোমবার।

শ্রাবণ।

পূর্ণিমা ... ২রা শুক্রবার।
একাদশী ... ১৩ই মঙ্গলবার।
একাদশী (শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল লীলা আরম্ভ ২৭শে মঙ্গলবার।
শ্রাবণী পূর্ণিমা (হিন্দোল লীলা শেষ) ৩১শে শনিবার।

ভাদ্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত ৯ই সোমবার।
একাদশী ... ১২ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত ... ২৩শে সোমবার।
পার্শ্বৈকাদশী উপবাস (বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ) ২৬শে বৃহস্পতিবার।
বামন দ্বাদশী ... ২৭শে শুক্রবার।

আশ্বিন।

একাদশী ... ১০ই শুক্রবার।
একাদশী ... ২৪শে শুক্রবার।
পূর্ণিমা (শরৎ রাসযাত্রা) ২৮শে মঙ্গলবার।

কার্ত্তিক।

একাদশী ... ৯ই রবিবার।
গোবর্দ্ধনযাত্রা, অন্নকূট, দ্যূতপ্রতিপদ, বলিরাজ পূজা ... ১৩ই বৃহস্পতিবার।
কাত্যায়নী ব্রত ... ১৯শে বুধবার।
গোপাষ্টমী ... ২০শে বৃহস্পতিবার।
উত্থানৈকাদশী (চাতুর্ম্মাস্যব্রত শেষ) (ভীষ্মপঞ্চক ২৩শে রবিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথ যাত্রা ২৪শে সোমবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ২৭শে বৃহস্পতিবার।

অগ্রহায়ণ।

একাদশী ... ৮ই সোমবার।
একাদশী ... ২৩শে মঙ্গলবার।

পৌষ।

একাদশী ... ৮ই মঙ্গলবার।
একাদশী ... ২৪শে বৃহস্পতিবার।

মাঘ।

একাদশী ... ৯ই বৃহস্পতিবার।
বসন্ত পঞ্চমী (শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন) ১৮ই শনিবার।
মাকরী সপ্তমী (শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব ... ২০শে সোমবার।

ভৈমী একাদশী ... ২৪শে শুক্রবার।
(ত্রয়োদশী) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব। ... ২৬শে রবিবার।

ফাল্গুন।

একাদশী ... ৮ই শুক্রবার।
শিবরাত্রি ব্রত ... ১১ই রবিবার।
একাদশী ... ২৪শে সোমবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমার ব্রত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব।
৪২৯ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ ... ২৮শে শুক্রবার।

চৈত্র।

একাদশী ... ৮ই শুক্রবার।
শ্রীরামনবমী ... ২২শে রবিবার।
একাদশী ... ২৪শে মঙ্গলবার।

বৈষ্ণব লক্ষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

"চারি সম্প্রদায় চরি মহান্ত স্বতন্ত্র।
শিষ্য অনুশিষ্য ক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র॥"

অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের চারিজন মহান্ত হইতে স্ব স্ব গুরু পরম্পরায় বহু শিষ্য ও প্রশিষ্য হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণ উপদেষ্টা, কৃষ্ণ মন্ত্র দাতা ও জগত্রাতা।

উপরোক্ত চারি সম্প্রদায়কে আশ্রয় করতঃ ধন্য কলি যুগে গৌড়েশ্বর নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। গৌড়ে অবতীর্ণ কলিকলুষনাশন ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ইঁহাদের উপাস্য দেবতা অর্থাৎ ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ মন্ত্রে দীক্ষিত। ইঁহারা আবার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা :—

১। রামানুজ গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী। ইঁহারা শ্রীরাম ও গৌরাঙ্গ উভয় মন্ত্রে দীক্ষিত। পাত্র মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি।

২। মাধব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী। ইঁহারা কৈশোর গোপাল ও গৌরগোপাল উভয় মন্ত্রে দীক্ষিত। পাত্র শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি।

৩। বিষ্ণুস্বামী গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী। ইহাঁরা বালগোপাল ও গৌর গোপাল উভয় মন্ত্রে দীক্ষিত। পাত্র করমা বাই প্রভৃতি।

৪। নিম্বার্ক গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী। ইহাঁরা গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত। পাত্র নৃসিংহানন্দ ও প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভৃতি।

৫। শুদ্ধ গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী। ইহাঁরা নৃসিংহাদি ও গৌর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত। পাত্র—শ্রীবাস ও শিবানন্দ প্রভৃতি।

বৈষ্ণবগণ আবার উদাসীন ও গৃহী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে "সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, সেই "সর্ব্বধর্ম্ম" বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই হইতেছে।

যে সকল মহাত্মা বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে "উদাসীন বৈষ্ণব'' বলা যায়, আর যাঁহারা বর্ণাশ্রম ত্যাগ না করিয়া সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করেন তাঁহাদিগকে গৃহী বৈষ্ণব কহে। গৃহী বৈষ্ণবগণ সংপথে থাকিয়া আপনাপন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি যথা— সংসার প্রতিপালন, অতিথি ও বৈষ্ণব সেবা, দেব-দ্বিজানুভক্ত হওয়া, তীর্থাদি গমন ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ, শ্রবণ, শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন যাঁহারা এইরূপ শাস্ত্রানুমোদিত নিঃশব্দে চলিয়া থাকেন তাঁহারা ঘোর সংসারী হইয়াও সংসারে অনাসক্ত থাকেন— কর্ত্তব্য বোধে যাবতীয় কর্ম্ম করেন কিন্তু তাঁহাদের ঐকান্তিকি ভক্তি সর্ব্বদা শ্রীভগবানের চরণ যুগলে ন্যস্ত থাকায় তাঁহারা সংসারী হইয়াও করুণাসিন্ধু শ্রীভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হন। দ্বিজবর কূর্ম্ম, ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিতেছেন—

"কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে।
সহিতে না পারোঁ দুঃখ বিষয় তরঙ্গে॥
"প্রভু কহে ঐছে বাত কভুনা কহিবা।
গৃহে রহি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম লৈবা॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

কভু না বাঁধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবগণ গৃহে বসিয়া ভবদ্ভক্তিলাভ করিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্যই করুণাবতার নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদেশে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি মহা মহা ভাগবতগণ ভোগ বিলাসাঙ্কে শায়িত থাকিয়াও ভগবৎ প্রেমে বিভোর থাকিতেন। রাজর্ষি জনক ও প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের আচরণও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৃহাশ্রমী হইলেও শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক আমার ছাড়িয়া তাঁহার হইয়া যদি পরিচর্য্যাদি কার্য্যে উদ্যুক্ত ও ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে থাকা যায় তাহা হইলে, বিষয়ে সংলিপ্ত থাকিয়াও ভগবৎ ভক্তি লাভের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত ঘটিতে পারেনা; কারণ গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবগণ যদিও বহির্ম্মুখ লোকের ন্যায় সংসার ধর্ম্ম করিয়া থাকেন তত্রাচ বহির্ম্মুখ জনের ন্যায় নিজের সুখবুদ্ধি করিয়া কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া পড়েন না; তাহারা শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ করিয়া আপন অভিমান ভুলিয়া তাহার দাস ভাবিয়া ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তবে, গৃহাশ্রমী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরিণীতা ভার্য্যার বৈধ সঙ্গ ব্যতিরেকে অন্যস্ত্রী সঙ্গ করিতে পারেন না কারণ ইহা শাস্ত্র বিগর্হিত।

উদাসীন বৈষ্ণবগণের স্ত্রী সঙ্গত দূরের কথা স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্তও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

"আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই কঠোর ব্রত স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করা ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"মহৎ সেবাং দ্বারমাহু বিমুক্তে
স্তমো দ্বারং যোষিতাং সঙ্গি সঙ্গং॥" (শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থাৎ মহৎ সেবাই ভগবৎপ্রাপ্তির এবং যোষিৎ (কামস্ত্রী) সঙ্গই নরক প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। যথাঃ—

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ
যোষিৎ সঙ্গং যথা পুংসো তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"

অর্থাৎ—যোষিৎসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ এই দুইটী যেরূপ পুরুষের মোহ এবং বন্ধনের কারণ হয় অন্য কোন প্রসঙ্গে সেরূপ হয় না। একবিংশাধ্যায়ে আরও উক্ত আছে যে,—

"সত্যং শৌচং দয়ামৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা
সমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং॥
তেম্ব শান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাম স্ব সাধুষু
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিত ক্রীড়ামৃগেষু॥"

অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, সমঃ, দমঃ এবং ভগ এইসকল মহৎগুণ অসৎসঙ্গদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের বুদ্ধি স্থিরতা নাই সেইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট মূঢ় অসাধুর সঙ্গ করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ ইহাতে পতন অনিবার্য্য।

"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গ এক অসাধু কৃষ্ণ ভক্ত আর॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

অতএব দেখ, কামস্ত্রী ও কৃষ্ণ ভক্তি বিহীন মূঢ় ব্যক্তি দিগের সঙ্গ কত দোষার্হ। শ্রীমদ্ভাগবতে একাবিংশাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে,

"বরং হুত বহজালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরি চিন্তা বিমুখ জন সংবাস 'বৈশনঃ" —

প্রজ্বলিত অগ্নি শিখাযুক্ত পঞ্জর মধ্যেও থাকা ভাল তথাপি যেন শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা বিমুখ জনের সহবাস জনিত পীড়া না হয়। এইজন্যই বৈষ্ণব চূড়ামণিরা সতর্কতার সহিত এই দুইটী কুসঙ্গ হইতে দূরে বাস করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

—:০:—

হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি অপেক্ষা মনুষ্য ক্ষুদ্র জীব। জলে স্থলে এমন অনেক জীব আছে যাহাদের অপেক্ষা মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, কিন্তু মনুষ্য জীব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, বিচার, বুদ্ধি, চিন্তা লইয়াই মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, যদি ইহাদের বিচার শক্তি বুদ্ধি শক্তি ও চিন্তা শক্তি প্রবল না হইত তাহা হইলে জীব রাজ্যে ইহারা প্রভুত্ব ও আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত না। এই শক্তি সমূহের প্রভাবে ইহারা ক্ষুদ্র হইয়া বৃহতের উপর দুর্ব্বল হইয়া সবলের উপর প্রবল প্রতাপের সহিত আধিপত্য করিয়া আসিতেছে ও জগতের অদ্ভুত রহস্য ভেদ করিয়া আমি শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া জগতে পরিচয় দিতেছে। এই বিশ্ব অদ্ভুত রহস্যে পরিপূর্ণ বুদ্ধি জীবি মনুষ্য ভিন্ন সে রহস্য ভেদ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। বুদ্ধির জন্যই মনুষ্য ক্ষমতাশালী। যে মানুষ্যের যত বুদ্ধি তাহারই ক্ষমতা ও প্রতাপ তত অধিক। জগতে যেমন অসংখ্য মনুষ্যও রহিয়াছে, কিন্তু সকল মনুষ্য সমান নয়; কেহ উৎকৃষ্ট কেহ বা নিকৃষ্ট, কেহ রক্ষিত কেহ বা রক্ষা কর্ত্তা, কেহ দম্য কেহ বা দমন কর্ত্তা এইরূপ একজন নিজ বিচার, বুদ্ধি, চিন্তা শক্তির প্রভাবে অপরের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। ফল কথা বুদ্ধিই শক্তি। বুদ্ধি অনুসারে মানুষ আপনাকে চিনিতেছে জগৎ চিনিতেছে এবং সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ব কার্য্যের নিয়ন্তা অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতিকে চিনিতেছে। বুদ্ধি বিকাশের সহিত মানুষ কি জানি কি খুঁজিয়া বেড়ায়। চিরদিনই খুঁজিয়া বেড়ায় ইহার পূর্ব্বে খুঁজিয়াছিল আজ খুঁজিতেছে এবং ইহার পরেও খুজিবে। এ অনুসন্ধানের নিবৃত্তি নাই যতদিন মানুষ থাকিবে, বুদ্ধি থাকিবে এবং জগৎ থাকিবে ততদিন এ অনুসন্ধান চলিবে। অনুসন্ধান করাই যে মানুষের স্বভাব। যাহা জানেনা তাহা জানাই যেন মানুষের উদ্দেশ্য। তাই মানুষ জিজ্ঞাসা করে "আমিকে" "জগৎ কি" কি প্রকারে আমি হইলাম কোথা হইতে এই শৈল সাগর, নিশাকর, দিবাকর-

মণ্ডিত জগৎ আসিল। এ প্রশ্ন অতি প্রাচীন। কতবার কত দেশে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর্য্যঋষিগণ এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমরা করিতেছি, আমাদের পরে মহা প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। এ প্রশ্ন যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তখনই ইহার উত্তর পাওয়া গিয়াছে এবং যখন হইবে তখনও পাওয়া যাইবে। উত্তরের অভাব নাই, কত ভাবের কত উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহার ঠিক নাই, কিন্তু যে উত্তর আর্য্যঋষিগণ দিয়াছেন তাহাই প্রথম ও শেষ। তাঁহারা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহা অপেক্ষা নূতন কিছু আবিষ্কার হইতে পারে না। পারলৌকিক বিষয়ের মীমাংসা দেবতারাই করিতে পারেন আমরা দুর্ব্বল মানব আমাদের চেষ্টা কেবল দেবতার ভাষার প্রকাশ করা। সৃষ্টি ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যতই আলোচনা হউক না কেন, বিজ্ঞান যাহাই কিছু আপন ভাষায় ব্যক্ত করুকনা কেন ঋষি চিন্তাই অবশেষে সকলের অবলম্বন হইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদিকালে যখন পৃথিবীর প্রথম স্তর নির্ম্মিত হয় তখন পৃথিবীর উত্তাপ অধিক ছিল তজ্জন্য জগৎ জীব শূন্য ছিল। বাষ্পীয় পদার্থে জগৎ মগ্ন ছিল। জগৎ অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল এ সত্য বহু পূর্ব্বে বৈদিক যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ বলেনঃ—

"তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।"

১০।১২।১৩

অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। এ সম্বন্ধে ভগবান মনুও বলেনঃ—

"আসীদিদন্তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

অর্থাৎ প্রলয় সময়ে এই জগৎ তমোময়ী প্রকৃতিতে লীন, প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ জ্ঞানের, অতীত এবং সর্ব্বতোভাবে প্রসুপ্তাবস্থায় ছিল। ইহা হইল স্মৃতি ও শ্রুতির ভাষা। তার পর বিজ্ঞনাচার্য্য কান্ট বলেন যে, আদিতে সৌর জগতের সমস্ত স্থান কেবল আবর্ত্তমান বিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত বাষ্পময় পদার্থ রাশিতে পরিপূর্ণ ছিল। সার উইলিয়ম হারসেল বলেন যে, জ্বলন্ত নীহারিকা রাশি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত। লাপ্লাস বলেন যে, আকাশে এখনও যে গ্রহ

উপগ্রহ সকল অবস্থিত তাহা একসময় কেবল মাত্র জলন্ত বাষ্পরাশির দ্বারা পূর্ণ ছিল। এইরূপ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আদিতে কিছুই ছিলনা, ছিল কেবল মাত্র অন্ধকার। এ অন্ধকার বেদে প্রথম বর্ণিত হইয়াছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানবিদগণ আদিতে তমসাচ্ছন্ন জগৎ ছিল ইহা একপ্রকার স্বীকার করেন বাষ্প নিহারিকা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশস্থ প্রদীপ বাষ্পরাশি নীহারিকা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে অসংখ্য নক্ষত্র নিচয় সৃষ্টি, চন্দ্র, পৃথিব্যাদি এই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আদিতে সৃষ্টি পৃথিবী এক ছিল। পৃথিবী উত্তাপ যখন হ্রাস হইল তখন শূন্যস্থ ভাসমান জলীয় বাষ্প জমিয়া উত্তপ্ত জলাকার পৃথিবীতে পতিত হইল। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বারি পতিত হইবামাত্র উহা আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে শূন্যে উঠিয়া শীতল অংশের সংস্পর্শে শীতল হইয়া পুনরায় বারিরূপে ধরা অঙ্ক নিপতিত হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বাষ্পের পরিবর্ত্তনে পৃথিবীময় জলরাশি পরিব্যপ্ত হইল। ইহা হইল আধুনিক বিজ্ঞানের কথা। শাস্ত্র এক না বলিয়া বলিলেন :—

সলিলং সর্ব্বমা ইদং।

এবং বাল্মিকী বলিলেন প্রথমে সমুদয় জলময় ছিল, তাহাতেই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়।

"সর্ব্বং সলিলামবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা।" রামায়ণ।

উপনিষদ কর্ত্তা বলিলেন।

"আপোবাইদমগ্রে সলিল্ মাসীৎ।"

তৈত্তিরীয় সংহীতা।

অর্থাৎ এই জগৎ প্রথমে জলময় ছিল। এইরূপে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথমে জগৎ বাষ্পময় তার পর জলময় ছিল এবং ইহা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান উভয়েই অঙ্গিকার করেন বাষ্পস্তরূপ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান ক্ষান্ত হইয়াছে ইহার আগে কি ছিল, এ অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকগণ রত না হইয়া সেরূপ জড় জগতের চরম সীমায় উঠিয়া মিমাংসা শেষ করিয়াছেন কিন্তু সর্ব্বদর্শী আর্য্য-ঋষিগণ আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য ভেদ করিয়া বলিয়াছেন যে সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্য গর্ভ বিদ্যমান ছিলেন :—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।"

ঋগ্বেদ ১০।১২১।১।

তাঁহাকে মনুষ্যগণ বুঝিতে পারে না ; তিনি মনুষ্য বুদ্ধির সীমার অতিত কারণ মানুষের অন্তঃকরণ অন্য প্রকার ও তাহাদের বুদ্ধির কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন। তজ্জন্য শাস্ত্রে বলেন :—

"ন তং বিদাথ যইমা জজা নান্যদ্যুষ্মাকমংতরং বভুব।

নীহারেণ প্রাবৃতা জল্পা চাসুতৃপ উকৃথশাসশ্চরংতি ॥"

ঋগ্বেদ ১০।৮২।৭।

সত্য সত্যই মনুষ্যগণ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার নানা প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। তাঁহার মহিমা তাঁহার রহস্য ঋষিগণ বিদিত ছিলেন এবং ঋষিগণ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্র বলেন হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতিময়। তিনি শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃজন করতে অভিলাষী হইয়া চিন্তা পূর্ব্বক প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ জলে নিজ তেজোময় বীজ প্রদান করিলেন। ঐ বীজ হইতে কনকময় বস্তু সাদৃশ্য সুন্দর ও সূর্য্য সদৃশ প্রভাশীল একটী অণ্ড হইল। ঐ অণ্ড হইতে সকল লোকের জনক ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভগবান মনু বলেন যিনি সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর একমাত্র কারণ, ইন্দ্রিয়াতীত, জরামরণ পরিশূন্য, সৎ ও অসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য, তিনি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগতে ব্রহ্মা নামে খ্যাতঃ—

'যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদ সদাত্মকম্।

তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষোলোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে ॥"

মণু ১।১১।

এই ব্রহ্মা, নারায়ণ, প্রজাপতি, পুরুষ, বাসুদেব প্রভৃতি অসংখ্য নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন। যে নামেই অভিহিত হউননা কেন তিনিই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁহা হইতে সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার পরিচয় নিম্নলিখিত বচন হইতে পাওয়া যাইবে। শাস্ত্রে বলেন প্রজা সিসৃক্ষু ভগবান সর্ব্ব প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন। নরের সুনু বলিয়া জলের নাম নার

হইয়াছে। প্রথমে ঐ নার বা জল ভগবানের অয়ন বা প্রবেশ স্থান হইয়াছিল বলিয়া তিনি জগতে নারায়ণ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। যথাঃ—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত॥"

মনু ১।১০।

অর্থাৎ নর নামধারী ঈশ্বরের দেহ হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহা নারা শব্দে প্রসিদ্ধ এবং প্রলয় কালে ঐ জল পরমাত্মার আশ্রয় হয় এই নিমিত্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে নারায়ণ কহে। প্রজাপতি শব্দে ঐ ব্রহ্মা বুঝায় যথা ঃ—

"ততঃ সম্বৎসরে পুরুষঃ সমভবৎ স প্রজাপতিঃ।" শত-পথ-ব্রাহ্মণ ১১।১।৬২

অর্থাৎ সম্বৎসর পরে সেই অণ্ড হইতে যে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনিই প্রজাপতি। পুরুষ সম্বন্ধে বেদ ও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র পাত্।"

ঋগ্বেদ ১০।৯০।১।

অর্থাৎ পুরুষের সহস্র (অসংখ্য) শীর্ষ, সহস্র পাদ ও সহস্র লোচন।

"স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্ব্বঙ্‌ঘ্রি বাহ্বক্ষঃ সহস্রানন শীর্ষবান্॥"

ভাগবত ২।৫।৩৫।

অর্থাৎ সেই পুরুষ সেই অণ্ডকে ভেদ করিয়া সহস্রোরু, সহস্রপাদ, সহস্র বাহু, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রানন শীর্ষবান্ হইয়া নির্গত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলেন ঃ—

"সর্ব্ব ত্রাসৌ সমস্তশ্চ বসত্যত্রেতি বৈষতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিগীয়তে॥"

অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থ যাহাতে বাষ্পাকার এবং সর্ব্বত্র যাহার বাস ও যাহা হইতে উৎপন্ন তত্ত্ব-দর্শিগণ তাহাকেই বাসুদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

শাক্তগণ বলেন শক্তি হইতে সমস্ত উদ্ভূদ হইয়াছে ভগবতীই সর্ব্বমন্ত্রময়ী ব্রহ্মাদির উদ্ভব কারিণী, চতুর্ব্বর্গাত্মিকা, এবং চতুর্ব্বর্গ ফল দায়িকা যথা ঃ—

"সর্ব্ব মন্ত্রময়ী ত্বং হি ব্রহ্মাদ্যাসত্বং সমুদ্ভবাঃ।
চতুর্ব্বর্গাত্মিকা ত্বং বৈ চতুর্ব্বর্গ ফলোদয়া॥"

কাশীখণ্ড।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতে ব্রহ্মাদির সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু শাক্তগণ বলেন সর্ব্বশক্তিময়ী ভগবতীই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জননী।

"বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণ মহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"

মার্কণ্ডের পুরাণ (চণ্ডী)

অর্থাৎ তুমি (ভগবতী) আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার বিষ্ণুর ও মহাদেবের শরীর উৎপাদন করিয়াছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এক আদি শক্তি ঈশ্বর হিরণ্য গর্ভ, ভগবতী প্রভৃতি নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। তারপর প্রকৃতি বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে প্রকৃতি হইতে এই বিশ্বচরাচর আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি কি?

হিং শাস্ত্রে প্রকৃতিকে ব্রহ্ম স্বরূপা, নিত্যা এবং সনাতনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে দেবী সৃষ্টি করিতে সমর্থ তাহাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে:—

"প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ প্রশব্দে প্রকৃষ্ট বাচক এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি বাচক যে দেবী সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃষ্টা তিনিই প্রকৃতি এবং—

"গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তি শব্দ স্তামশঃ স্মৃতঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অর্থাৎ—প্র=সত্ত্ব, কৃশ=রজঃ, তি=তমঃ। যিনি ত্রিগুণাত্মস্বরূপা এবং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা ও সৃষ্টি কারণে প্রধান ভূতা তিনিই প্রকৃতি।

দর্শনের মত। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে। প্রকৃতি অচেতন স্বরূপ বা জড়। ইহারই পরিণাম বা বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে। এই প্রকৃতি আদি কারণ। ইহার কোন কারণ নাই তজ্জন্য মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে অমূল, মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"মূলে মূলা ভাবাদমূলং মূলম্।"

সাংখ্য প্রবচণ—১।৬৭ সূত্র।

অর্থাৎ মূলের (প্রকৃতির) মূল নাই, তজ্জন্য প্রকৃতি মূল শূন্য। এই আদি কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্য পরম্পরায় উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম প্রকৃতি।

"প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ।"

কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণ পরম্পরা থাকে তাহা হইলে এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি কারণের সংজ্ঞা ভিন্ন অপর কিছুই নয়।

মহর্ষি কপিল জগতের বস্তু সমুদায়কে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন ও উহার মূলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে বলিয়াছেন, এবং প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"সত্ব রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

সাংখ্য প্রবচন ১।৬১ সূত্র।

প্রকৃতি জড় পদার্থ অথচ ত্রিগুণান্বিত। সাংখ্য শাস্ত্রে এই গুণত্রয়ের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ ইহা উত্তম, মধ্যম অধম তিন প্রকার বস্তু স্বরূপ বা এই তিনটি পদার্থ (দ্রব্য)। ইহা বৈশেষিক মতানুযায়ী গুণ নয়, কেন না তাহার সংযোগ বিযোগ, লঘুত্ব, বলত্ব, গুরুত্বাদি গুণ বিশিষ্ট। মনুষ্যগণ যেরূপ গুণ অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা গো-মহিষাদি পশু বন্ধন করিয়া থাকে তদ্রূপ পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মারূপ পশু সেই সত্ত্বাদি তিন দ্রব্যে প্রস্তুত মহত্ত্বাদি ত্রিগুণ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে। জগতের চেতন ও অচেতন সমুদায় বস্তুতে এই গুণত্রয়ের শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

মুরলী-আহ্বান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:•:—

অমানিশি অবসানে উদিত তপন।
আলোকে পুলকে সবে করে জাগরণ॥

অচেতন ছিল ধরা রূপ রসে আত্মহারা
গৌর রবি পরকাশে হইল চেতন।
কৃতার্থ মানিল নর, দুর্ল্লভ জীবন॥

কুহেলীকা সমাচ্ছন্ন ছিল কৃষ্ণলীলা।
জীবে দয়া করি গৌর মর্ম্ম প্রকাশিলা॥
সেই লীলা রস পানে ধন্য বিশ্ববাসিগণে
অমর হইল নর, শঙ্কা বিরহিত
এক সূত্রে এই মালা হইল রচিত॥

প্রেম—সে সূত্রের নাম, জীব—পুষ্পচয়।
পরিলেন সেই মালা কৃষ্ণ রসময়॥
ভক্তি তার পরিমল আনন্দ অমোঘ ফল
পরাইলা কণ্ঠে পরা প্রকৃতি সুন্দরী।
প্রেমিক-প্রদত্ত আরাধিকা নাম ধরি॥

কমনীয় কৃষ্ণ করে কুসুমের হার।
প্রেমপাশে সংগ্রথিত কি সুষমা তার॥
কিবা স্নিগ্ধ কান্তি ভাতি শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী
কোন জীবে নাই নিজ অনুত্বের লেশ।
তুষার পরশে পাসরিল হিংসা দ্বেষ॥

সাগর সঙ্গমে আজি সরিৎ সকল।
আপন অস্তিত্ব ভুলি উল্লাসে বিহ্বল॥
আমিত্বের অপগমে আত্ম সুখ বিসর্জ্জনে
বিশ্ব সুখে ব্যস্ত জীব, বিশ্বেতে মিশিল।
রাস-রসে গোপাঙ্গনা সর্ব্বস্ব সঁপিল॥

ভাস্কর উদয়ে যথা বিশ্বদৃঢ় হয়।
গৌর অবির্ভাবে তথা কৃষ্ণ পরিচয়॥
গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী জগদ্ধীত ব্রতধারী

ধর্ম্ম গ্লানি—অপধর্ম্ম অভ্যুত্থান হারী ।
সাধুজন পরিত্রাতা অসাধুর অরি ॥

যজ্ঞ-হবি-হেতু যাঁর ব্রত গোচরণ ।
দ্বিজ-পদ-চিহ্ন রমা নিধানে ধারণ ॥
দ্বিজের সম্মান তরে   নিজ বংশ ধ্বংস ক'রে
শিখালেন জীবে এই নীতি রত্নসার ।
দ্বিজের কল্যাণে হবে বিশ্ব-উপকার ॥

ধর্ম্ম গ্লানি—বহু মতবাদ খণ্ডিবারে ।
করেন ঘোষণা এক ইষ্ট সেবিবারে ॥
হিংসা লোভ অপধর্ম্ম   শাসিতে সারথি কর্ম্ম
করি' অর্পিলেন জয় দীন পাণ্ডবেরে ।
দুষ্ক্রিয়া-নিরত নৃপ-দর্প নাশ করে' ॥

হেন বিশ্বহিত যাঁর জীবনের ব্রত ।
তাঁর পদ-তীর্থাশ্রয়ে কি লাগি' বিরত ?
মনে ভাব' রাস লীলা   রুচি বিগর্হিত খেলা
তাই তুমি পরাঙ্মুখ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ?
এস ভাই ! সে সংশয় ছেদিব এক্ষণে ॥

ভগবান ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণকারী ।
যে যা চায় তারে তাই অর্পেণ মুরারি ॥
গোপী মাগে' আলিঙ্গন,   নাহি মানে নিবারণ
হারিলেন নিরুপায় গোলোক বিহারী ।
হইলেন বাঞ্ছাকল্পতরু প্রেম হেরি' ॥

প্রীতির কি রীতি ! শুধু চায় পরশন !
সম্মিলনে ভেদ বুদ্ধি করি' নিরসন ॥
পাদস্পর্শ শিরঘ্রাণ,   বদনে চুম্বন-দান
পরস্পরে আলিঙ্গন, করাবমর্ষণ ।
মনে মন প্রাণে প্রাণ দেহে দেহার্পণ ॥

সর্ব্বস্ব না দিয়া প্রেম পরিতৃপ্ত নয়।
নিজস্ব থাকিতে কিছু পূর্ণ নাহি হয়॥
যত দিন স্বার্থ জ্ঞান তত দিন নাম কাম
বিশ্ব-সূত্রে স্বার্থ-সর্পি কর সমর্পণ।
পরেশ পরশি' কাম হবে প্রেম-ধন॥

সেই রত্ন যার হৃদে' হইবে সঞ্চিত।
শিশু কি স্থবির কিম্বা যুবা কি যোষিত॥
প্রাকৃত বর্জ্জন সেই করিবে নিশ্চয় এই
দেহ গেহ ধন জন মিত্র পরিবার।
সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে তাহার॥

সেই প্রেমে আঢ্য হ'য়ে গোরা দ্বিজমণি।
নিজ নিজ সুখ তুচ্ছ মনে মানি'॥
বিশ্বের মঙ্গল লাগি' হইলেন সর্ব্ব ত্যাগী
একমাত্র কৃষ্ণ প্রীতি করিয়া আশ্রয়।
ভিন্ন ধর্ম্মী পর্য্যন্ত করিলা ভক্তি ময়॥

পূর্ণ প্রেম পূর্ণিমার কিরণ মাধুরী।
প্রকাশিলা পূর্ণিমা বিলাসী গৌরহরি॥
বসুমতী পুলকিত সুখ শান্তি বিরাজিত
কেহ কারও দ্বেষ হিংসা নাহি করে আর।
তাই বলে গোরা পূর্ণ প্রেম অবতার॥

"মানবের পূর্ণ পরিণতি গোরা হ'তে।
পূর্ণতর আর কিছু নাই ধরিত্রীতে॥
ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়া বলি হ'য়ে মহা কুতুহলী
বিশ্বহিতে রত যেই পুরুষ রতন।
তাঁর তুল্য নাই, তাঁর আদর্শ জীবন॥"

তাই বলি ভজ কৃষ্ণ ভজ গোরা নিধি।
কৃতার্থ হইতে সাধ মনে থাকে যদি॥

নবীন জীবন পাবে, রূপ রসে না মজিবে
সুখে দুঃখে সদা শান্তি আনন্দ পাইবে।
সুদুর্লভ নর জন্ম সার্থক হইবে॥

অই শুন শ্রীকৃষ্ণের গীতা বংশী ধ্বনি।
"মামেকং শরণং ব্রজ" অভয় এ বাণী॥
অই দেখ নিত্যানন্দ অক্রোধ পরমানন্দ
প্রেমের অমিয়া পানে হইয়া বিভোর।
যারে তারে বলিছেন "বল হরিবোল"॥

দেখিয়াও এসকল তবু দেখিবে না।'
বুঝিয়াছ প্রেম শ্রেষ্ঠ, তবু সাধিবে না'॥
আয় ভাই! পায়ে ধরি বালক পুরুষ নারী
অভিমান পরিহরি' হরি সঙ্কীর্তনে।
মঙ্গল বিস্তৃত হ'ক নিখিল ভুবনে॥

মদন-মোহন-স্নেহে মনোজ-দমন।
অভিনব প্রেম-নেত্র হইবে স্ফুরণ॥
কাম কালবিষধর শাসিবে'কালীয়-হর
দুর্ব্বাসনা-বেগ চিত্তে আসিবেনা আর,
তাই বলি ভজ কৃষ্ণ শ্রেয় অবতার॥

সেই কৃষ্ণ সেই গৌর ভেদ কিছুনাই।
দৃঢ় করি' গোরা পদ ধর ধর ভাই॥
গৌর-লীলা আস্বাদনে নির্ম্মল হইবে প্রাণে
নব তেজে তেজীয়ান দীপ্তবপু পাবে।
গৌর-হরি হেরি ষড় রিপু পালাইবে॥

ষড়ভুজ মূরতি মনে কর ভাই ধ্যান।
ছয় গোস্বামীর পদ চিন্ত অবিশ্রাম॥
সনাতন রঘুভট্ট শ্রীজীব গোপাল ভট্ট

প্রেম-হংস রূপ দীন রঘুনাথ দাস
বিপুল বিভবত্যজি ব্রজে যাঁর বাস॥

বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের হিতৈষী নন্দন।
প্রেম-অবতার যাঁরে বলে ভক্তগণ॥

কি সুখে প্রমত্ত হ'য়ে হেন ধন পাসরিয়ে

মায়ার সুষুপ্তি গীতে আছ অচেতন।
তৈলিকের বদ্ধ নেত্র বৃষভ যেমন॥

কর দৃঢ় পণ প্রাণে ভাব জাগাইতে।
হরিসভা-ক্ষেত্রে হরি লীলা আস্বাদিতে॥

সাপ্তাহান্তে স্বল্পক্ষণ .. ইথে হও অকৃপণ

দেহের চর্চ্চায় সদা আছ নিমগন।
দেহীর সন্ধান নাহি কর কি কারণ?

জনমি ভারতে পূত আর্য্য-পরিবারে।
কাটাওনা কাল শুধু দেহ সুখতরে॥

দেহ সহ প্রাণ মন সুখে রবে সর্ব্বক্ষণ

জীব-পরমেশ তত্ত্ব কর অন্বেষণ—
মোক্ষের অতীত প্রেম করিবে আগমন।
তাই ডাকি সভা ভূমে কর আগমন॥

চেয়ে দেখ খৃষ্ট মহম্মদ ভক্ত পানে।
ভেবে দেখ করে তারা সুযোগ কেমনে?

সবে ধর্ম্মালয়ে যায় কিছু দেয় কিছু পায়

প্রতিপল্লী প্রতিষ্ঠিত করে ধর্ম্মস্থান।
আর্য্য সন্তানের আর কবে হবে জ্ঞান?
কতদিনে হবে পল্লী-সভা অনুষ্ঠান?
কবে সবে ভক্তি তত্ত্বে ঢেলে দিবে প্রাণ?

কতরূপে কতকাল কর অপচয়?
হরিলীলালাপে তবে কেন এত ভয়?

হরি কথা গোরা কথা সেই তব আত্ম কথা
স্মরণে বিবিধ ব্যথা ঘুচিবে নিশ্চয়।
ভাই ডাকি ভাই আর না কর সংশয়!
এস সভাগৃহে হও শুদ্ধ সত্ত্বময়।
পর সত্যাশ্রয়ে থাকু যত দুঃখ ভয়॥
বল নিত্যানন্দ গৌর রাধা কৃষ্ণ জয়॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র।

আশ্রম ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

(পণ্ডিত শ্রীল যোগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামি মহোদয় লিখিত।)

ব্রহ্মচর্য্যাবসানে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এই আশ্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতিরই অধিকার বিদ্যমান আছে। কি ব্রহ্মচারী কি বানপ্রস্থাশ্রমী, কি সন্ন্যাসী সকলেই গৃহস্থের ভবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের তুল্য উৎকৃষ্ট আশ্রম আর দ্বিতীয় নাই। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যাহারা নিকেতন শূন্য হইয়া অনাহারে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে, গৃহাশ্রম তাহাদিগের এক মাত্র আশ্রয়; অতএব গৃহিগণ অতিথি সেবায় কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না। গৃহাগত ব্যক্তিকে মধুর বাক্যে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ভোজ্য ও শয়নীয় প্রদান পূর্ব্বক তাহার তৃপ্তি সাধন করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। তাঁহারা নিয়ত গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ও দেবারাধনায় যত্নবান হইবেন। যে গৃহস্থ ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ভগবান হরির ধ্যান ও অর্চ্চনা করেন তাঁহার সমুদয় পাপ ধ্বংশ হইয়া যায়। পরধন হরণ ও পরপীড়ন প্রভৃতি অসাধু ব্যবহার পরিত্যাগ করা গৃহস্থের কেবল গৃহস্থের কেন সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থের ভবনে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান দেবার্চ্চন ও অতিথি সৎকার সমাহিত হয় এবং দীন দরিদ্র অনাথাদিগের হর্ষনাদ নিয়ত শ্রুত হইতে

থাকে, সেই ধাম স্বর্গ হইতেও পবিত্র ও সুখ জনক। নির্ম্মলমতি সদাচার পরায়ণ গৃহিগণকে মাৎসর্য্যাদি দোষ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তুশাররাশি অনল তেজের নিকট কিরূপে অবস্থান করিবে। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ তিমির জাল তিরোহিত হয়, সদ্বোধের আবির্ভাবে সেইরূপ পাপ বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া থাকে। এই আশ্রম ধর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক প্রতিপালিত হইলে বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে সমর্থ হওয়া যায়। আবার এই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘণ পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিলে গৃহিদিগের অনন্ত দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে মনুষ্য প্রাণি হিংসায় প্রবৃত্ত, মিথ্যা কথনে অগ্রসর, অন্যের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত, সাধুদিগের নিন্দাপরায়ণ যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত এবং পিতৃমাতৃ সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সেই গৃহবাসী নরাধম মনুষ্য নামধারী হইলেও পশুমধ্যে গণনীয়। জনক জননী সেবা, পুত্র কলত্রাদি পরিজন বর্গের পোষণ, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সম্মান, অকপট ভাবে বন্ধুবর্গের প্রীতি সাধন এবং সর্ব্বদা সাধু সংসর্গে বাস করা গৃহিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন হইয়া বেদ বিহিত পবিত্র গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতি-পালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ইহলোকে সংকীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণেই স্বধর্ম্মোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সনাতন নারায়ণের অর্চ্চনায় অধিকারি হইতে পারে। যে গৃহস্থ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও শঠতায় সমাক্রান্ত হইয়া সাধারণের অহিতাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মই জীব গণের সুখ দুঃখ লাভের এক মাত্র কারণ। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। অতএব গৃহ বাসী মহাত্মারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণের হিত সাধনে যত্নবান হইবেন।

গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বহির্ভূত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদিগের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এই ধর্ম্ম উভয় লোকেই অনন্ত সুখ প্রদান করিয়া থাকে। ইহার তুল্য পবিত্র সুখ-প্রদ ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ পরিকীর্ত্তিত হইল একণে গৃহিগণের আচার নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

গৃহস্থগণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম চিন্তা করিবেন। ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। গাত্রোত্থানের পর। বাসস্থানের দূর প্রদেশে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন বৃক্ষ, গাভি, ব্রাহ্মণ ও আপনার

ছায়ায়, সূর্য্য ও অনলের অভিমুখে এবং জন-স্থান, পথ, তীর্থ, নদ্যাদির তীরে, শ্মশান ভূমিতে মূত্র পুরীষ কদাচ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। শাস্ত্রে দিবা ভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিকালে দক্ষিণাস্য হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে। গৃহিগণ কখনও এই নিয়ম পরিত্যাগ করিবেন না। মস্তকে বস্ত্র বেষ্টন পূর্ব্বক ভূতলে তৃণ বিস্তৃত করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মল মূত্র পরিত্যাগের পর যথাবিধ শৌচাদি করিয়া সুগন্ধি নির্ম্মল জলে আচমন ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিবে সেই সলিল সিক্ত হস্তে কেশ, মস্তক বাহুযুগল হৃদয় ও নাভি স্পর্শ করিবে। এইরূপে শৌচ ক্রিয়া সমাহিত হইলে বেশ সংস্কার প্রভৃতি মাঙ্গল্য বিধি সমাধান পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে অর্থোপার্জ্জন করা গৃহস্থ গণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তৎপরে তাঁহারা নদী, দেবখাত বা গিরি প্রস্রবনে স্নান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া নির্ব্বাহ করত পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। তর্পণাবসানে ভগবান ভাস্করকে স্তব ও প্রণাম করিয়া ইষ্ট দেবতার পূজা ও হোম ক্রিয়া সমাধান করিবেন। এই সমুদায় কার্য্যের পর অতিথি সংকার গৃহস্থের একটী প্রধান ধর্ম্ম। অতিথি উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করাইয়া শ্রদ্ধা সহকারে অন্নদান দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবেন। সম্বন্ধ বিহীন অন্য দেশাগত অকিঞ্চন ব্যক্তিকেই অতিথি বলা যায়। গৃহী প্রতিদিন অন্ততঃ তিনবার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে ভিক্ষা প্রদান করিবেন। যে গৃহী অতিথিকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হয়। অতএব গৃহবাসিগণ অতিথি সংকার করিয়া তবে স্বয়ং ভোজন করিবেন। আর্দ্র বস্ত্র পরিয়া আর্দ্র পাদ হইয়া ভোজন করা অতিশয় নিষিদ্ধ কার্য্য। ভোজনাবসানে আচমন করিয়া হস্ত দ্বারা কর যুগল ও উদর মার্জ্জন পূর্ব্বক অনায়াস-সিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে ধর্ম্মশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা দিবা যাপন করিয়া পুনর্ব্বার সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। রাত্রি যোগে পূর্ব্বাস্য অথবা দক্ষিণাস্য হইয়া শয়ন করা গৃহিগণের শাস্ত্র সম্মত কার্য্য। অস্নাতা, পীড়িতা, রজস্বলা, অবিশুদ্ধা, রাগান্বিতা, অন্যকামা, অকামা, অন্যপত্নী, ক্ষুধা বিশিষ্টা, ও অতি ভোজনাবর্ত্তী, রমণীতে গমন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যে সকল

গৃহী চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই সমুদয় পর্ব্বদিনে মাংস ভোজন, তৈল ভক্ষণ ও স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহাকে বিণ্‌মূত্র ভোজন নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। অতএব শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহারে গৃহিগণ কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। আচার বিধির এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ বলা হইল, শাস্ত্রে এবম্বিধ বহুতর আচার প্রণালী নিরূপিত আছে। উপস্থিত সময়ে যদিও সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুরূপ আচার বিধির অনুসরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি গৃহস্থ মহাত্মারা এবিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিবেন। আচার সম্পন্ন ধার্ম্মিক গৃহস্থ ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ করিয়া পরলোকে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। এবং বিজ্ঞান প্রভাবে কর্ম্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, এই আশ্রমে তাঁহাদিগের মোক্ষ পর্য্যন্ত ও লাভ হয়। এই সমুদয় কারণ বশতঃই গৃহাশ্রম শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গৃহিগণ গার্হস্থ ধর্ম্ম এইরূপে প্রতিপালন করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের প্রতি সমুদায় সাংসারিক ভার সমর্পণ পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন।

ক্রমশঃ।

আত্ম-শুদ্ধি।

—:০:—

আত্ম-শুদ্ধি শব্দের অর্থ আত্মনঃ শুদ্ধিঃ অর্থাৎ আত্মার শুদ্ধি। এক্ষণে আত্ম শব্দের অর্থ কি? অমর কোষ বলিতেছেন "আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি"। আমরা এস্থলে দেহে ও স্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃতিতে এই দুই অর্থ গ্রহণ করিব। দেহ অর্থে আমাদের পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতাত্মক এই বাহ্য স্থূল শরীর; আর স্বভাব অর্থে অন্তরঙ্গ স্বকীয় ভাব, প্রকৃতি বা চরিত। যাহার আধার হইতেছেন অন্তরিন্দ্রিয় মন। আত্ম শব্দে মনকে ও বুঝায়। অতএব আত্মশুদ্ধি বুঝিতে হইলে ইহাকে দুই ভাগ করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রথম দেহের শুদ্ধি দ্বিতীয় স্বভাবের শুদ্ধি। প্রথমতঃ দেহের শুদ্ধি কিসে রক্ষা

হয়। আমাদের এই স্থূল শরীরের প্রত্যেক উপকরণই অপবিত্র। রক্ত মাংস বা মেদ মজ্জা প্রভৃতি এক একটী দেখিতে গেলে প্রত্যেকটিকেই অপবিত্র বলিয়া জানা যাইবে। বলিতে গেলে আমাদের দেহটী একটী মলবাহী যন্ত্র, নয়টী দ্বার দিয়া সেই মল অবিরত নির্গত হইতেছে। এই দেহটীকে শুদ্ধ করিতে যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কতক গুলি উপায় আছে ক্রমে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

সাধারণতঃ মল মূত্র কফ শ্লেষ্মাদি যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া জল দ্বারা স্নান করিলেও দেহ শুদ্ধ হয়। তদভাবে হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, নাসিকাদি প্রক্ষালন করিলে দেহ শুদ্ধ হয়। দেহের যে নয়টী দ্বার মল নির্মোচন স্থল তাহাদিগকে যথা সম্ভব ধৌত করিতে হইবে। শাস্ত্রে বিহিত আছে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলে বহিরন্তর উভয়ই শুদ্ধ হয়, এজন্য আমাদের প্রত্যেক ধর্ম্ম কার্য্যের প্রারম্ভে আত্ম শুদ্ধির জন্য এইটী পাঠ করা হয়। যথা—

অপবিত্রোঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতেঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥

দেব, ঋষি ও পিতৃগণের পূজা হোম যজ্ঞ ও তর্পণ দ্বারা এবং তপস্যা দ্বারাও দেহ শুদ্ধ হয়। ক্রিয়া বিশেষে পঞ্চ গব্য স্নান দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠ মুনির আদেশে সুরভী তনয় নন্দিনী নামক ধেনুর অঙ্গ নিস্থত জল (গোমূত্র) দ্বারা স্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তি শাস্ত্রে উক্ত আছে গোকুলে গোপ রমণীরা স্নেহ পর তন্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দুরিত দূর করিবার নিমিত্ত তাহাকে গোক্ষুরোদ্ভূত ধূলি দ্বারা স্নান করাইয়া পবিত্র করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ও শত সহস্র জন শ্রীবৃন্দাবনে রজ ভূষিত হইয়া পবিত্র হইবার আশায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। দেবতার প্রসাদ বা প্রসাদান্ন গ্রহণে দেহ শুদ্ধ হয়। রাজসিক তামসিক আহার ত্যাগ করিয়া সাত্বিক আহার গ্রহণে দেহ শুদ্ধ হয়। সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা গীতা বলিতেছেন—

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃস্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্বিক প্রিয়া॥ ১৭।৮

অর্থাৎ যে আহারে আয়ুবৃদ্ধি করে সাত্বিক ভাব, বল আরোগ্য ও মনের প্রসন্নতা প্রদান করে যাহা সুখ প্রিয় যাহা রস ও স্নেহ যুক্ত এবং যাহার

সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে এবং যাহা হৃদয়গ্রাহী তাহাই সাত্বিক আহার। তিথি বিশেষে নিষিদ্ধ ভোজন ত্যাগেও দেহ শুদ্ধ হয়, দেব ও ব্রাহ্মণ বা পূজ্য ব্যক্তিগণকে প্রণাম ও তাঁহাদের চরণ ধুলী গ্রহণ করিলে দেহ পবিত্র হয়। একটী গান আছে।

হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যে কি তার জানেন বিধি।
সে রোগের মহৌষধি ব্রাহ্মণের পদরজ॥

শারিরীক তপস্যা সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন :—

দেব দ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শরীরং তপ উচ্যতে॥১৭।১৪।

অর্থাৎ দেব দ্বিজ গুরুজন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পণ্ডিত ইহাদের পূজা বা সেবা, অন্তর্বহিঃশুচি, সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা এই গুলি শারিরীক তপস্যা। এতদ্ভিন্ন বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান, গন্ধ ও মাল্য ধারণ, যথা সম্ভব ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ইন্দ্রিয় সংযম বাক্য ও মন দ্বারা ব্যভিচার ত্যাগ এগুলিও অন্তর্বহিশুদ্ধি পক্ষে অতীব হিতকারী।

এক্ষণে যে আত্ম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ স্বভাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার শুদ্ধি বিষয় বলা হইতেছে।

শুদ্ধি অর্থাৎ শৌচ দুই প্রকার :—

শৌচন্তু বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমন্তর ভেদতঃ।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাব শুদ্ধি স্তমন্তরং॥

অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি হয় এবং ভাব অর্থাৎ মনের শুদ্ধি দ্বারা অন্তর শুদ্ধি হয়। ভাব শুদ্ধি সম্বন্ধে ভক্ত তুলসীদাসের একটী সুন্দর দোহা আছে। যথা :—

মালা জপনেছে হরি মিলে তো হাম জপেঙ্গে কুণ্ডা।
তিলক-কর্‌নেছে হরি মিলে তো হোম বাধেঙ্গে পিণ্ডা।
পাথর পুজনেছে হরি মিলে তো হাম পুজেঙ্গে পাহার।
থোরা থানেছে হরি মিলে তো হাম করেঙ্গে বাতাহার।

অর্থাৎ মলা জপ করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায় তো আমি বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড জপ করিব, তিলক করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি মৃত্তিকা খণ্ড দ্বারা শরীর অঙ্কিত করিব পাথর অর্থাৎ পাষাণ ময় দেব দেবীর

পূজা করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায় তো আমি পাহাড় পূজা করিব আর জলাহার বা উপবাস করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায় তো আমি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিব তাহা হইলে তো আমি অতি সহজে হরিকে পাইব? কিন্তু তুলসীদাস বলিতেছেন যে না তাহাতে কোন কাজ হইবে না তবে কিসে হইবে

সাচ্ বাত অভেদ্ জ্ঞান পর দ্রব্যছে নৈরাস।
এ তিন মেঁ হরি না মিলে তো জামিন তুলসীদাস॥

অর্থাৎ সত্য কথা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি এবং পরদ্রব্যে লালসা ত্যাগ এ তিন কার্য্যে হরিকে না পাইলে তজ্জন্য তুলসীদাস দায়ী অর্থাৎ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। মানসিক তপস্যা সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন,—

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্ম বিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেত তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৭।১৬

অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা অক্রূরতা মৌনভাব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আন্তরিক ভাবের শুদ্ধতা এই গুলি মানসিক তপস্যা। ভাব শুদ্ধির একটী প্রকৃষ্ট উপায় শাস্ত্রে উক্ত আছে যথা—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

অর্থাৎ পরদারকে মাতৃবৎ দর্শন করা পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ অর্থাৎ মৃত্তিকা খণ্ডের (মাটীর ঢেলার) ন্যায় অকিঞ্চিতকর বলিয়া উপেক্ষা করা এবং সর্ব্বজীবে আত্মবৎ দর্শন অর্থ্যাৎ সকলকেই আত্মীয়ের ন্যায় দর্শন অথচ সকলকেই নিজের ভাবে দেখা (আমার অনিষ্ট হইলে বা কেহ অনিষ্ট করিলে আমার যেমন কষ্ট হয় অপরের অনিষ্ট হইলে বা কেহ অনিষ্ট করিলে তাহারও সেইরূপ কষ্ট হয় এইরূপ ধারণা করা) এই নিয়ম গুলি যিনি সম্যক পালন করেন তিনিই পণ্ডিত অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানী। এই পরদারে মাতৃভাব যে মহাজনগণ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন তাঁহাদেরই যথার্থ ভাব শুদ্ধি হইয়াছে তাঁহারাই আত্ম শুদ্ধির আদর্শ স্বরূপ। আত্ম শুদ্ধির আর একটী সুন্দর উপায় ষড় রিপুকে বশীভূত করা। আমরা সাধারণতঃ রিপুর দাস অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপুর দ্বারা বা তাহাদের এক বা একাধিকের

দ্বারা পরিচালিত হইয়া আত্মাকে কলুষিত করি। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা ঐ রিপুগুলিকে ক্রমে জয় করিয়া তাহাদিগকে আমাদের বশে আনিতে পারিলে, তাহাদিগকে আমাদের ইচ্ছার অধীন করিতে পারিলে, কখন কোনটী প্রবল হইলে তখন জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ দ্বারা তাহার দমন করিতে পারিলে, আর তাহারা প্রবল হইতে পারিব না আমাদের উপর তাহারা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না তাহারা ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে। সাধুসঙ্গ আত্ম শুদ্ধির যথার্থ সহায়তা করে। সাধুসঙ্গ দ্বারা সাধ্য চরিত্রের অনুকরণের প্রয়াস হয়, চিত্তের মলা দূর হয় এবং ভগবত সন্নিধানে অগ্রসর হইবার পথ যথেষ্ট সুগম হয়। আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষার উপদেশ অনেক সময় প্রচ্ছন্ন ভাবে লিখিত থাকে তাহাতেই বকরূপী ধর্ম্মের কঃ পন্থা এই প্রশ্নে মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন।

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
না শৌ মুণি যস্য মতংন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সং পন্থা॥

খনির তিমির গর্ত্তে উজ্জ্বল মণি সমূহ থাকে তাহা অনুসন্ধিৎসু ও প্রযত্নশীল ব্যক্তিগণের বহুল প্রয়াসে উদ্ধার হইয়া থাকে। গীতা শাস্ত্রে বিষয়ে অনাশক্তি বিষয় ত্যাগ ও ভগবৎ পদারবিন্দে আশক্তি এবং উপদেশ অন্তর্নিহিত আছে। এই উপদেশত্রয় হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে আত্ম শুদ্ধি লাভ হয়। আমাদের শাস্ত্রে রবিবার অষ্ঠমী চতুর্দ্দশী পুর্ণিমা আমাবস্যা তিথিতে এবং রবি সংক্রান্তি দিনে কতকগুলি দ্রব্য ভোজন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে। দৈনিক পঞ্জিকাতে সচরাচর ঐ গুলি লিখিত থাকে। বৈশাখ কার্ত্তিক ও মাঘ মাস পুণ্য মাস বলিয়া কথিত ঐ সকল মাসে কতকগুলি পুণ্য কৃত্য আছে। ইহার বিশেষ বিধান পঞ্জিকাতে দ্রষ্টব্য। এ সমস্তই আত্ম শুদ্ধির হেতুভূত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন—

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
সাধুসঙ্গ শ্রীবিগ্রহ তীর্থ দরশন॥

এগুলিও আত্ম শুদ্ধির প্রধান উপায়। এইরূপ আত্ম শুদ্ধির আরও অনেক উপায় বা পন্থা আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না কিন্তু আমাদের "ভাবের ঘরে চুরী" না হয়। অর্থাৎ আমরা কপট চারী হইয়া বাহিরে সাধুতা প্রদর্শন করিয়া অন্তরে অসাধু না হই। এবিষয়ে গীতা বলিতেছেন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। ৩।৬

অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি (চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি) সংযত করিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি মনে মনে সেই সেই ইন্দ্রিয় ভোগ বিষয়ের অনুসরণ করে তাহাকে মিথ্যাচারী কহে। তাহার পরশ্লোকে গীতা বলিতেছেন।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৩।৭

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয় গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিদ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ প্রশংসনীয়। এখানে গীতা এই দুই শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন ভাবের ঘরে চুরী কাহাকে বলে এবং তাহার প্রতীকারই বা কি। কথিত আছে কোনও সময় না কি রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ পরমহংস দেব পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "বেটী তুই এখানে বসিয়া জমিদারী চিন্তা করিতেছিস"। বস্তুতঃ তিনি সে সময়ে দেবীর চিন্তা না করিয়া প্রকৃত পক্ষে জমীদারী চিন্তাই করিতেছিলেন। আমাদেরও দশা প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে।

এক্ষণে যে আত্ম শুদ্ধির কথা বলা হইল তাহার উদ্দেশ্য বা আবশ্যকীয়তা কি? আমার কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষকে গৃহে আনিতে হইলে গৃহের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাই। বাটীতে কোন দেবতার আবাহনকরিতে হইলে বা পূজার আয়োজন করিতে হইলে গৃহটী যথাসাধ্য নির্ম্মল করিয়া সুগন্ধ দ্বারা আমোদিত ও পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখি। অতএব যিনি সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকল শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকল দেবতার দেবতা ব্রহ্মসংহিতা যাঁহাকে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ কার্য্য কারণ কারণম্ ॥

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে আত্ম শুদ্ধি যে কতদূর প্রয়োজন তাহা বিবেকী সুধীগণের চিন্তার বিষয় ভক্তগণের ধারণার বিষয় এবং আমার ন্যায় মূঢ় জনের শিক্ষার বিষয়।

ভগবান সকল জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন তাহার প্রমাণ তাহারই শ্রীমুখের বাক্য, যথা গীতা শাস্ত্রে বলিতেছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃৎ বেদ বিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫

ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১

তবে তাঁহাকে হৃদয়ে আনয়ন করার কথা কেন বলিয়াছি তাহার কারণ ভগবান বলিতেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭।৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫

অর্থাৎ পৃথ্বীজলাদি তাঁহার অষ্ট প্রকার অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা প্রকৃতি আছে এবং তাহাদের হইতে উৎকৃষ্টা জীবভূতা বা জীব স্বরূপা একটী প্রকৃতি আছে (যাহাকে আমরা চৈতন্য সত্বা বলি) এবং সে প্রকৃতি এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন। অতএব এই জীব স্বরূপা প্রকৃতি অর্থাৎ জীবাত্মা ভগবানের অংশ আমাদের হৃদয়ে নিহিত আছেন। যেমন গবাক্ষ দ্বার দিয়া সূর্য্য রশ্মি দেখা যায় ঐ রশ্মিতে সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ আছে এবং ঐ রশ্মি আশ্রয় করিয়া সূর্য্যকে দর্শন করা যায় সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আছেন

তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করা যায় তদ্বিষয়ে ভগবান বলিতেছেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।

যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ৮।২২

অর্থাৎ হে পার্থ! যাঁহার বিরাট দেহে ভূতগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন যিনি এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে একান্ত ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায় সেই ভক্তি যিনি পূর্ব্ব জন্মে বা ইহ জন্মে সাধনা বলে অথবা সদ্‌গুরু আশ্রয়ে লাভ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ভগবৎ পদারবিন্দ প্রাপ্তি সহজ বটে কিন্তু যাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই তাঁহাদের পক্ষে ভক্তি লাভের জন্য আত্মশুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি নিষেধের অন্তর্বর্ত্তী তাঁহাদের পক্ষে আত্মশুদ্ধি যে কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা বলিতে হইবে না। আর যাঁহারা ভক্তি বা ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছেন; যাঁহারা বিধি নিষেধের অতীত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও আত্ম শুদ্ধি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে, কারণ স্খলিত হইবার আশঙ্কা আছে। এ বিষয়ে প্রধান উক্তি আছে যথা—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার বাসনাং।

অর্থাৎ—জীব মুক্ত হইলেও কোন কালে সংসার বাসনা উপস্থিত হয়। অতএব কি সংসারে আবদ্ধ পুরুষ, কি সংসার মুক্ত পুরুষ সকলেরই আত্মশুদ্ধি বিষয় বিশেষ যত্নশীল হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীঅনাদিনাথ দে।

"এস।"

(গীত।)

—:•:—

এস, হে চির সুন্দর! মানস মোহন!

এস, মম ক্ষুদ্র হৃদয় কুটীরে।

মম ঊষর হৃদয় কানন হইতে
রেখেছি তুলিয়ে ক'টী বনফুল,
তব রাঙ্গা পা দু'খানি পূজিতে যতনে
করিয়াছি সিক্ত নয়ন শিশিরে॥

এস, করুণা করিয়া হে করুণাময়!
ডাকিছে কাতরে এ দীন অধম,
তব মঙ্গল নির্ম্মল দিয়ে পদদ্যুতি
কর দূরীভূত মানস তিমিরে॥

যদি সাধনা অর্চ্চনা স্তুতি আরাধনা
জানিনা কিছুই, অতি অভাজন,
তবু আছে গো বিশ্বাস, শুধু তব নামে
উদ্ধারিলে কত পতিত পাপীরে॥

তাই হৃদয় নিলয়ে আঁকি হরিনাম
আকুল পরাণে ডাকি অবিরাম,
হরি, এস একবার মানসে আমার
রাঙ্গা পদযুগ নিভৃতে পূজিরে॥

যত আমার আমার কামনা বাসনা
সকলি চরণে করিয়া অর্পণ,
আমি জপিব কেবল হরি হরি বলে
যত দিন ভবে রহিব বাঁচিয়ে।

এস, হে চির সুন্দর! মানস-মোহন!
এস, মম ক্ষুদ্র হৃদয় কুটীরে॥

দীন—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস।

শ্রীশ্রীবংশীবদন ঠাকুর।

(পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামি মহোদয় লিখিত।)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলাস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের জীবনী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাত্রেরই বড় আদরের বস্তু। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের একজন অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত ছিলেন। এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ঘরণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্ত্রশিষ্য। এ সৌভাগ্য গৌরভক্তবৃন্দের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপাবলে একা বংশীবদনই এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া বৈষ্ণব জগতে চির পুজিত হইয়া আসিতেছেন। এই পরম সৌভাগ্যবান মহাপুরুষের চরণ কমলে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নাম লইয়া অধম অকৃতি লেখক আত্ম সোধন করিবার উদ্দেশে তাঁহার পুণ্য চরিত গৌর-ভক্ত মণ্ডলীর নিকট কিছু নিবেদন করিবার বাসনা করিয়াছি। এই ভক্ত চরিতের সাহায্যে কলির জীব ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের অন্তরঙ্গ ভক্তবর্গের পুণ্য চরিত অনুশীলন না করিলে ভক্তি রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ দুর্ঘট।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্ত্র শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল বংশীবদন ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪১৬ শকে মধুমাসে পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়।

চৌদ্দশত ষোলশকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব হয়ত সন্ধ্যায় ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অপেক্ষা বংশীবদন বয়ঃক্রমে ৮।৯ বৎসরের ছোট ছিলেন। শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা গ্রন্থ খানিতে এই মহাপুরুষের লীলা-কথা বর্ণিত

আছে। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস মিশ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে লিখিত আছে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ডাকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া বংশী কলির জীবকে গৌর-লীলা-রস-তত্ত্ব অস্বাদন করাইতে কুলিয়া নগরে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বংশী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ছাড়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। বংশীবদনও শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ-সুখে রসরঙ্গে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেন।

কৃষ্ণ প্রিয়া সেই বংশী গোরা অবতারে।
রস রাজ উপাসনা স্রোত রাখিবারে॥
গোরার আহ্বানে আসি কুলিয়া নগরে।
জনম লভিলা অতি আনন্দ অন্তরে॥ বঃ শিঃ।

ভাগীরথী-তটে রম্যে গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে।
কুলীয়ায়াং শুভে শাকে রসেন্দু-বেদ চন্দ্রমে॥
শ্রীবংশী বদনো যস্যাং প্রকটোঽভুদ্বিজালয়ে।
সর্ব্ব সদ্‌গুণ পূর্ণাং তাং বন্দেঽহং মধু পূর্ণিমাং॥

বংশীবদনের পিতার নাম ছকড়ি চট্টরাজ। ইনি একজন মহাতেজা পরম কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর আদিম নিবাস পাটুলীতে ছিল। পাটুলী গ্রাম হইতে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই মহাতীর্থ স্থানে বংশীবদনের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত বংশী শিক্ষা গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে।

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম
মহাতেজা কুলীন সন্তান।
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর রমণী কুলেতে যাঁর
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভে আসি কৃষ্ণের মুরলী বাঁশি
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান।

দশ মাস দশ দিনে　　রাকা চন্দ্র লগ্ন মীনে
　　চৈত্র মাস সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ডাকে　　তুষিতে আপন মাকে
　　গর্ভ্ভ হৈতে হইলা উদয়॥
হুলুধ্বনি শঙ্খরব　　করেন রমণী সব
　　গৌর চাঁদ আনন্দে নাচায়।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ　　জয় দেয় ঘন ঘন
　　নানা মত বাজনা বাজায়॥
শ্রীঅদ্বৈত আদি কয়　　সরলা বংশী উদয়
　　গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল।
বংশীর জনম গান　　প্রেমদাস অগেয়ান
　　ভক্ত মুখে শুনিয়া পাইল॥

এই কারণেই ছকড়ি চট্টরাজের ভাগ্যবান পুত্রের নাম বংশী বদন রাখা হইল।

কৃষ্ণ করে স্থিতা যা সা চুতিকা বংশিকা তথা।
শ্রীবংশী বদনো নাম ভবিষ্যতি কলৌযুগে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্ত বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের বংশী স্বরূপ। শ্রীধাম নবদ্বীপে নানা বিধ লীলারস আস্বাদন করিয়া তিনি পরমানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গগুণ গান করিতেন।

শ্রীবংশীর অধিকার গোবিন্দ বয়ান।
শ্রীবংশী বদন নাম তেঁই হয় তান॥
সেই বংশী গৌর সঙ্গে নদীয়া নগরে।
বহুরূপ লীলা করে আনন্দ অন্তরে॥　　বঃ শিঃ

এই মহাপুরুষের বাল্য জীবনের কথা কিছু জানা যায় নাই। তবে তিনি অতি অল্প বয়সেই যে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বমুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু দিন পূর্ব্বে বংশী বদনকে তিনি যে সকল মধুর ভজন তত্ত্ব পূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয় প্রভু বংশীবদনকে বিশেষ কৃপা করিতেন। প্রভু বংশীবদনকে তাহার

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বংশীবদনের সহিত প্রভুর সন্ন্যাস কালীন কথোপকথন অতি গূঢ়তত্ত্ব পূর্ণ রসময়। বংশীবদনের বয়ঃক্রম তখন ১৫।১৬ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে তিনি সমস্ত ভক্তি শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

প্রভুর গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া বংশীবদন কুলিয়া হইতে প্রভুর নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তিনি লোক মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণে আসিয়া পড়িলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রভুকে বংশীবদন কহিলেন।

লোক মুখে এ বারতা করিয়া শ্রবণ।
কুলিয়া হইতে প্রভু শ্রীবংশী বদন॥
প্রভুর পাশেতে যাঞা কহেন কান্দিয়া।
"কি শুনিনু কহ প্রভু প্রকাশ করিয়া॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি ছাড়ি মো সবায়।
কোথায় যাইবে প্রভু কহত আমায়॥
তোমা না দেখিয়া শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
কেমনে রবেন গৃহে কহ বিবরিয়া॥
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর আদি ভক্তগণ।
তোমার বিরহে সবে ছাড়িবে জীবন॥ বং শিঃ

বালক বংশীবদনের কাতর রোদনে প্রভুর কোমল হৃদয় দ্রব হইল। তিনি বংশীবদনের দুটি হস্ত ধারণ করিয়া আদরের সহিত নিকটে বসাইলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ অতি গোপন ছিল। অন্তঃরঙ্গ প্রিয়ভক্ত কয়েক জন ভিন্ন আর কেহ এই গুপ্ত সংবাদ জানিতেন না। বালক বংশীবদনের নিকট প্রভু কিছুই গোপন করিলেন না। তাহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। প্রভু অতিশয় কাতরভাবে ধীরে ধীরে বংশীবদনকে কহিলেন;—

"ওহে বংশী কেন তুমি করিছ রোদন।
তুয়া কাছে কিছু মোর নাহিক গোপন॥
যে কার্য্য লাগিয়া এথা লইনু জনম।
সকলি ত জান তুমি শ্রীবংশীবদন॥

সন্ন্যাসী হইয়া আমি দেশে দেশে যাব।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বদনেতে গাব॥
তাহাতে কলির পাপ আদি হবে নাশ।
আর এক গুহ্য কথা কহি তুয়া পাশ॥
রস রাজ উপাসনামৃত আস্বাদিতে।
মিলিব মু অন্তরঙ্গ ভকত সহিতে॥
শ্রীনাম কীর্ত্তন রসরাজ উপাসন।
গৃহে রহি এই দুই না হবে কখন॥
বহু বিঘ্ন পরিপূর্ণ সংসার কাণ্ডারে।
রহি মায়া বদ্ধ জীব কি করিতে পারে॥
তবে রসরাজরূপী গুরুর কৃপায়।
যেই জীব মায়া বদ্ধ হইতে এড়ায়॥
সেই জীব গৃহারণ্যে রহি শ্রীবদন।
শ্রীনাম কীর্ত্তন রসরাজ উপাসন॥
এই দুই কার্য্য অনায়াসেতে সাধয়।
মোর ভাগ্যে নাহি তাহা কহিনু নিশ্চয়॥ বঃ শিঃ

প্রভুর এই করুণা পূর্ণ উপদেশ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া বালক বংশী বদন নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বালকের মনে কি এক যেন মধ্য ভাবের তরঙ্গ উঠিল। তাঁহার হৃদয়ার্ণবের বেলাভূমিতে বিশ্ব প্রেমের তরঙ্গাঘাত লাগিয়া নীরস হৃদয় সরস করিয়া দিল। প্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ শ্রবণ করিয়া বংশীবদন ভাবিলেন প্রভুকে গৃহে রাখিবার চেষ্টা বৃথা। এই সুযোগে, প্রভু গৃহে থাকিতে থাকিতে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করি, আর তাঁহার শ্রীমুখে গুপ্ত রসতত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই। তাই পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক বংশীবদন করযোড়ে প্রভুকে কহিতেছেন।

গৌরাঙ্গের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করযোড় হ'য়ে বংশী করে নিবেদন॥

ওহে গোরাচাঁদ তুমি এ নদীয়া ছাড়ি।
নিতান্ত যাইবা যদি হইয়া ভিখারী॥
তবে মানবের যাতে হইবে নিস্তার।
তাহা প্রকাশিয়া কহ শচীর কুমার॥
উপাসনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন উপাসনা।
কহ প্রভু শুনিবারে হয়েছে বাসনা॥

বালক বংশীবদনের ধর্ম্ম-পিপাসা ও তত্ত্ব গ্রহণেচ্ছা দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি তাঁহার প্রিয় ভক্ত বংশীবদনকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিলেন। সে আদরের ভাবটী কি মধুর! কি ভালবাসাপূর্ণ! প্রভু বলিলেন!—

"ওহে প্রিয় বংশি! তুমি সকল জানহ।
তবে কি লাগিয়া মোরে জিজ্ঞাসা করহ॥
শব্দ ব্রহ্ম ময় তুমি সাক্ষাৎ প্রণব।
আনন্দ চিচ্ছক্তি রূপা হরি মুখোদ্ভব॥
ত্রয়ী মূর্ত্তিময়ী গতি আশ্রয় স্বরূপ।
সর্ব্বাশ্রয় গুরু তুমি সর্ব্ব রস ভূপ॥
তুয়া দ্বারে আদি গুরু হরি ভগবান।
ব্রহ্মারে গায়ত্রী মন্ত্র করেন প্রদান॥
ত্রিলোক কর্ষিণী শক্তি শ্রীকৃষ্ণের তুমি।
তব সন্নিধানে আর কি বলিব আমি॥ বঃ শিঃ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব বালক বংশীবদনকে কি রূপ সম্মান করিলেন দেখিলেন? কিন্তু বংশীবদন কৌশলী প্রভুর কৌশল জালে নিপতিত হইলেন না। প্রভুর চিরন্তন প্রথা ছলনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ছাড়িলেন না। অতঃপর প্রভু উপাস্য ও উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে বংশীবদনকে যাহা উপদেশ দিলেন তাহা বংশী শিক্ষা গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। নিগূঢ় ব্রজলীলা রসতত্ত্বনিধি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র. বালক বংশীবদনের নিকট সমস্ত রাত্রি ব্যাখ্যা করিলেন। বংশীবদন বালক হইলেও সেই গূঢ় ব্রজরস সিদ্ধান্ত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বংশী বদনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্বরূপ রসরাজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন, প্রভু বংশী বদনকে স্বরূপ দেখাইয়া কহিলেনঃ—

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

১১শ বর্ষ। আষাঢ়, ১৩২০। ১১শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

ভবার্ণবে-তাপ সহস্র-সঙ্কুলে
সদাভিভূতো নিজ কর্ম্মলব্ধয়া।
অজ্ঞান বৃত্ত্যা হরি ভক্তিশূন্যং
মামুদ্ধরাত্মীয় কৃপা কটাক্ষৈঃ॥

হরিহে! নিজ কর্ম্মদোষে অজ্ঞানের দ্বারা আমার দুইটী চক্ষুই আবৃত্ত, জ্ঞান-নেত্র বিহীন হইয়া অন্ধের ন্যায় এই সহস্র সন্তাপ-প্রদ দুলঙ্ঘ্য ভব সমুদ্রে নিপতিত; নিরন্তর হাবু ডুবু খাইতেছি। ডুবিয়া ডুবিয়া কিছু কিছু অনুভবও হইতেছে যে, তোমার কৃপা ভিন্ন আমার আর উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। তাই প্রার্থনা, তুমি দয়া করিয়া আমাকে তোমার নিরাপদ চরণ-তরি দান করিয়া এই দুস্তর বিপদ হইতে উদ্ধার কর। প্রাণে বল দাও, অকপট বিশ্বাস দাও আমি প্রাণ খুলিয়া তোমার দয়ার জয় দিয়া জীবন জনম সার্থক করি।

দীনদয়াল! দীনের একমাত্র ভরসা তুমি, তোমার ন্যায় সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, এমন অহৈতুকি পরমবন্ধু আমার আর কেহই নাই। আমি অকৃতজ্ঞ অধম হইলেও তুমি নিরন্তর আমার মঙ্গল বিধানই করিতেছ, আমি ক্ষুদ্র আমার নিকট তোমার কোন রূপ কিছুর প্রার্থনা বা কিছুপাইবার আশা নাই, তুমি আত্মারাম কিন্তু তথাপিও তুমি যাহাতে আমার সুখ হয়, যাহাতে আমি আনন্দে থাকিতে পারি তাহার জন্য সতঃপরত যত্নবান, আমি তোমাকে

ভালবাসিতে না পারিলেও তুমি আমাকে দিবানিশি ভালইবাসিতেছ কখনও ভুলিয়া থাকনা।

হে লীলাময়! তোমার লীলা বুঝা ভার, তুমিযে কখন জীবকে কি ভাবে চালাইতেছ, কি ভাবে ভাবাইয়া কিরূপ ভাবের খেলা খেলিতেছ তাহা মায়ামুগ্ধ ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা কি বুঝিব? এক একবার কৃপা করিয়া জীবকে এমন ভাব দাও যে, তোমাকে ভিন্ন, তোমার ভাব ভিন্ন, তোমার নাম, তোমার প্রিয় ভক্ত-সঙ্গ ভিন্ন মন আর কিছু চায়না;—নানাবিধ বাধাবিঘ্নেও মন চঞ্চল হয়না। কিন্তু হে লীলাবিলাসিন্! পরক্ষণেই আবার এমন ভাব আসিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া দেয় যে, তাহার মোহে মুগ্ধ হইয়া সকল ভুলিয়া ঘোর নাস্তিকতার ভাবে হৃদয় কলুষিত হইতে থাকে। তখন যেন জীব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কেমন একরূপ হইয়া যায়। এ তোমার কিরূপ লীলা খেলা, কিরূপ ভালবাসা? তোমার ইচ্ছা ব্যতীত যখন কোন কিছুই হইতে পারেনা, তখন এ সকল কি তোমারই চতুরতা নয়? তুমিই যখন যাবতীয় কর্ম্মের নিয়ন্তা তখন এই চঞ্চলতার কারণও কি তুমি নও? হৃদয়ে এই অবিশ্বাস জন্মাইয়া ঘোর নাস্তিকতা প্রসারের কারণও যে তুমি নয় তাহা কি করিয়া বলিব? লীলাময়! তোমার লীলা অনন্ত, ভাব অনন্ত এবং ইচ্ছা অনন্ত; আমরা কি বুঝিব? কিছু বুঝিনা, বুঝিতে চাইও না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর, কেবল আমার ন্যায় কলুষিত অধম জীবের প্রতি কৃপা করিয়া এই করিও, যেন তোমাতে তাহাদের অচল অটল বিশ্বাস থাকে। তাহাদের দুঃখ দারিদ্রতা রোগ শোক যে কোন অবস্থা দিয়াই রাখনা কেন, সকল অবস্থাতেই যেন তোমার ভাব স্মরণ থাকে। ভালমন্দ সকল কর্ম্মের নিয়ন্তাই যে তুমি এ বিশ্বাসটী যেন তাহাদের দৃঢ় হয়। নানাবিধ রোগ শোকাদির যাতনায় বিলুপ্তজ্ঞান হইয়া যেন তোমায় ভুলিয়া না যায়। আমার ন্যায় কাল কলি-কবলিত কলুষিত ভ্রান্ত জীবের প্রতি দয়াকর, এইটীই আমার এবারে সকাতরে তোমার নিকট প্রার্থনা।

দীন—দীনেশ।

গৌর-নাম।

—:০:—

গৌর নামের ঢেউ উঠেছে
ভাস্‌ছে সারা দেশ।
হিমালয়ের শিখর হ'তে
কুমারিকার শেষ॥
কে সে দয়াল? কার ডাকে ভাই
ছুট্‌ল প্রেমের বান?
মানস-মরাল উঠ্‌ল ভেসে
মরায় পেলে প্রাণ?
কার নামে ভাই নাচ্‌ছে সবাই
কার প্রেমে ভাই গায়?
(তারা) কেউবা কাঁদে কেউবা হাসে
কেউবা ভেসে যায়॥
(তারে) দেখ্‌তে না পাই কোথায় সে ভাই
কোথায়রে তার ধাম?
কোথায় ছিল লুকিয়ে এমন
মন মাতানো নাম?
কে আনিল কে শুনাল
কোথায় তারে খুঁজি,
অজব নামই— নামেই নামী
লুকিয়ে থাকে বুঝি॥
(তারে) দেখ্‌তে পেলে কুটার মত
লুটিয়ে রব পায়।
(আর) প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে নেব
চরণ ধুলায় ছায়॥

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

---:০:---

জড় জগতের যাবতীয় জীব এক অদৃশ্য রাজ্য হইতে আসিয়া, আর এক অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে, জীব কেবল আসিতেছে আর যাইতেছে।

কোন অনন্ত কাল হইতে জীবের এই আসা যাওয়ার পথ খুলিয়াছে, আর কোন্ অনন্ত কালে উহা বন্ধ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? তবে মোটের উপর ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, ভক্তি ভজনের গুণে কর্ম্ম সূত্র ছিন্ন করিতে না পারিলে, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ না হইলে আর জীব, আসা যাওয়ার পথ-পরিভ্রমণ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না।

এই পরিদৃশ্যমান্ জড় জগত জীবের আসা যাওয়ার পথ। অর্থাৎ এই জড় জগতের উপর দিয়াই জীব সকল, যাতায়াত করিতেছে।

আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের যে সম্বন্ধ এবং এই ভৌতিক জগতের সুখ দুঃখের সহিত, মান সম্ভ্রমের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা সমস্তই এই যাতায়াতের পথে। তুমি রামের পিতা, রাম তোমার পুত্র, সে এই যাতায়াতের পথে। নবীন সুশীলার স্বামী, সুশীলা নবীনের স্ত্রী, সেও এই যাতায়াতের পথে। তুমি রাজা, আমি প্রজা, এই যাতায়াতের পথে। তুমি ধনী, আমি কাঙ্গাল সেও এই যাতায়াতের পথে। তোমার সুখ সম্ভোগ, বিষয় সম্পদ, আমোদানন্দ এই যাতায়াতের পথে। আবার আমার দুঃখ-দুর্দশা, সর্ব্ব-শূন্যতা কিম্বা নিরানন্দ সেও এই যাতায়াতের পথে। তোমার আমার প্রীতি প্রণয় কিম্বা বাদবিসম্বাদ সকলই যাতায়াতের পথে। আমাদের যত কিছু কার্য্য সমস্তই এই পথে।

হাসি খুসিও এই পথে, কান্না কাটিও এই পথে। সুতিকা গৃহ হইতে এই পথের আরম্ভ, আর শ্মশানে গিয়া শেষ। জীবকুল এই পথে বহু কাল হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পথের মধ্যে যে সকল কার্য্য আমাদের কর্ত্তব্য, আর যে সকল কার্য্য অকর্ত্তব্য, তাহা বুঝিয়া লওয়া উচিত। কেননা, পথের কার্য্যটা একেবারে

নিষ্ফল হইবার কথা নাই। সুকার্য্য কুকার্য্য, সকলেরই একটা ফল আছে। জীব দৃশ্য রাজ্যেই হউক, বা অদৃশ্য রাজ্যেই হউক, এই কৃত কার্য্যের ফল ভোগ অবশ্যই করিবে। অতএব সংসার স্বপ্নবৎ হইলেও কর্ম্মফল মিথ্যা নহে। কর্ম্ম সূত্রও সামান্য নহে। কর্ম্ম সূত্রে জড়িত জীবই এই মরজগতে কর্ম্ম ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণ করিতেছে। এই প্রপঞ্চময় সংসার, কর্ম্ম ভোগের ও কর্ম্ম করিবার স্থান। কর্ম্ম শেষ হইয়া যদি কর্ম্ম ভোগের শেষ না হয় তবে জীব মরিয়া গেলেও কর্ম্ম তাহার সহিত গমন করে। কর্ম্ম শেষ হইলেও মানুষ মরিয়া যায়। কিন্তু ভোগের শেষ ইহকালে না হইয়া পরকালেও হইতে পারে।

মর জগতের জীব অবশ্যই মরিয়া যাইবে, সেই জন্য নড়াচড়া করিলেও জীবকে আমার মরা বলিয়া প্রতীয়মান্ হয়। তুমি যদি খুব নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া জগতের সকল গুলি জীবকে মরা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবে দেখিবে, সংসার একটা বিশাল শ্মশান বলিয়া প্রতীয়মান্ হয়। মরার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়। মরার সঙ্গে মরা কথা কহিতেছে, মরায় মরায় বিবাহ হইতেছে, মরার জন্য মরা কাঁদিয়া মাটী ভিজাইতেছে, সব মরার দরবার—মরার কারবার। এক মরা পাল্কী চড়িয়া বসিল, আর কয়েক মরা তাহাকে কাঁধে করিয়া হুঁ হুঁ করিয়া ছুটিল। এক মরা হাকিম আর দুই মরা বাদী ও বিবাদী, কয়েক মরা সাক্ষী আর কয়েক মরা আমলা উকিল প্রভৃতি। বেশ মরার কাছারি বসিয়া গেল। মরা মানুষ গুলির অলীক আমোদানন্দ দেখিলে আমার মনে এক অমানুষীক আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাবিতে থাকি, হায়রে! এগুলি এমন তাণ্ডবকরিয়া মরিতেছে কেন। মরণের কথা বুঝি উহাদের একেবারেই মনে নাই। হরি! হরি!! হরি!!!

যাক্ বাজে কথা,—এখন মরার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। মরা আরও কত মরিবে, কত আসিবে; জন্ম মরণ তো সহজ কথা নহে? এই আত্যন্তিক দুঃখ বিনাশের উপায় কি? যাগ, যজ্ঞ ব্রত, তপস্যা তো মরজগতের মানুষ বিধিমত করিয়া উঠিতে পারে না, কাম-কলুষিত-চিত্ত জীব সর্ব্বদা বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। কঠোর কষ্টসাধ্য তপস্যায় মোটেই অধিকার নাই।

এমতাবস্থায় কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র পরিত্রাণের প্রকৃষ্ট উপায়।

কলির জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন জন্যই নদীয়ায়, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। যদি ইঁহা বহিরঙ্গ কারণ হইয়া অন্তরঙ্গ আরও কোন বিশেষ কারণ থাকিয়া থাকে, তবে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা মাদৃশ জীবাধমের কার্য্য নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মূল কারণ তুমি যাহাই বুঝিয়া থাকো, আমি কিন্তু বুঝিয়াছি, "জীবোদ্ধার।"

যাতায়াতের পথে আমাদের কার্য্য কেবল "নাম সংকীর্ত্তন।" এই মহা-যজ্ঞের দ্বারাই মরার মরণ বারণ হইবার কথা। আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌর ভগবান্ জীবের কল্যাণ কামনায় ঘরে ঘরে—জনে জনে এই ব্যবস্থাই বলিয়া বেড়াইয়াছেন। কলির যুগধর্ম্ম "শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন" প্রবর্ত্তনের জন্যই গৌরাবতার। হরিনামই সত্য আর কিছুই নাই। এই জন্যই তো মহাপ্রভু এবং তাঁহার ভক্তগণ এই মর জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

কাঙ্গালের মনের কথা।

—:০:—

"কোন পথে যাব ?"

বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, নবদ্বীপ রম্য স্থান। নবদ্বীপ শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের লীলা নিকেতন, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের নিত্য আনন্দ পূর্ণ প্রেমের হাট। নবদ্বীপ নিত্য; নবদ্বীপে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, কোন প্রকার জ্বালাযন্ত্রণা কি অভাব উৎপীড়ন নাই। আত্মাভিমান জনিত হৃদয়ের সংকীর্ণতা অথবা স্বার্থপরতার গন্ধ লেশ মাত্রও নাই! আছে কেবল আনন্দ, আর আনন্দ!! আর আছে প্রেমানন্দের পবিত্র

প্লাবন, শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের তুমুল তরঙ্গ, জাহ্নবীর "কুলু কুলু" ধ্বনি, গৌর পরিকরের গম্ভীর গর্জ্জন এবং নিত্য সুখের প্রাণারাম সংস্পর্শ।

নবদ্বীপ চিন্তামণি ধাম। নবদ্বীপের তুলনা নাই। নবদ্বীপের তুলনা নবদ্বীপই। নবদ্বীপ-বিভূতির চিন্ময়ালোকের সন্নিধানে গোলক বৃন্দাবনও ঈষদ্ নিষ্প্রভ। নবদ্বীপ ভুবন-মঙ্গল সংকীর্ত্তন লীলাভিনয়ের রঙ্গভূমি। নবদ্বীপের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, জল, স্থল সকলই নিত্য। সুতরাং নবদ্বীপের প্রজাবর্গ জন্ম মৃত্যুর দায় হইতে সর্ব্বদা বিনির্ম্মুক্ত। ভক্তগণ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্যময়ী লীলাতরঙ্গের প্রচ্ছন্ন প্রবাহে ভাসমান শ্রীনবদ্বীপের উন্নতোজ্জ্বল রস-মাধুরী ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতেও ইচ্ছা করেন না—

"গৌর ভক্ত কভু না চায় বৃন্দাবন।"

নবদ্বীপ সম্পদের এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া, নবদ্বীপ দর্শনের জন্য প্রাণে একটা বেজায় টান পড়িয়া গেল। ইহা আজকালের কথা নয়, বা এক দুই যুগের কথা নয়, বহু যুগ যুগান্তরের কথা।

প্রাণের এই প্রবল পিপাসাটা লইয়া, বহু জন্ম পরিভ্রমণান্তর নবদ্বীপ লাভের উপযুক্ত দেহ লাভ করিয়া, এবার নবদ্বীপের যাত্রী (মানব) হইয়া দাঁড়াইয়াছি। শৈশবে, বাল্যে বিশেষ না বুঝিলেও, যৌবনের প্রারম্ভেই বুঝিয়া লইলাম যে, "আমি নবদ্বীপ যাত্রী।" নবদ্বীপ যাইবার জন্য চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই দুর্ল্লভ নরকলেবর লাভ করতঃ মর জগতের এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

যে সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, "আমি নদীয়ার নিত্য প্রদেশে যাইবার জন্য আসিয়াছি," সে সময়টা চলার পক্ষে খুব উত্তম হইলেও আমার ভাগ্য দোষে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে এক আপাতমধুর মায়ার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার একখানা খুব চক্‌মকিয়া চিত্র দেখাইয়া, মোহ আমাকে আপনার করিয়া লইল। নবদ্বীপ যাইবার কথা ভুলিয়া গেলাম। পুত্র, কলত্ররূপে কতকগুলি শত্রু আমাকে ঐন্দ্রজালিক মোহ মদিরা দ্বারা মাতাল করিয়া সংসাররূপ "ঘানি" ঘুরাইতে নিযুক্ত করিয়া দিল; আমিও অগ্রপশ্চাৎ না বুঝিয়া কলুর বলদের মত দিন নাই—রাত নাই কেবল ঘুরিতে লাগিলাম।

সময় বুঝিয়া কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগণ, ও অহঙ্কারাভিমানাদি দুর্জ্জনেরা আমার প্রিয় পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। শত্রু মিত্র চিনিয়া লইবার শক্তি তখন আমার মোহাভিশয্যে সুষুপ্তির অঙ্কে শায়িতা। শত্রুপক্ষ আমাকে সহায় শূন্য পাইয়া যারপর নাই কষ্ট দিয়াছে, আর ক্ষণ ভঙ্গুর জীবনের অমূল্য সময়টা বৃথা নষ্ট করিয়াছে। পথে যখন আমি এইরূপ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কাল কর্ত্তন করিতেছিলাম, তখনও মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ স্মৃতি বিদ্যুল্লতার ন্যায় আমার পাপ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে মুহুর্ত্তের জন্য বিকাশ পাইত। পাইলে হইবে কি? পরক্ষণেই আবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীবন তরণী ঘোর অন্ধকার সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িত। পথে, মায়ার মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আপাত মধুর অলীক সুখ সম্ভোগের আশায় খাটিয়া খাটিয়া অনেকটা সময় বৃথা অতি বাহিত করিয়াছি।

এইরূপে আসিতে আসিতে যৌবনের শেষ সীমায়, প্রৌঢ়ের প্রারম্ভে আসিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ! এই মোহময় মায়িক জগতের অলীক সুখের অন্তরালে দুঃখ দুর্দ্দশার ভীষণ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে। হায় হায়! করিলাম কি! সুধা ভ্রমে গরল পান করিয়া অকালে কালের হাতে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। আর আমার নবদ্বীপ যাওয়া হইল না। যাহা সুখকর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম, মিথ্যা কথা, তাহা সুখকর নহে, কেবল দুঃখ দুর্ভোগের আকর! এতদিন যাহা সরস ছিল, এক্ষণে তাহা নিতান্ত নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে।

দুশ্চিন্তার মর্ম্মদাহী অগ্নি শিখায় হৃদয়ের মর্ম্মাদানগুলি উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে! এখন আর কিছুই ভাল বোধ হয় না।

স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, সম্পদ বিষ হইয়া উঠিয়াছে! কেবল অবসাদ—কেবল অবসাদ। সম্মুখে শুষ্ক বার্দ্ধক্যের ভীষণ ছায়া, আবার বার্দ্ধক্যের প্রান্ত সীমায় মহা শ্মশান।

সম্প্রতি যে স্থানে আসিয়াছি সে স্থান হইতে যে প্রলয়ঙ্করী শ্মশান বহ্নির মক-স্নেহ-লোলুপ লকলকায়মান্ রসনা দেখা যাইতেছে! হা কৃষ্ণ! এখন উপায় কি? আবার ঘুরাণ চক্রে পড়িলাম নাকি? হরি! হরি! হরি!! কোথায় নবদ্বীপ আর কোথায় আমি।

এবার যদি নবদ্বীপ যাওয়া না ঘটে, তবে তো আমাকে আবার সেই চৌরাশী লক্ষের পথে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। আর কত মরিব।

এইরূপে কিছু কিছু করিয়া আমার মোহাভিভূত হৃদয়ে চৈতন্য আসিতে লাগিল। ভাবিলাম,—হায়! আমি কি করিতেছি! নবদ্বীপ যাইবার জন্য আসিয়া পথে অযথা সময় নষ্ট করিলাম! মিথ্যা স্ত্রী, পুত্র পরিবার লইয়া, বিষয় বিভব লইয়া অকারণে অনেকটা সময় কাটাইয়া দিলাম। অহো! কত কত মোহান্ধ মানব আমার মত ধাঁধায় পড়িয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতেছে। যা'ক বালাই! এখন আর সময় নাই। যাহা হইবার হইয়াছে,—এখন সে সব ছাড়িয়া, নবদ্বীপের পথেই চলিলাম। হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই!! হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

চলিলামতো,—কিন্তু অন্ধের মত। কোন্ পথে কোন দিকে যাইতেছি,—তাহার ঠিক ঠাক্ নাই। কেবল যাইতেছি। "এখন নবদ্বীপের পথ পাইলে হয়,"—মনে এই ভাবনা। বিশেষতঃ আমার সোজা পথের আবশ্যক। যখন সময় নাই। "কোন্ পথে যাব" এই চিন্তাটা বুকে লইয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে কেবল যাইতেছি,—আর পুনঃ পুনঃ পাছের দিকে চাহিতেছি! আশঙ্কা,—পাছে সর্ব্বনাশী মায়া আবার সন্ধান পায়,—আমাকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য, আশা কুহকিনী কোন কুহক জাল বিস্তার করে!! এই সব ভাবিয়া পশ্চাদ্দিকে যেই চাহিলাম,—চাহিয়া দেখি,—সংসারটা একটা ভীষণ রাক্ষস!! আমাকে আবার গ্রাস করিবার জন্য বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া পাছে পাছে ছুটিয়াছে। দেবী রূপিনী মায়া রাক্ষসী আমার মাথা খাইবার জন্য,—স্বকীয় স্বভাব কপটতার আবরণে আবৃত রাখিয়া পুত্র হারা জননীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে।

আশা,—মনমোহিনী বেশে সাজ গোজ করিয়া,—আমাকে মৃদু মধুর আপ্যায়িত বাক্যে ভুলাইবার উপকরণ লইয়া পুনঃ পুনঃ বুকের উপর, মাথার উপর হাত বুলাইবার আশায় আসিতেছে; আর আসিলে হইবে কি? আমার ছোঁয়া পায় কে? আমি এবার বহু কষ্টে, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এই শত্রু দিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি।

পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া আক্রমণকারী শত্রু দিগকে কহিলাম,—"যাও,—ফিরিয়া যাও,—আসিও না,—শিকার ছুটিয়া গিয়াছে। এখন আর আমি নিদ্রিত নাই।"

চৈতন্য লাভ করিয়াছি। তাই চৈতন্যের উদ্দেশ্যে চৈতন্যের দেশে চলিয়াছি। দোহাই চৈতন্যের, তোমরা আমাকে আর নিরর্থক পথে ঘাটে ধড় পাকড় করিওনা। আর করিতে পারিবেওনা? আমি বহু জন্ম তোমাদের দাসত্ব করিয়া এবার একমত খালাস পাইয়াছি।" চৈতন্যের দোহাই মানিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ঝাড়-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া কেবল চলিতে লাগিলাম। সম্বল,—বুকে,—"গোরানুরাগ," মুখে—"শ্রীহরি নাম"

এইরূপ অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া,—আসিতে আসিতে,—অনেক গুলি রাস্তার সম্মিলন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রত্যেকটী রাস্তার মুখে এক একজন পথ প্রদর্শক পাণ্ডা বা বাবাজী দণ্ডায়মান। ইঁহারা নবদ্বীপের যাত্রিদিগকে আপন আপন পথে পরিচালিত করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র। এই বাবাজীদের আর এক উপাধি "শিক্ষা-গুরু।" আমাকে নবদ্বীপের যাত্রী জানিয়া সকলেই খুব আগ্রহের সহিত ডাকিতে লাগিলেন। আমিতো অবাক্— অপ্রস্তুত!! এখন কা'র দিকে যাই! শুনিয়াছি,—নবদ্বীপের পথে অনেক ডাকাইত, সাধুর বেশে বসিয়া থাকে এবং নিরীহ যাত্রীদের পথের গোল জন্মাইয়া কুপথে লইয়া যায়;—পরিশেষে সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িয়া দেয়,— বা প্রাণেই মারে!!

অগত্যা আমি চিন্তাযুক্ত মনে নীরবে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় এক জন পাণ্ডা আমার নিকটস্থ হইয়া স সম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন,—"আসুন মহাশয়! এই পথে আসুন! এটি নবদ্বীপ যাইবার অতি সুন্দর রাস্তা। এপথে কোন উৎপাত উৎপীড়নের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ এই পথে নবদ্বীপ অতি নিকটে।" এই প্রকার সকলেই আপন আপন রাস্তার সুবিধার কথা বুঝাইয়া তাড়াতাড়ি আচ্‌লা অর্থাৎ ঝুল্‌না হইতে এক একখান পরিষ্কার মানচিত্র ও বিজ্ঞাপনী আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন। বাবাজীদের তাগাদায় অস্থির হইয়া আমি আর কোন দিগেই দৃষ্টি স্থির করিতে পারিতেছিনা। কি জ্বালা!! আমাকে লইয়া একটা বিষম টানাটানি লাগিয়া গেল! হা কৃষ্ণ!! এখন কোন্ পথে যা'ব?

এই প্রকার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া আমার গয়ার কথাটা মনে হইল। একবার অনেক দিন হয় গয়ার পথের পাণ্ডারা আমাকে লইয়া এইরূপ

টানাটানি করিয়াছিল। পরে নন্দলাল পাণ্ডার দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।

এই সকল পাণ্ডাদিগের মধ্যে আবার পরস্পর দোষ কীর্ত্তনও আরম্ভ হইল। এবং পরস্পরে পরস্পরের পথের বক্রতা ও দুর্গমণীয়তার বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হা গৌর! তুমি কোথায়? তোমার শ্রীচরণান্তিকে যাওয়াতো সহজ নহে। এযে দেখি পদে পদে বিপদ! "এখন আমার কর্ত্তব্য কি?" এই প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটী দাড়িওয়ালা চিমটা-করোয়া ধারী বাবাজী আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,— "মহাশয়! ভাবছেন কি? আসুন,— আমার পথে আসুন। আমার এই পথে নবদ্বীপ অতি নিকট।" আমি কহিলাম,— "এ পথের কর্ত্তব্য কাজ কি?"

বাবাজী। চারিটি সাধন।

আমি। চারিটি কি সাধন?

বাবাজী। চন্দ্র সাধন।

আমি। চন্দ্র কি? ও তাহার সাধন প্রণালী কি প্রকার!

এই প্রশ্নের উত্তরে বাবাজী আমাকে চন্দ্র ও তাহার সাধনের ক্রম যাহা বুঝাইয়া দিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত চমকিয়া উঠিল,— সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আমি কহিলাম,— "বাবাজী মহারাজ! এই সব কঠিন সাধন আমার দুর্ব্বল দেহে কুলাইবেনা, বিশেষতঃ আমার মনোগত হইতেছে না।"

আমি ও বাবাজী দুইজনে এইরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার করিতেছি,— এমন সময় একজন উক্ত বাবাজীর কথিত পথের ফেরৎ যাত্রী, হাঁফাইতে হাঁফাইতে আমার নিকটস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়! সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! শীঘ্র ফিরিয়া চলুন! এই সর্ব্বনেশে পাণ্ডার প্রলোভনে পড়িয়া কত শত সহস্র নরনারী নরক যন্ত্রনা ভোগ করিয়া মরিতেছে!"

ইত্যবসরে,— আরোও দুই একজন আসিয়া বলিলেন,— "মহাশয়! ফিরুণ,— ফিরুণ,— সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!!

ক্রমশঃ— শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

পতিতের প্রার্থনা।

ওহে কাঙালের ঠাকুর হরি! এত কাঁদিতেছি তবু তোমার প্রাণ গলিল না? এত ডাকিতেছি তবু সাড়া দেও না কেন? অস্থি পঞ্জর ধসিয়া গেল, মাথা কুটিয়া কুটিয়া সারা হইলাম কৈ দয়াময়! তোমার দয়া তো হইল না। এমন ভাবে কাতর প্রাণে যদি পাষাণকে ডাকিতাম সেও উত্তর দিত। আমার এ আকুল রোদনে শ্মশানের নির্জ্জীব প্রাণীও জাগিয়া উঠিত কিন্তু দয়াময় তুমি নাকি চিন্ময়, চৈতন্যময় তবুও এ দীন হীনের কাতর রোদনে জাগ্রত হও না? তুমি দয়ার সাগর হইয়া এ দীনজনের কাতর রোদন শুনিতে পাও না। এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি হরি! সকলি তোমার চাতুরী, সকলি তোমার খেলা। তোমার এ মায়ার খেলা অধম বিষয়-বিমুগ্ধ ঘোর পাতকী কেমনে বুঝিবে। কিছুই হইলনা হরি! মন সতত চঞ্চল, চিত্ত স্থির করিতে পারিলাম না, জীবনের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিলাম না, এমন দুর্লভ মানব জীবন পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা বশে গত হইতে চলিল, কেবল বিষয় বিষয় করিয়া, আমার আমার করিয়া মায়া মোহে মুগ্ধ হইয়া গনা দিন ফুরাইতে চলিল, কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া মরিলাম, প্রভো! কাজের খাটুনি কিছুই হইল না। ধনের অভিমান, জাতির অভিমান, কুলের অভিমান কিছুই ত্যাগ করিতে পারিলাম না, এ অনন্ত ভব সংসারে যে একটি সামান্য কীটানুকীটের তুল্য আমি, এ ভাবনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও হইল না, হায় হায়! কি করিলাম, আপন পরিণাম এক দিনের তরেও ভাবিলাম না; কেবল অনিত্য অর্থ সম্পদে মত্ত হইয়া পরমার্থ তত্ত্ব ভুলিলাম, সুদুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় জয় করিয়া এদেহ রাজ্য আয়ত্ব করিতে পারিলাম না কেবল অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহের দ্বার রক্ষায় সতত সতর্ক হইলাম এদিকে যে দেহ গৃহের নব দ্বার বিমুক্ত রহিল! ছয়ছয়টা ঘরের শত্রুর কাছে পরাস্ত হইলাম, বাহুবলে কত কিনা করিয়াছি শেষে বাসনা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, হায় হায়! করিলাম কি? দেহ রাজ্যে বিদ্রোহিগণকে জিনিতে পারিলাম না। কোন্ বলে বলবান হইয়া তাহাদিগকে স্ববলে রাখিব? সব যে অবশ হইল। কর্ম্ম ফলে যে বল বুদ্ধি সমস্তই হারাইয়াছি ধনের অভিমান

দেহের অভিমানে অভিমানী যখন সামান্য বাসনা রজ্জুর বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলাম্ না তখন ভব বন্ধন বিমোচন করিব কেমন করিয়া। ধিক্‌রে মানব তোর মানব নামের অভিমানে, ধিক্‌রে তোর ধনের গৌরবে।

অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার কুহকে এ সব বিষম রিপু শাসন হইল না বুঝিয়াছি দয়াময়! এ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এ দেহ রাজ্য আয়ত্ব করা সামান্য অস্ত্রের কার্য্য নহে। এ পার্থিব অস্ত্রে বাসনা ছেদন করা হইবেনা এ বন্ধন ছেদনের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র তোমার "অভয় নাম," হরি হে! তোমার বিপদবারণ মধুসূদন নাম লইলে সব দুঃখ দূরে যায়, জানিনা ঐ নামের ভিতর কত সুধা আছে। কিন্তু দয়াময়! তোমার নামে, যদি এত সুধা তবে কেন তাতে আবার মাঝে মাঝে গরলের বিভীষিকা দেখাও? জীবকে সে সুধা, আনন্দের সহিত ভোগ করিতে দাও না কেন? শরতের নির্ম্মল চাঁদ সময়ে সময়ে মেঘে ঢাকা কেন? বুঝিলাম তোমার করুণা ব্যতীত এ দারুণ মায়া পাশ ছিন্ন হইবে না, তাই ডাকিতেছি, হে দীনবন্ধু হরি! এ সাধের ঘর ভেঙে দাও, এ প্রবাসের বসবাস শীঘ্র শীঘ্র উঠাইয়া দাও। পতিতের বন্ধু হে! এ পাতকীর ডাকে আর কবে কর্ণপাত করিবে? যারা সামান্য নদনদীর ঘাটের কর্ত্তা, পারার্থির নিকট অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক পার করাই যাদের ব্যবসা তাহারাও দীনদুঃখী কাঙালের প্রতি দয়া করিয়া থাকে; তবে দীননাথ! আমি অর্থ হীন, সম্বল হীন, পতিত—মহা পাতকী, পারাভিলাষি হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত তুমি এমন পতিত পাবন কর্ণধার থাকিতে কেন আমি পার হইব না, পতিত পামর জনকে পার করাই তো তোমার কার্য্য। লোকে তোমাকে দীনতারণ বলে, তাই বলি হরি হে! কাঙালের প্রতি দয়া করাই দয়ালের কার্য্য আর চিরদিন তাই করিয়া আসিতেছ, আমিও আজ সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া হরি হরি বলিয়া অকূল ভব সাগরের কূলে আসিয়া দাঁড়াইলাম এ দীন হীনকে পার করিতে হইবেই হইবে। দয়াময়! দয়া কর।

দীনাতিদীন—বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য।

পদ-ভিখারী।

চাইনা ঐহিক সুখ, দাও দিবে যত দুঃখ,
নীরবে সহিব নিজ কর্ম্মফল মানি।
কিন্তু হে হৃদয় স্বামি! এই ভিক্ষা মাগি আমি,
ভুলিনা কখন যেন চরণ দু'খানি॥

জীবের মঙ্গল তরে, সৃজিয়াছ দুঃখানলে,
দুঃখ ভোগে এ সংসারে জনমে বিরাগ।
দুঃখিত জনের চিত, হয় দৈন্য বিভূষিত
রাতুল চরণে ক্রমে বাড়ে অনুরাগ॥

অভয় পদ কমল, থাকে যদি সম্বল,
বিমল আনন্দ হৃদে হয় সুপ্রকাশ।
হৃদাকাশে কালশশী উদয় হয় নিশিদিশি
ছিন্ন হয় অনায়াসে ঘোর মায়াপাশ॥

তাই বলি দয়াময়! দীনেরে হ'য়ে সদয়
এই কর যেন মোর মানস ভ্রমর।
বিষয় গরল ত্যজি, তোমার ভাবেতে মজি
পাদপদ্ম মধু রস পিয়ে নিরন্তর॥

শ্রীশশীভূষণ সরকার।

হরের্নামৈব কেবলং।

(পণ্ডিত শ্রীল দেবেন্দ্র নাথ গোস্বামি পুরাণতীর্থ লিখিত।)

"এই কলহ মগ্ন কলিকাল অতিশয় তুচ্ছতর, তাহাতে আবার জীবের জীবিত কালও অত্যল্প। সম্পত্তি ও অল্পমাত্র। বিদ্যা বুদ্ধি ও সেইরূপ। আর এই সংসার মহামোহের লাঞ্চ জনক মহিমাই বা কি বলিব। এই দুরন্ত কলিকালে জীবগণ উক্তরূপ ক্ষুদ্রজীবি হইয়াও মানস মধ্যে গর্ব্বরূপ পর্ব্বত ধারণ পূর্ব্বক সকল ব্যক্তিই বর্ব্বরতা প্রকাশ করিতেছে। মোহময়ী মদিরা পানে সকলেই উন্মত্ত।" হায়! এই দুরন্ত কলিকালে সাধন হীন জীবের উদ্ধার হইবার উপায় কি, কিসে আমরা দুরন্ত সংসার পাশ হইতে মুক্ত হইব, সে ভাবনা আমাদের হৃদয়ে একবার ও স্থান পায়না। অধুনা কি প্রকারে আমরা কিছু অর্জ্জন করিয়া একজন গন্য মান্য সম্পত্তিশালী ও স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া বেশ সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, কোন প্রকার দুঃখই যাহাতে আমাদিগকে অভিভুত করিতে না পারে সকলের হৃদয়েই এই চিন্তা; এবং তজ্জন্যই নানা প্রকার অধ্যবসায়। যাহা আমাদের মানব জীবনের নিত্যব্রত বলিয়া মনে করি, সকলের মূলেই সেই বিদ্যুত-বিলাস-চপলা অনিত্য সুখবাঞ্ছা দেদীপ্যমান। জগৎ সেই তুচ্ছ সুখের জন্যই লালায়িত। একজন দীন দরিদ্র পথের ভিখারি হইতে মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই অনিত্য সুখের কাঙ্গাল। অতি হেয় হীন, দেব সংজ্ঞিত, মহারাজ সংজ্ঞিতেরও এই একই ব্যধি। জ্ঞানী মানী দানী তপস্বীও এই রোগ সমাক্রান্ত। ক্ষণ তরেও কেহ চিন্তা করেন না যে, অপ্রমত্ত মৃত্যুরূপ কৃষ্ণ সর্প আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। সেই কাল সর্পের দুরন্ত কবল হইতে কাহারও নিস্তার নাই। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ মৃত্যুর অধীন। একদিন কৃষ্ণ সর্প দংশনে আমাদের জীবন প্রদীপ নিশ্চয়ই নিভিয়া যাইবে। সেদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণ প্রতিমা এবং তদঙ্গসম্ভব স্নেহের পুতুলগুলি চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া কৃতান্তভবনে অতিথি

হইতে হইবে। হায় হায়! সেই দুর্দ্দিনের জন্যত একবারও ভাবিনা। প্রাণ-প্রতিম সুহৃজ্জনের তদবস্থা দর্শনেওতো আমাদের হৃদয়ে সে ভাবের উদয় হয় না! ছার সংসারে আমরা কেমন আসক্ত? অনিত্য সুখের আশার দুঃখনাশার্থ প্রতি নিয়তই নানারূপ কর্ম্ম করিয়া থাকি। কিন্তু সেই অবশ্যম্ভাবি দুর্দ্দিনের জন্য ভাবি কৈ? ভয়ঙ্কর যম কিঙ্কর যে প্রচণ্ডতাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে দিন দিন আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কি করিলাম। কৈ কিছুই না কেবল সেই বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় চপল সুখের জন্য আকুল প্রাণে ইতস্তত পর্য্যটন করিতেছি। দুঃখনাশ ও সুখ প্রাপ্তিই যদি আমাদের অভীষ্ট এবং দুঃখনাশার্থই যদি জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি, তবে কালসর্পের দুরন্ত কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভাবিনা কেন? কি আশ্চর্য্য! যাহা ভাবিবার বিষয় তাহা ভাবিনা আর যাহা ভাবিবার নয় বা যাহা ভাবিলেও দুঃখ পাই তাহাই ভাবিতেছি। পিপাসিত পথিক যদি পর্য্যাপ্ত সলিলা তটিনী ত্যাগ করিয়া ভেকের ন্যায় কর্দ্দমাক্ত সলিলে আসক্ত হয়, তাহাকি শান্তির জন্য?—না শান্তিময় হৃদয়ে দুরন্ত অশান্তির চিরন্তন নিবাসের জন্য? পতঙ্গ যে প্রজ্বলিত বহ্নির উজ্জলকান্তি দর্শনে লুব্ধ বা বিমুগ্ধ হইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হয়, সে কি আত্মসমুন্নতির জন্য না আত্মনাশার্থ? অজ্ঞজীবের কি অজ্ঞতা, ভ্রান্তি দেবীর কি অপার মহিমা, নতুবা আমরা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে উত্তপ্ত মরুভূমিতে গিয়া জল অন্বেষণ করিয়া সুখবিন্দু প্রত্যাশায় দুঃখ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইব কেন? আহা! ভ্রান্তিরাজ্যের মোহময়ী মদিরার, কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি! ক্ষুদ্র কীটানু কীট হইতে সারাসার-বিচার চারুচতুর-বিদ্বৎকুল-চূড়ামণি পর্য্যন্ত এই প্রমোদ মদিরায় চির মুগ্ধ ওআত্ম বিস্মৃত। ব্যাল গলস্থ ভেকের মক্ষিকা ভক্ষণের ন্যায় কালগ্রস্থ জীবের কি তীব্র বিষয়ানুরাগ? কি ক্ষোভ! আকর্ণ বিস্তৃত সুন্দর ভ্রূযুগ শোভিত নেত্র যুগল বর্ত্তমানেও আমরা জন্মান্ধ। হায়! এই দুরন্ত ভ্রান্তির হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার কি কোনও উপায় নাই? পরমেশ্বর কি ইহার কোনও প্রতিবিধান করেন নাই? তিনি রোগের মত ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন দুর্দ্দম্য মদমত্ত করী বারণ করিবার জন্য অঙ্কুশ, দুস্তর বারিরাশি তরণের জন্য নৌকা, আবার ঘন তিমির বারণার্থ যেমন দীপ শিখার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইরূপ ভ্রান্তজীবের ভ্রান্তি নিবারণার্থ

শ্রীগৌরচন্দ্র পৃথিবীর ভাগ্যে উদয় হইয়া যে মহামন্ত্র হরিনাম ও নিজ ভজন প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, সদ্‌গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ঐ মহামন্ত্রের আশ্রয় লইলেই ঐ দুরন্ত ভ্রান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ হয়। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের অমৃতময় বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস ও তদীয় চরণার্চ্চনাই ভ্রান্তিরূপ ঘন তিমির নিবারণের প্রধান অবলম্বন। অগ্নি সংস্পর্শে যেরূপ কয়লার ময়লাও নষ্ট হয় সেইরূপ গুরূপদিষ্ট মার্গে অখণ্ডিত ব্রত ধারণ পূর্ব্বক ঐ মহামন্ত্র নিয়ত স্মরণ করিলে ভ্রান্তিদেবীও ক্রমে ক্রমে সরিয়া যায়। সুতরাং প্রথমে গুরুকরণ, পরে তৎপ্রদত্ত মহামন্ত্র হরিনাম স্মরণ ইহাই চির প্রসিদ্ধ ভ্রান্তিনাশের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র—যদুক্তং স্বামিপাদৈঃ

"আবৃত্তিশ্রদ্ধাদিকন্তু দুর্ব্বাসনাক্ষয়ার্থং"।

ততশ্চ বাসনাক্ষয়াৎ হৃদয়স্য শুদ্ধিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে)

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অহর্নিশি নামামৃত সেবন করিলে দুর্ব্বাসনা সকলের ক্ষয় ও চিত্ত শুদ্ধ হয় ... কালোক সমীপে অন্ধকারের ন্যায় শুদ্ধ চিত্তে ভ্রান্তি দেবী ... দায় ... র মত পলায়ন না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং মহামন্ত্র ... নাশের প্রধান উপায় ইহাই স্থির। হয়ত অনেকেই এখানে ... রিতে পারেন যে, অজ্ঞান জন্য ভ্রান্তির জ্ঞানই নিবর্ত্তক। কেননা ... বলেন "জ্ঞাননৌর্ব্যসনার্ণবং" "তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিং-শ্রেয়সাধিগমঃ" জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারাই ব্যসনার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলেই জীব পরম পদ লাভে কৃতার্থ হয় অন্ধকারস্থিত রজ্জুখণ্ডে যেমন কদাচিৎ সর্পভ্রান্তি ও তজ্জন্য ভয় হয়, পরে রজ্জু স্বরূপ অবগত হইলে আর যেমন সে ভয় থাকেনা, সেইরূপ শাস্ত্রানুশীলন বা আপ্তোপদেশ দ্বারা আত্ম স্বরূপ অবগত হইলে, অজ্ঞান জন্য ভ্রান্তি অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ, দেহাদি পদার্থে নিত্যতা বুদ্ধিও ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়। তবে গুরূপদিষ্ট মার্গে অখণ্ডিত ব্রত ধারণ ও নিরত নাম স্মরণের আবশ্যক কি? তাহার উত্তর এই যে, জ্ঞান দ্বারা অনুভবাম্বুধি পার হওয়া যায় সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞান ভগবদ্ভক্তি বিহীন শুষ্ক হইলে তাহাতেও অনেক বিঘ্ন লক্ষিত হয়, কেননা শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে হতাদর প্রযুক্ত পুনর্ব্বার তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।

"আরুহ্য কৃচ্ছেন পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"

দ্বিতীয়তঃ ভগবদনুগ্রহ বিহীন বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরও কদাচিৎ বিষয় সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। নৌকা দুস্তর বারি রাশিতরণের হেতু হইলেও যেমন নাবিকের আবশ্যক হয়, তদনুগ্রহ ব্যতিরেকে যেমন পার হওয়া যায় না। সেইরূপ ভগবদনুগ্রহ বিহীন শুষ্ক জ্ঞান দ্বারাও জীব উত্তীর্ণ হয়না। বরং শাস্ত্র জ্ঞান হীন হইলেও তদীয় ভক্তানুগ্রহে তন্নাম স্মরণ ও শ্রীচরণারবিন্দ সেবন দ্বারাই পূত হৃদয়ে আন্তরিক মঙ্গল লাভে কৃতার্থ হন।

সৃষ্টি তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির স্বভাব পরিবর্ত্তনশালী, ইহা অচেতন দৃশ্য ভোগ্য বিষয় এবং ক্ষণকাল মাত্রও পরিনাম গ্রস্থ না হইয়া থাকিতে পারে না :—

"পরিণাম স্বভাবা হ গুণা ন পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" যিনি পুরুষ তিনি চেতন স্বরূপ, অপরিণামী, অকর্ত্তা অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও বিকার শূন্য এবং কার্য্যের কর্ত্তা নয়, গুণাতীত, দ্রষ্টা, ভোক্তা, বিষয়ী, কূটস্থ। পুরুষ প্রাণীদিগের আত্মা স্বরূপ। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। প্রকৃতি যখন সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তখন গুণাতীত পুরুষে উপগত হইয়া থাকে। যখন প্রকৃতি ব্রহ্মে বিলীন থাকে তখন ইহার গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সত্ব, রজ, তম, গুণত্রয় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট এই গুণত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হইলে প্রকৃতির পরিণাম হয়। তখন প্রথমে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে অহঙ্কার তত্ত্ব হয়। অহঙ্কার তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে পঞ্চ তন্মাত্র বা নির্ব্বিশেষে সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের আবির্ভাব হয়।

প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, মন পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ইহা পঞ্চ মহাভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক ইহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্ত, পাদ, বাক, পায়ু, উপস্থ ইহা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইহা পঞ্চ তন্মাত্র। এইরূপ আলোচনার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ এবং মহৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া জীব ও জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। এক ভাগ অহঙ্কার ইহার মধ্য দিয়া জীবের সৃষ্টি অপর ভাগ পঞ্চ তন্মাত্র ইহার মধ্য দিয়া জড়ের সৃষ্টি যথা :—

প্রকৃতি— মহৎ ১ম ভাগ :—অহঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।

২য় ভাগ :— পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চভূত দ্রব্য।

সাংখ্যদর্শন নিরস্বর। ইহার মতে প্রকৃতিই বিশ্ব রচনায় কারণ। পাতঞ্জল দর্শনও পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেণ ইহা ভিন্ন ভগবান পতঞ্জলি আর একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব অঙ্গীকার করেন। ইহার নাম ঈশ্বর তত্ত্ব। এই দর্শনের মতে ঈশ্বর স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

গীতানুসারে প্রকৃতি ও পুরুষ শ্রীভগবানের দুইটী বিভাব, এবং জগতের সৃষ্টি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করেন অপর কিছু নহে। স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন :—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" গীতা ৭।৭

ভগবানের আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি (মায়া) আছে যথা ;—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। ইহারা জড়ত্বহেতু অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া কথিত। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর একটী জীব স্বরূপ পরা বা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে ইহার দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে। অপরা প্রকৃতি অচেতন ও ক্ষেত্র স্বরূপ, পরা প্রকৃতি চেতন ও ক্ষেত্র স্বরূপ। অপরা প্রকৃতি সাংখ্যের পুরুষ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, এই পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়ই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের যোনি এবং তাঁহা হইতে এই প্রকৃতিদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে যথা :—

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" গীতা ৭।৬

বৈশেষিক দর্শন কর্ত্তা মহামুনি কণাদ বলেন, জগতের মূল কারণ পরমাণু ইহা নিত্য, সৎ ও অকারণ। পরমাণুই ঘট পট ইত্যাদির কারণ, তাহার

কিন্তু অপর কারণ নাই। দুইটি পরমাণুর সংযোগ দ্ব্যণুক ও কয়েকটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে স্থূলাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কণাদ ঈশ্বরকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই কিন্তু প্রশস্তপাদাচার্য্য এইরূপ স্থির করিয়াছেন ঃ—

"সকল ভুবন পতি মহেশ্বরের সংহার ইচ্ছা হইলে পরমাণু পুঞ্জের সংঘাত জনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমে ক্রমে বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল চতুর্বিধ পরমাণু সমূহই অবশিষ্ট থাকে। প্রলয় কালের অবসানে প্রাণী দিগের ভোগ সম্পাদনের জন্য মহেশ্বরের আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তখন অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায়ু পরমাণুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয় এবং পরে ক্রমে বায়ু পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান [illegible] উৎপন্ন হইয়া আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে ঐ [illegible] হইতে বৃহৎ তেজঃ এবং জলীয় পরমাণু হইতে [illegible] পার্থিব পরমাণু সংযোগে বিপুল পৃথিবীর উৎপত্তি [illegible] মহাভূত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরের সঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডের [illegible] তন্মধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করেন।" (গৌ[illegible])

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম জগৎ কারণ। জগৎ যাহা হইতে জন্মিয়াছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে ও যাহাতে লীন হইতেছে ও হইবে তাহাকে ব্রহ্ম বলে যথা ঃ— "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।" তজ্জন্য সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ বলেন ঃ— "জন্মাদস্য যতঃ।"

অর্থাৎ জগৎ যাহা হইতে জন্মিয়াছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে ও যাহাতে লীন হইতেছে ও হইবে তাহা ব্রহ্ম। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ কর্ত্তা এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

"যতো যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয় প্রত্যণীক স্বরূপাৎ
সত্যসঙ্কল্পাদ্যনবধিকাতিশয়া সংখ্যেয় কল্যাণ গুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ
সর্ব্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্ত, ইতি সূত্রার্থঃ।"

অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর সকলহেয় গুণের বিপরীত, সত্য সংকল্পাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণ গুণের আকর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হইতে সৃষ্টি স্থিতি

ও প্রলয় সাধিত হয় তিনিই পর-ব্রহ্ম। এই পরব্রহ্ম হইতে জগৎ কি প্রকার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা একবার দেখা আবশ্যক। বেদান্তসারে উক্ত হইয়াছে যে, মাকড়শা যেরূপ আত্মচৈতন্যের প্রাবল্যে নিজোৎপাদ্য তন্তুর নিমিত্ত কারণ ও শরীর দ্বারা উপাদান কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাও নিজ মায়ার * দ্বারা সৃষ্টির উপাদান কারণ ও চৈতন্যের সান্নিধ্যে নিমিত্ত কারণ হন। মাকড়শা স্বচৈতন্যের প্রভাবে ও স্বকীয় শরীরের সন্নিধান প্রভাবে আপনার ভিতরের (অন্তবর্ত্তী) লালা দ্বারা সূত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে, আত্মাও চৈতন্যের সন্নিধান প্রভাবে মায়িক বা প্রাকৃতিক বিকারের দ্বারা বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন সৃষ্টির প্রণালী এইরূপ :—

তমোগুণ-বহুল বিশেষ-শক্তি-যুক্ত বিক্ষেপ শক্তি সৃষ্টি করিবার শক্তি একই কথা) অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে ক্রমান্বয়ে আকাশ, বায়ু, অগ্নি জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশাদিতে প্রকাশ শক্তির অল্পতা ও জড় ভাবের আধিক্য হইবার কারণ এই যে, উহাদের প্রত্যেকের মূল কারণ প্রকৃতিতে (মায়ার) তমোগুণের প্রাবল্য বর্ত্তমান। উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই সেই সকল আকাশাদিতে কারণ গুণের তারতম্য রূপে সত্ত্বাদি গুণ সকল তারতম্যরূপে অনুক্রান্ত হইয়াছে প্রথমোৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থ। সূক্ষ্ম ভূত, তন্মাত্রা ও অপবতীকৃত মহাভূত বলা হয়। এই সূক্ষ্মভূত হইতে জীবের শরীর ও স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

স্মৃতি শ্রুতি পুরাণ দর্শন ইত্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তত্ত্বাদি উৎপন্ন হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু মতে ঈশ্বর তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ। কেবল কপিল ও কণাদ ঈশ্বর তত্ত্বকে চরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাণুই এ জগতের চরমতত্ত্ব। গীতার যুক্তি অবলম্বনে দেখা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ঈশ্বরের দুই বিভাব, এবং কণাদ যদিও পরমাণুকে চরম তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন

* মায়া শব্দের অর্থ অবিদ্যাময়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে।

তথাপি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই বরং সঙ্কেত দ্বারা ঈশ্বর স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষিতি অপ ইহারা যখন কর্ম্ম তখন অবশ্যই ইহাদের কর্ত্তা আছে। সেই কর্ত্তা ঈশ্বর। যথাঃ—

সংজ্ঞা কর্ম্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্। বৈশেষিক।২।১।১৮।

শঙ্কর মিশ্র ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন ঃ—

"সংজ্ঞা নাম, কর্ম্ম কার্য্যং ক্ষিত্যাদি, তদুভয়ম্।
অস্মদ্বিশিষ্টানাম্ ঈশ্বর মহর্ষীণাং সত্ত্বেঽপি লিঙ্গম্।

তাহা হইলে হিন্দুমতে জগৎ ঈশ্বর ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণ প্রতিয়মান হইতেছে। তদনন্তর পাশ্চাত্য মতানুধাবন করিলে দেখা যায় যে, থেইলস্ এনাক্সিমেণ্ডার প্রভৃতি গ্রীক দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ এক অন্তিম উপাদানের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই দৃশ্য জগতে ঐ অন্তিম উপাদান হইতে, ইহার আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্চ তন্মাত্র "ভূতাদি" বা তমকে হিন্দুগণ অন্তিম উপাদান বলিয়া থাকেন।

বেকন বলেন মৌলিক পদার্থ সমূহ স্বয়ম্ভু হইতে পারেন। উঁহারা এক অন্তিম উপাদান হইতে উৎপন্ন।

প্লেটো বলেন ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি মাত্র মৌলিক পদার্থ।

নিউটন বলেন সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর অবিভাজ্য অণুসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা হইতে একই রকমের ও গুণের পদার্থ সমূহ আবহমান কাল সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। সুবিখ্যাত "স্ফূরণ বাদ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ডারউইন সাহেব জড় প্রকৃতির আরাধনা করিয়া জগতের কারণ প্রকৃতিকেই স্থির করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মেধাবী শিষ্য হার্ব্বাট স্পেনসার অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ভিন্ন একজন "অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়" পুরুষ আছেন। হিন্দু ও পাশ্চাত্য মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্য ঋষিদের মত অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঈশ্বরকে জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। মহাজনগণের পন্থা অনুধাবন করিয়া আমরাও বলিব যে ঈশ্বর হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে কি প্রণালীতে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইয়াছে তাহা এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্নের

জীবনী-প্রসঙ্গ।

(৫)

ভক্তি-প্রবন্ধ।

—:০:—

মানুষ আসে, মানুষ চলিয়া যায়, যে যায় তাহাকে আর কেহ জড় জগতে দেখিতে পায় না, তাহাকে চলিতে বলিতে দেখে না; সুতরাং তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু, এমন মনুষ্যও এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহাদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে, কেবল দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও লোক সমাজে তাঁহারা অন্যরূপে বিরাজ করেন। সেটি তাঁহাদের ক্রিয়া বা জীবনী। আজ কোথায় রামপ্রসাদ, কোথায় সাধক হরিদাস, কোথায় ভক্ত তুলসীদাস! যে পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ লইয়া তাঁহারা জন-সমাজে বিচরণ করিতেন সে দেহ কোথায়, কবে,—কোন আকাশের তলে—কোন বৃক্ষ মূলে, মেদিনীর কোন অংশে ধ্বংস হইয়া আবার পঞ্চভূতে গিয়া মিশিয়াছে! কিন্তু তা বলিয়া তো সব ফুরায় নাই। না না,—ফুরাইবে কেমন করিয়া? যাহা অফুরন্ত তাহা কি কখন ফুরাইতে পারে? সেটি কি? সেটি সৎ-চিৎ আনন্দময়, বা আনন্দময়ী ভাবের ঝঙ্কার। পূর্ব্বে দীনবন্ধুর জীবনী প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই বলিয়াছি এ জগতের সর্ব্বত্র এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির লীলা, অহঃরহ চলিতেছে; এ শক্তি বিশ্বের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে, অণুতে-পরমাণুতে, জড়ে-চেতনে, স্থাবর-জঙ্গমে সর্ব্বত্র ভাবের তারতম্যানুসারে লীলা করিতেছে—যিনি এই লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, যে ভাবুক, ভক্ত বা সাধক সুকৃতি বলে, গুরু কৃপায়, ভগবৎ উন্মুখী হইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, প্রতি পলে পলে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায় এই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত হৃদয়ে অনুভব করেন, তাঁহাদের বাহ্যিক আবরণেও সেই ভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহারা এই ভাবে থাকিয়া যে কথা বলেন, যে ছন্দ রচনা করেন, যে সরল প্রার্থনা করেন তাহাতে জীব আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়, জীব শান্তি রস

আস্বাদন করে, জীব আনন্দ ধামের পথের সন্ধান পায়। তাই আজ রাম প্রসাদ না থাকিলেও তাঁহার গান আছে, তুলসীদাস না থাকিলেও তাঁহার রাম-লীলা আছে, আর নরহরি না থাকিলেও তাঁহার সরল প্রার্থনা আছে। আছে কোথায়? কেবল লেখাতে বা পুঁথিতে নয় বিশ্ব জগতের বিশ্ব প্রাণের বিশ্ব প্রেমের সাগরে এক একটি শক্তি কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া আছে। তাই প্রসাদ-পদাবলী এক ছত্র যে কেহ যেমন করিয়া গাহিলেও শ্রোতৃবর্গের প্রাণে ঝঙ্কার উঠে, তুলসীদাসের রাম-লীলা গানে শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণ মাতিয়া উঠে, নরহরির গৌরাঙ্গ প্রার্থনায় পাষাণও গলিয়া যায়। কেন এমন হয়, কেন এ পরিবর্তন লক্ষিত হয়? না, প্রাণ যাহার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে, প্রাণ যাহা খুঁজিতেছে, অথচ সংসারের নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া তাহা পাইতেছে না তাহার অস্ফুট আভাষ যেন ঐ সকলের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। মহৎ জীবনের এমনি মহিমা, সাধু চরিত্রের এমনিই অনন্ত প্রভাব! তাঁহারা যে ভাবে থাকেন, প্রাণে প্রাণে যে ভাব অনুভব করেন, তাঁহাদের কার্য্যেও সেই ভাব প্রকাশিত হয়, আর যে কেহ সেই কার্য্য আলোচনা করেন, তাঁহাদের প্রাণেও সেই ভাবের আকর্ষণ অনুভূত হয়। এইরূপ জীবনই প্রকৃত জীবন, কারণ ইহা অনন্ত! যদি জীবনী-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে হয়তো এই সকল জীবনের পরিচয় যাহাতে ফুটিয়া উঠে, সেই সকল প্রসঙ্গের আলোচনা করাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি।

দীনবন্ধুর জীবন কি ভাবে পরিচালিত হইতেছিল, তাঁহার পরিচয়, তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা আলোচনা করিতে করিতে আমরা "ভক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ গুলির ভিতর একটু উঁকি দিয়া দেখিতে চাই। যদি পাই, যদি সে লেখার ভিতরও তাঁহার সেই উন্নত জীবনের কিঞ্চিত পরিচয় পাই। তা, পাইব বৈকি! পাইবারই তো কথা। কারণ, যিনি যাহা কিছু লিখিয়া যান্ বা রচনা করেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের ভাব গুলির ছাপ পড়িয়া যায়, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তিনি সাধারণের চক্ষে ধরা পড়িয়া যান্। দীনবন্ধুর প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিলে পাঠক তাঁহার সেই উন্নত জীবনের ভাব গুলি ধরিতে পারিবেন। তিনি কি ভাবে ভাবিত হইতেন, সমগ্র দেশ বাসীকে কি ভাবে ভাবিত করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা এই সকল প্রবন্ধের

ভিতর লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যে ভাব নাছাড়িলে, যে ভাবে থাকিলে অনন্ত জীবন, আনন্দময় জীবনের-আস্বাদ পাওয়া যায় দীনবন্ধু সেই ভাব জাগাইবার জন্য যেমন "প্রশ্নোত্তর মালায়" সুগভীর বেদান্ত-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন আবার "ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ" প্রসঙ্গে তেমনি সেই তত্ত্ব সরল ভাবে বিস্তার করিয়াছেন। সে তত্ত্ব আনন্দের অভ্যাস, আনন্দের ধারণা, আনন্দের পথে অগ্রগামী হইবার চিরসহায়। তারপর সংসারী জীবের নিত্য চিন্তাক্লিষ্ট জীবনের অবসাদ দূর করিবার জন্য যেমন তিনি সংসার আশ্রমের প্রথম সোপান কি ভাবে গঠিত হওয়া উচিত তাহা "দম্পতী দর্পণে" প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি আবার শাস্ত্র জ্ঞান হীন অথচ ইংরাজী শিক্ষিত যুবক ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যাহারা পায়না তাহাদের জন্য, তাহাদের প্রাণে ভগবৎ ভাব জাগাইবার জন্য, বিশ্বলীলার মধুর ছন্দের ঝঙ্কার তুলিবার জন্য "লীলারহস্য" প্রকাশ করিতেছিলেন। এই লীলা-রহস্য যে কি পরম পদার্থ তাহা যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভগবৎ লীলার প্রকৃত-রহস্য যে ভাবে প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাহা সাধক হৃদয়েই অনুভূত হয়। সে তত্ত্ব কথা, ব্যাকরণ বিচারে বা আভিধানিক 'অর্থ' নিরাকরণে পাওয়া যায় না। হৃদয়ে অনুভূত না হইলে, প্রাণে প্রাণে সেই ভাব ধারণা করিতে না পারিলে তেমন করিয়া সে তত্ত্বকথা বলা দীনবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হইত কি?

এসকল প্রবন্ধের আলোচনা পরে করিব। কারণ ইহার মধ্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবার সম্ভব আছে। এখানে, কেবল দীনবন্ধুর প্রাণের ভিতর যে ভাব খেলা করিতেছিল, এবং যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি থাকিতেন ও যে ভাবে থাকিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করিতেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিব। সে পরিচয় তাঁহার সরল প্রাণের সরল "প্রার্থনায়" প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভক্তি'র প্রতি সংখ্যায় তিনি প্রথমে এইরূপ একটি প্রার্থনা প্রকাশ করিতেন। কারণ, শাস্ত্র পাঠই বল, আর সাধন ভজনই বল,—সকল কর্ম্মেই ভগবৎ প্রার্থনায় হৃদয়ের বল যাচিয়া লইতে হয়। সরল ভাবে ভগবানকে আহ্বান করিয়া, তাহার উপর তোমার সকল কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়া দেখ সংসারে কি আনন্দ, জীবন কি মধুর; আর সেই জীবনের জীবন প্রাণ বল্লভ কত মধুরতর ভাবে তোমার সম্মুখে নিত্য নব ভঙ্গীতে লীলা করিতেছেন। ভক্ত কবি বলিয়াছেন—

ভক্তি ভক্তি ভক্তি—কহে সর্ব্বজন,
ভক্তি এই, "কৃষ্ণ ব'লে শরণ ক্রন্দন।"

বাস্তবিক তাই। দীন বন্ধু এইরূপে ভক্তি-লতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন আর ভক্তির গ্রাহকদিগকে সেই পথে বিচরণ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেন। তাঁহার আবেগ পূর্ণ প্রাণে যে ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, তাহারই দুই একটি তরঙ্গের পরিচয় লউন। দেখুন, এ সরল প্রার্থনায় প্রাণে ভাবের ঘাত প্রতিঘাত হয় কিনা ;—

* * * * *

"হে সর্ব্বময়! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! বহুজন্ম তপস্যা করিয়া বহুজন্মের প্রার্থনা ফলে, তোমার সাধন ভজনের অনুকূল দেহ পাঁইয়াছি, কিন্তু আপন কর্ম্ম বশতঃ সঙ্গ দোষে কেবল আহার নিদ্রাতেই দিন কাটাইলাম ; মনুষ্য জীবনের যে কি উদ্দেশ্য কিজন্য যে মানুষ সকল প্রাণীর রাজা, কোন গুণে যে দেবগণও মানব দেহকে প্রশংসা করেন তাহা বুঝিলাম না। একবারও সৎসঙ্গের জন্য যত্ন করিলাম না, জানিলাম না যে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি ? না জানিয়া, না বুঝিয়া পদে পদে অপরাধ করিতেছি, অতএব আমার অবিনয় (অপরাধ) ক্ষমাকর। যাহাতে আবার অপরাধে মন বুদ্ধি না যায় তাহা কর। এবং মনকে দমন্ কর, তোমার কৃপাভিন্ন চঞ্চল মনকে স্থির করিবার আর উপায় নাই। হে দয়াময় বিষয় ভোগতৃষ্ণাই আমায় কুকর্ম্ম করাইতেছে, বিষয় বিষকে রসময় বোধে অবিরত পান করিয়া গ্রহগ্রস্তেরন্যায় জ্ঞানহারা হইয়াছি। বিষয় রসের প্রতি তীব্র আসক্তি দূর কর, মনকে চঞ্চল এবং বিষয়াসক্ত বলিয়া "আমি আমার" এই বদ্ধমূল কুসংস্কারে সর্ব্বজীবে দয়ারূপ পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় করিতে পারিনা। তুমি সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান ইহা ধারণা করিবার শক্তি দাও, জীবহিংসা রূপ মহা পাপে যেন লিপ্ত হইয়া অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ না করি।

হে দয়াল! জীবের প্রতি যাহাতে দয়াভাব আসে, নিজের সুখ দুঃখের সহিত তুলনা করিয়া যাহাতে জীবমাত্রকেই ভাল বাসিতে পারি তাহা কর, সংসার সাগর হইতে আমাকে উদ্ধার কর; ঘোর সংসার সাগর নিমগ্ন জীবের একমাত্র তুমিই কাণ্ডারী তোমার কৃপাভিন্ন আর আমার উপায় নাই, দীনের তুমিই এক মাত্র ভরসা॥"

তুমি এক জন, হৃদয়েরধন, দীনবন্ধু দয়ালহরি।
(আমি) মন প্রাণ তাই তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি॥

এ সংসার অকূল পাথার দেখে ভয়ে মরি।
(তুমি) বিপদ বারণ দীনশরণ অকূল কাণ্ডারী॥

দাও অভয় অভয়দাতা, তুমি গুরু তুমি পিতা,
'তুমি বন্ধু তুমিই' আশ্রয় ;—
বিনে তব দয়া নাথ কেমনে বা তরি।
(তুমি) নিজ গুণে দীনজনে দাও চরণ তরি॥

তুমি ধন তুমি জন, তুমি মন তুমি প্রাণ,
তুমি আমার জীবন স্বহায় ;—
নিজ জন জেনে আমি হয়েছি তোমারি।
(আমায়) ভালবেসে লও কোলে হৃদয় বিহারী॥

তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি সাধন ভজন,
তুমি আমার পরাণের পরাণ ;—
হৃদি মাঝে নিশি দিন বিহর হে হরি।
(আমি) প্রেমানন্দে হ'য়ে মগন তোমারে নেহারি॥

ভুলায়ে রেখ না ভবে, ভাবেতে ভাবাতে হবে
ভাবনিধি হৃদয় বল্লভ ;—
সুখে বা দুঃখেতে রাখ যা ইচ্ছা তোমারি ;
(নাথ) তুমি আমার আমি তোমার আর সকলি তোমারি॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষ শেষে বিজ্ঞপ্তি ॥

—:০:—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ॥
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥"

সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণ! একদিন দুইদিন করিয়া দেখিতে দেখিতে সুখ দুঃখ বিজড়িত লীলাময়ের এই লীলা-নিকেতন সংসার ক্ষেত্রে আপনাদিগের অতিশয় স্নেহে প্রতিপালিতা আদরের "ভক্তি" খানি নানারূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আর একটী বৎসরের পূর্ণতা লাভে সমর্থা হইলেন। আগামী ভাদ্রমাসে ইনি একাদশ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বাদশে পদার্পণ করিবেন। আসুন যাঁহার কৃপায় আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও সেই মহতো মহীয়ান্ "ভক্তি"র সেবা কার্য্যে জীবনের যৎকিঞ্চিৎ সময়ও অতিবাহিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, প্রাণ ভরিয়া সেই পরম করুণ শ্রীভগবানের জয় দেই।—

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃস্তবৈঃ।
বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপ নিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ॥
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো।
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায়তস্মৈ নমঃ ॥

বন্ধুগণ! বহু মূল্যবান যন্ত্রও যেমন যন্ত্রীর অভাবে আপনা আপনি বাজিতে পারে না, যন্ত্রীর ইচ্ছায়ই যেমন সে নানাবিধ সুরতানে বাদিত হইয়া শ্রবণ পিপাসু জনগণের পিপাসার শান্তি করতঃ তাঁহাদিগকে আনন্দদানে, সক্ষম হয়, জীবও সেইরূপ আপন ইচ্ছা দ্বারা অহং শক্তিবলে কিছুই করিতে পারেনা; সেই বিশ্বজীব-জীবন শ্রীভগবান যন্ত্রীরূপে জীবের হৃদয়ে থাকিয়া, যখন যে ভাবের কর্ম্ম করাইতে ইচ্ছা করেন জীবরূপ যন্ত্র তখনই সেইরূপ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। আমরাও আজ এগার বৎসর যাবৎ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের প্রেরণায় নানা প্রকার সুখ দুঃখের আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভক্তির প্রচার দ্বারা যে ভক্তগণকে কথঞ্চিত আনন্দদানেও সমর্থ হইয়াছি, ইহাতেও আমাদের অহঙ্কার

করিবার কিছুই নাই। যত মূল্যবান যন্ত্রই হউক না সে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিহীন, জীবও তদ্রূপ যন্ত্রীরূপী শ্রীভগবানের হস্তে স্বাধীনতা বিহীন কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ। তাই কোন ভক্ত ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া জীবের স্বরূপ অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন।

"পুতুল বাজির পুতুল আমরা, যেমন নাচায় তেম্‌নি নাচি।
যখন মারে তখন মরি, যখন বাঁচায় তখন বাঁচি॥
নাচি গাই তার তালে মানে,
ভাল মন্দ সেই সে জানে,
তাঁর যা ভাল লাগে প্রাণে সে ভালর নাই বাছাবাছি॥
তাঁরি জোড়ে যত জারি,
কেউ বা জিতি কেইবা হারি,
যা করে এক তারের তারি, তাঁরি তারে বাঁধা আছি॥
বসায় বসি উঠায় উঠি,
লুটায় লুটি ছুটায় ছুটি,
ঠিক্ যেন তাঁর পাশার গুটি, পাকায় পাকি কাঁচায় কাঁচি॥

কিন্তু জীব ইহা বুঝিতে পারে কি বুঝিতে না পারিয়াই তো মোহ মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া, অহংকর্ত্তা সাজিয়া দুঃখ পায়।

সুখ দুঃখের ক্রীড়া নিকেতন, নানাবিধ প্রলোভনময় এই জগৎ সাধকের পক্ষে কষ্টি পাথরের ন্যায়। কষ্টি পাথর যেমন পরীক্ষার দ্বারা সুবর্ণের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতার প্রমান দেয় এই জগৎ সংসারও নানারূপ রোগ, শোক, বিপদাপদাদি দ্বারা সাধকের নির্ভরতা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে ক্রমোন্নতীর সোপানে আরোহণ করায়। সাধককে নানারূপ প্রলোভনে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে যে, সে কতদূর উন্নত হইয়াছে,—কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রকার জাগতিক পরীক্ষায় সাধক যতই উত্তীর্ণ হইতে থাকে ততই তাহার আন্তরিক বল বৃদ্ধি পায় ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মায় এবং ততই তাহার মায়িক বন্ধন শিথিল হইতে থাকে। জীব যদি বিপদে অধৈর্য্য বা সম্পদে প্রমত্ত না হইয়া অকপট প্রাণে সেই সর্ব্বকারণ কারণ পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে তাহা

হইলে তাহাকে আর এই নশ্বর সুখ দুঃখের নিদারুণ ঘাত প্রতিঘাতে অভিভূত হইতে হয় না।

জীব মাত্রই যে সুখের জন্য লালায়িত তাহা সামান্য আলোচনার দ্বারাই আমরা বেশ বুঝিতে পারি। আর সকলেই যে, নিরন্তর সুখের জন্যই নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছে তাহাও আমরা দেখিতে পাই কিন্তু তবু কেন যে সুখ পাইতেছে না, কেন যে দুঃখের দারুণ কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে, কেন যে জীব আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া এমন দেব দুর্লভ জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিতেছে তাহাকি একবারও আমরা ভাবিয়া দেখি ?

কি করিলে জীব সদানন্দে থাকিতে পারে, কি করিলে জীব আপন স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হয় তাহা সকলেরই আলোচ্য।

প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন,—“শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ” অর্থাৎ জীব অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী। জীব মাত্রেই যখন সেই আনন্দময়ের অংশ তখন কেন উহারা আনন্দের অধিকারী হইবে না? শ্রীভগবানের বিশেষণ সচ্চিদানন্দ তিনি আনন্দময়, আর এই মানব জীবন সেই আনন্দময়ের আনন্দ দান। কিন্তু আমরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অন্তর বাহির চতুর্দ্দিকই দুঃখময় বলিয়া দেখিতেছি একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, সেই সচ্চিদানন্দের সুপবিত্র আনন্দ ধারায় ত্রিভুবন প্লাবিত, চারিদিকেই সেই আনন্দময়ের আনন্দ উৎস ছুটিয়াছে এবং আমাদের এই আনন্দময় ক্ষুদ্র জীবন তরণী খানিও সেই সুমহান আনন্দের স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে।

এই ভাবে আপন স্বরূপ অবগত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানোপার্জ্জন প্রয়োজন সেই জ্ঞান সদ্‌গ্রন্থ পাঠে ও সৎসঙ্গ এবং সাধন তত্ত্বের আলোচনা দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল সময় সৎ অর্থাৎ সাধু ব্যক্তির সঙ্গলাভ সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহাতে সকলেই সহজে ঘরে বসিয়া সদালোচনা রূপ সৎসঙ্গ দ্বারা মনকে স্থির করিয়া নিজে নিজেও নিজ অভিপ্সিত পথে চলিতে পারেন এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকেও সৎপথে আনিয়া প্রকৃত আনন্দের অধিকারী করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভক্তি পত্রিকার সৃষ্টি। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও অসদালোচনা যে মানসিক চঞ্চলতার একমাত্র

কারণ এবং ঐ মানসিক চঞ্চলতার জন্যই যে আমরা ভগবৎ ভক্তিলাভে বঞ্চিত ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, আর সৎসঙ্গ ও সদ গ্রন্থাদির আলোচনার দ্বারাই যে তামসিক চঞ্চলতার নিবৃত্তি হইয়া ভগবদ্ভাব লাভ হয় ইহাও সর্ব্বথা স্বীকার্য্য ।

এই সকল মহদুদ্দেশ্যসাধন মানসেই এই ভক্তি প্রচার আরম্ভ হয় । মানব জীবনের অমূল্য সময় যাহাতে বৃথা হাস্য পরিহাসে নষ্ট না হয় তাহাই এই ভক্তির লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধন জন্যই আজ এগার বৎসর যাবৎ ভক্তি প্রচারে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিয়া আসিতেছি, তবে বলিতে পারি না গ্রাহকবৃন্দের অতি লালিতা পালিতা এই ভক্তি আপন উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে সে বিষয় আমাদের আলোচনার প্রয়োজনও নাই তাহা ভক্তগণই করিবেন । আজ ভক্তির ১১শ বর্ষ পূর্ণ হইল আগামী ভাদ্র হইতে ১২শ বর্ষ আরম্ভ হইবে এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা ভক্তির গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, পরিদর্শক মহোদয়গণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া এবং তাঁহাদের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা আগামী বৎসরের জন্য নবোদ্যমে নবোৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিলাম। গ্রাহকগণের সহানুভূতি পাইলে আমরা আগামী বৎসর হইতে ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি ও অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেও কুণ্ঠিত হইব না ।

পরিশেষে আমার সবিনয় নিবেদন ; গ্রাহক মহোদয়গণ যেরূপ ভাবে এই এগার বৎসর যাবৎ আপনাপন উদারতার পরিচয় দানে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন, আশা করি আগামী বৎসর ও তদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। লেখকগণও যেরূপ প্রকার এই এগার বৎসর যাবৎ নানারূপ প্রবন্ধরত্নাবলিদ্বারা শ্রীভক্তি দেবীকে সুসজ্জিত করিয়া আসিতেছেন আশাকরি আগামী বৎসরেও তদ্রূপ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিবেন। যাহাতে বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে ভক্তির প্রচার হয় তাহা করিয়া কার্য্যের সহায়তা করিলে বিশেষ বাধিত হইব ।

বিনীত

"সম্পাদক"

ক্রটী স্বীকার ।—নিজের শারিরীক অসুস্থতা এবং ছাপাখানার নানারূপ গোলযোগ ও শিথিলতায় এ বৎসর কয়েক মাসের পত্রিকা যথাসময় বাহির

করিতে পারি নাই, তজ্জন্য কেহ কেহ অনুযোগ করিয়া আমাদিগকে পত্রাদি দিয়াছেন আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। এবং আগামী বৎসরে যাহাতে যথানিয়মে পত্রিকা প্রকাশ হয় তাহারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, এক্ষণে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ।

একি ভয় অকারণ !*

—:০:—

একি ভয় অকারণ হৃদয়-কম্পন,
উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ তীব্র, তাপ নিদারুণ,
সহি সদা, ওহে কৃষ্ণ জীবন-জীবন!
করে কি চঞ্চল চিত্ত মায়ার ত্রিগুণ!

নাহি শান্তি ক্ষণমাত্র নাহিক বিশ্রাম;
বারেক বসিয়া স্থির, তব শ্রীচরণ
সর্ব্বতাপ নিবারণ নিত্য-সুখ ধাম,
না পাই ভাবিতে ক্ষণ, জুড়াতে জীবন!

ওই গেল—ওই গেল!—কাটি স্নেহ পাশ
কে বুঝি, প্রাণের প্রাণ ভ্রমে ভাবি যারে,
পলাইল—পলাইল—!—ফুরাইল আশ!
শিহরি এ ভয়ে শুধু চাহি চারিধারে।

কোথাও কিছুই নাই তাপের কারণ,
কল্পনা করিয়া তবু কত কথা আনি

* গ্রামে সম্প্রতি মারিভয় হওয়ায়, জনৈক ভীত সংসার-বদ্ধ মায়িক জীবের উক্তি।

চিন্তার অনল জ্বালি অন্তরে বিষম ;
জ্বলি সে সন্তাপে কবে ছট ফট, প্রাণী।

ভুলিয়া তোমারে, ভুলি তোমার চরণ
কালভয় হয় হরি, শান্তির আলয়,
কি ক'ব যন্ত্রণা কত সহি অনুক্ষণ ?
জানিয়াও মূল তত্ত্ব না জানি নিশ্চয়।

যা' কর তুমিই হরি, সর্ব্বমূলাধার ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, ইচ্ছা তোমারি প্রবল
করে কার্য্য সুনিয়ত অলক্ষ্যে সবার ;
সাক্ষাৎ যা' কিছু হেরি, নিমিত্ত সকল।

উদ্ভব বিলয় স্থিত, জীবন মরণ,
শুভ বা অশুভরূপে শুভ অন্যতর,—
যা' কিছু অজ্ঞানে জ্ঞানে করি দরশন,
সবার কারণ মূল তুমি সর্ব্বেশ্বর !

অতি ক্ষুদ্র কৃমি ওই, পবনে চঞ্চল,
সহিতে পরশ মম নাহি শক্তি যায়,
অতি ঊর্দ্ধে তাহা হ'তে বিধি আখণ্ডল—
সবারি প্রকাশ নাশ ইচ্ছায় তোমার !

তুমি রাখ যারে কৃষ্ণ, কুলীশ করাল
তৃণ তুল্য হয় তুচ্ছ তাহার সকাশে ;
তোমার ইচ্ছায় যার শেষ আয়ু কাল
ধরে তৃণ বজ্রবল তাহার বিনাশে।

তুমিই—তুমিই এক সর্ব্বশক্তিমান্,
নিদান-নিদান কৃষ্ণ ! এ বিশ্বভুবন
ওতপ্রোত তোমাতেই করে অবস্থান ;
মুক্তি মুক্তি তোমারই রাতুল চরণ।—

স্মরি শ্রীচরণ তাই ডাকি হে কাতরে,
দূর কর এই তাপ ভয় অকারণ ;
তোমার শ্রীপাদপদ্ম ভাবিয়া অন্তরে
গাহি অনুদ্বেগে তব নাম সঙ্কীর্ত্তন।

হোক্ পূর্ণ তব ইচ্ছা, ওহে ইচ্ছাময় !
মঙ্গল-আলয় তুমি, সুহৃদ্ পরম !
বৃথা চিন্তানলে দগ্ধ কেন এ হৃদয় ?
দাও হে ভাবিতে মোরে তোমারি চরণ।

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়,

শ্রীকৃষ্ণপুর।

বৈষ্ণব স্ত্রী কবি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামী মহোদয় লিখিত।)

—:০:—

শ্রীমতী মাধবী দেবী রচিত উড়িয়া ভাষার পদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পদ কল্পতরু ও পদ সমুদ্রতে তাহার রচিত বাঙ্গালা পদ দুই একটি আছে। এই বৈষ্ণব স্ত্রী কবি রচিত পদাবলী সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। ক্রমশ শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমতী মাধবী দেবী সার্ব্বভৌমের গৃহে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেন। তাঁহার দুই ভ্রাতার সঙ্গে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক, দূর হইতে প্রভুকে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা মুরারিও তাই করিয়াছিলেন। প্রভুকে একবার দর্শন মাত্র পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আত্ম সমর্পণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বিশেষ সুকৃতির ফল না থাকিলে এ সৌভাগ্য ঘটেনা। কয়েক জনের মাত্র এই পরম সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। দয়াল

ঠাকুর ভাই ভগ্নীর প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন। কি করিয়া, তাহা বলিতেছি শুনুন। মুরারী ও মাধবী গৃহে আসিয়া তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আনন্দে গদ গদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা! তুমি প্রভুকে কেমন দেখিলে?" শিখি মাহাতি উত্তর দিলেন "পরম রূপবান, পরম ভক্ত সাধু পুরুষ।" ইহাতে মুরারী ও মাধবীদেবীর মনে ব্যথা লাগিল। কারণ ইঁহারা প্রভুকে পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন বলিয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, শিখি মাহাতি তাঁহাকে সাধু পুরুষ পরম ভক্ত বলিলেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে ব্যথা লাগিবারই কথা! মাধবী দেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "দাদা! তুমি ও কথা বলিও না। তিনি যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব। তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?" শিখি কহিলেন "জীবে ঈশ্বর জ্ঞান মহা পাপ! তিনি সন্ন্যাসী। তোমাদের ভক্তির পাত্র হইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে জগন্নাথ বা শ্রীকৃষ্ণ বলিলে অপরাধী হইতে হইবে।" শিখি মাহাতির এই কথায় মাধবীদেবী ও মুরারি মনে বড় কষ্ট পাইলেন। তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন "দাদা! তোমার এরূপ কুবুদ্ধি কেন হইল? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া জগন্নাথদেবের সহিত মিলিত হইবেন। তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে চিনিতে পারিলেনা?" শিখি মহাতি বিষম বিপদে পড়িলেন। দুই ভ্রাতা ও ভগিনীতে বিশেষ প্রণয় ছিল। এই বিষয় লইয়া সেই চিরকালের প্রণয় ভঙ্গ হইল। তাহাদের ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ঘটিল। শিখি মাহাতি ভাবিতে লাগিলেন এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া তাঁহার ছোট ভগিনীটির মাথা খাইয়া দিলেন, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিলেন আর এই বিষম ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। শিখি যাইতেন না। মনে মনে তাঁহার প্রভুর উপর বিষম রাগ হইল। এদিকে মুরারি ও মাধবী গৌর-গত প্রাণ হইয়া দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে তাহাদের জ্যেষ্ঠকে সৎপথে আনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ কমলে অর্পণ করিবেন তাই ভাবিতে লাগিলেন। ওদিকে শিখি মাহাতি জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাইয়া দুটি বেলা মাথা কুটিতে লাগিলেন "প্রভু! আমার অবোধ ভ্রাতা ভগিনীকে সুমতি দাও। তাহারা জীবকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। তাহারা অজ্ঞান, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা কর।" এইরূপে দিন যায়। এক

দিন শিখি মাহাতি নিশিশেষে স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া মুরারী ও মাধবীকে ডাকিতে লাগিলেন। দুই ভ্রাতা ও ভগিনী দ্রুতবেগে শয্যা হইতে উঠিয়া জ্যেষ্ঠের গৃহে যাইয়া দেখেন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া ব্যাকুল নয়নে কান্দিতেছেন। প্রথমত তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে হৃদয়ের আবেগে কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন শিখি মুরারী ও মাধবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তোমাদের অনুরোধে আজি স্বপ্নে আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন" এই বলিয়া আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলে। তখন দুই ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিয়া তাঁহাকে সান্তনা করিয়া কহিলেন "দাদা! কি স্বপ্ন দেখিয়াছ খুলিয়া বল। শুনিতে আমাদের মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" এতক্ষণে শিখি প্রকৃতিস্থ হইয়া অপূর্ব্ব স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে ধীরে ধীরে বিগ্রহের শরীরে প্রবেশ করিলেন। পুনরায় বাহির হইলেন। এইরূপ বারম্বার করিলেন। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। ইহা দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ আমার দিকে চাহিয়া একটু মধুর হাস্য করিলেন। আমার বড় ভয় হইল। তাহার পর দেখি তিনি ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিয়া মধুর স্বরে কহিলেন "শিখি তুমি মুরারী ও মাধবীর অগ্রজ। এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। এই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।" এই বলিতে বলিতে শিখি মাহাতির মূর্চ্ছা হইল তিনি মাধবী ও মুরারীর ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। মুরারী ও মাধবীর আজি আনন্দের সীমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটিকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধ শুনিয়াছেন। এই জন্য ইহাদিগের বড় আনন্দ। কতক্ষণ পরে পরামর্শ করিয়া জগন্নাথ দর্শনে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড় স্তম্ভের পার্শে দাঁড়াইয়া আছেন। সেখানে যাইলে তাঁহার দর্শন পাইব। এই বলিয়া মাধবী ও মুরারি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিখি মাহাতির হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন। শিখি চতুর্দ্দিকে গৌরময় দেখিতেছেন। তিনি কলের পুত্তলিকার ন্যায় কান্দিতে কান্দিতে তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে চলিলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন প্রভু প্রেম-বিহ্বল চিত্তে জগন্নাথ

দর্শন করিতেছেন। প্রভুর নয়ন দ্বয় দিয়া শতধারা পড়িতেছে। গরুড়স্তম্ভের নিকট যে গর্ত্তটী আছে, প্রভুর নয়ন জলে তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুরারী মাধবী ও শিখি দূরে দাঁড়াইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এমন সময়ে প্রভুর দৃষ্টি হটাৎ শিখি মাহাতির উপর পতিত হইল। তিনি শিখিকে মধুর বচনে কহিলেন "তুমি মুরারী ও মাধবীর অগ্রজ। এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া দুই বাহু প্রসার করিয়া প্রভু শিখি মাহাতিকে দৃঢ়ালিঙ্গন করিলেন। শিখির প্রতি লোমকূপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ময় মূর্ত্তি প্রবেশ করিল শিখি অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। মুরারী ও মাধবী নিকটে বসিয়া জেষ্ঠের সৌভাগ্য দেখিতেছেন আর আকুল নয়নে কান্দিতেছেন। ক্ষণকাল পরে শিখির বাহ্য জ্ঞান হইল। তিনি সমগ্র জগত গৌরময় দেখিতেছেন। গৌর ভিন্ন তাঁহার চক্ষে অন্য কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না। তখন শ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সেই অবধি শিখি মহাতি আর শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে ছাড়িলেন না। "সাড়ে তিন জন" প্রভুর প্রেম পাত্র ছিলেন। তাহার মধ্যে শিখি মাহাতী একজন। মাধবীদেবী ও মুরারীর কৃপায় শিখি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রিয় জন হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এমনি কৃপা। তিনি ভক্তের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গকে ও কৃপা করেন। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ ভক্তি বহির্ম্মুখ পাষণ্ডী থাকেন, তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের কৃপা কটাক্ষ হইতে বঞ্চিত হন না। এমন দয়াল প্রভু আর কি আছে? সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জামাতা, আর মাধবীর ভ্রাতা শিখি মাহাতি প্রভুর এরূপ কৃপাকটাক্ষের দৃষ্টান্ত দিল।

বরষ অন্তে।

—:০:—

বরষ হইল সমাপন।
গৌর বল ভরিয়া বদন॥ ধ্রু॥

১

প্রভুর বল্লভা "ভক্তি," যেই পরা অনুরক্তি
দেবে যাহা করে আকিঞ্চন।

আজি পত্রিকার বেশে, ভ্রমিছেন দেশে দেশে
বিলাইয়া অমূল্য রতন॥

২

কালের প্রবাহ মাঝে, কতই মূরতি রাজে
জীব হিত যাঁহাদের কায়।
তার মাঝে ভক্তি দেবী, গৌরাঙ্গ চরণ সেবী
সকলের মন অভিরাম॥

যে অবিদ্যা হ'তে নর, পায় ক্লেশ জন্মান্তর
দেবী, সুচুস্তর কহে যায়।
মাত্র ভক্তি কৃপা হ'তে, পারে নর পার হ'তে
এ সংসার গোষ্পদের প্রায়॥

৪

রসরাজ মহাভাব, যেই পরা প্রেম ভাব
তত্ত্ব নাহি যাহার উপর।
রাইয়ের বরণ সেই, শ্যামের গঠন যেং
শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি সুন্দর॥
সর্ব্ব উপাসনা যায়, পরিপূর্ণ ভাব পায়
সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা যাহাতে পুরণ।
যাহা পেলে অন্য লাভ, জ্ঞান নাহি হয় লাভ
পূর্ণামৃত যাহে আস্বাদন॥
জীবের পরাণ নাথ, মিলাইতে তাঁর সাথ
ভক্তি বিনা নাহিক উপায়।
আমাদের এই ভক্তি" প্রচারি সে অনুরক্তি
একাদশ করিলেন সায়॥

৫

একাদশী সুবালিকা ভাবুকের সুবোধিকা
ভকতের স্নেহেতে পালিতা।

ভকতের আরাধনে, সমুদিত এ ভবনে
সুধা ধারা করিতে প্লাবিত।

একাদশ বর্ষ শেষে, কত কথা মনে আসে
সেই সে জনম দিন হ'তে।
শ্রীআচার্য্য দীনবন্ধু, আরাধি করুণাসিন্ধু
লভিলেন "ভকতি" জগতে ॥

৭

পুণ্য দীনবন্ধু স্মৃতি, সুজড়িত এ "ভকতি"
যাঁহার এ যতনে পালিত।
কোথা ভক্ত মহারাজ, আজি ভকতির সাজ
দেখ দেব তব আকাঙ্খিত ॥
কৈশোর যৌবন মাঝ, দেখ তব ভক্তি আজ
পল্লবিত পুষ্পিত মধুর।
যাহারি শীতল ছায়ে, যাহার শীতল বায়ে
গৌড় ভক্ত জুড়ায় প্রচুর ॥

৮

তব আশীর্ব্বাদ কণ, করিয়াছে আকর্ষণ
দেখ কত দীনবন্ধু আজ।
"সত্যানন্দ" "নিত্যানন্দ" "রসিক" অমৃত বন্দ
ভক্তি সেবা যাঁহাদের কাজ ॥
অভিন্ন গৌরাঙ্গ তনু,— নিত্যানন্দ প্রেম অনু
পূত সেই বংশেতে উদয়।
যাঁদের যতন পেয়ে, "ভক্তি" আজি ভক্তিলয়ে
ভক্ত হৃদে সুধা বরিষয় ॥

৯

ভক্তিরস পুষ্টিকারী, যাঁরা ভক্তি অধিকারী
"ভক্তি" অঙ্গন যাদের মণ্ডন।

তাঁহাদের বার বার, সাথে দেই জয় কার
"ভক্তি হোক তাঁদের জীবন ॥"

১০

"ভক্তির" গ্রাহক গণ, রসিক ভাবুক জন
ভবে ধন্য তাঁদের জনম।
যাঁদের তরে ভক্তি, ধাইতেছে ইতি উতি
বিলাইয়া অমূল্য রতন ॥

১১

গৌর ভক্ত কে কোথায়, "ভকতি" যাঁদের চায়
থেকোনা থেকোনা দূরে আজ।
ভকতির পুষ্পমালা শোভিত করহ গলা
ভক্তি পা'ক ভকত সমাজ ॥

১২

"ভকতির" পথে যত, বাধা আছে শত শত
সেই বাধা কিছু নাহি গনি ॥
ভক্ত সং ইচ্ছা যেই, ভক্তির জীবন সেই
গৌর যার হৃদয়ের মনি ॥

১৩

বড় সাথ এ ভকতি, দেখি গৃহে গৃহে সতি
কলির কলুস করি দূর।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম ফল, জীবে দি'চ সুমঙ্গল
মোহের স্বপন করি চুর ॥

শ্রীরামচন্দ্র সেন।

তপস্বী সত্যবাগ্‌ধীরো ধর্ম্মাত্মা ত্রাতি সংসৃতিম্।
বিষ্ণুর্চ্চাবিধিং জ্ঞাত্বা সদানন্দময়োদ্বিজঃ॥৫১॥

অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ হইতে পরিণিতা ব্রাহ্মণী ভার্য্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভাধানাদি সর্ব্ববিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, যিনি সন্ধ্যাত্রয়ে গায়ত্রীজপ ও নিত্য পূজা করিবেন, যিনি তপস্বী, সত্যবাদী, বীর এবং ধর্ম্মাত্মা, তিনিই বিষ্ণুপূজা বিধি পরিজ্ঞাত হইয়া সদানন্দময় থাকেন এবং অপার সংসার সাগর হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করেন॥৫০॥৫১॥

তথাহি (বৃহদ্ধর্ম্ম পুং উঃ খঃ ২য় অং ৪৪—৫৬ শ্লোং)—

ব্রাহ্মণস্যতু দেহোহয়ং ন সুখায় কদাচন।
তপঃ ক্লেশায় ধর্ম্মায় প্রেত্যঃ মোক্ষায় সর্ব্বদা॥৫২॥
ব্রাহ্মণে কল্মষং নাস্তি সন্ধ্যোপাসন কারিণি।
যথা সূর্য্যে তমো নাস্তি তমো বারণ কারিণি॥৫৩॥
ব্রাহ্মণা ভূসুরাঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
ন ক্রৌর্য্যং ব্রাহ্মণেযুক্তং প্রভাহীনো রবৌ যথা॥৫৪॥
নাল্পেন তপসা জীবো জায়তে ব্রাহ্মণে কূলে।
সচেন্নীচ ক্রিয়া কারী আত্মহা কোহপরস্তথা॥৫৫॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুংক্তে সমগ্রং স্বং দদাতি চ।
তদ্দানানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ॥৫৬॥
ব্রাহ্মণস্য ধরা সর্ব্বা ধর্ম্মশ্চ নিখিলা অপি।
যদ্ ব্রাহ্মণোহপি গৃহ্নাতি তচ্ছেষং ক্ষত্রিয়াদয়ঃ॥৫৭॥
ব্রাহ্মণা লোক পিতরো ব্রাহ্মণ্যো লোক মাতরঃ।
যেষাং পাদ প্রসূতানি সর্ব্বতীর্থানি নিত্যশঃ॥৫৮॥
আদি রাজো মনুঃ পূর্ব্বং মর্য্যাদাং সমকারয়েৎ।
ব্রাহ্মণানাং সতীনাঞ্চ গবাঞ্চ রক্ষণায়হ॥৫৯॥
ব্রাহ্মণাশ্চ স্ত্রিয়োগাশ্চ পুষ্পেণাপি ন তাড়য়েৎ।
বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা॥৬০॥
এষহি ব্রহ্মবন্ধুনাং দেহে নান্যোহস্তি দৈহিকঃ।
যাবদ্‌গো ব্রাহ্মণাঃ সন্তি তাবৎ পৃথ্বীচ সুস্থিরা॥৬১॥

তস্মাৎ পৃথ্বীরক্ষণার্থে পূজয়েদ্ দ্বিজ গো সতীঃ।
স্ত্রিয়ো গাবো ব্রাহ্মণাশ্চ পৃথিব্যা মঙ্গল ত্রয়ম্,
এতেষাং দ্বেষকৃদ্‌যস্ত স মঙ্গল পরিচ্যুতঃ ॥৬২॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ গায়ত্রী স্ত্রীনাঞ্চ রজ আর্দ্রবম্।
গবাং স্বভাবঃ পাপানাং মহতাঞ্চ বিনাশকম্॥৬৩॥
বিপ্রাণাং চরণৌ তীর্থং গবাং পৃষ্ঠং তথাশুচি।
স্ত্রীণাং সর্ব্বানি চাঙ্গানি তীর্থান্যুক্তানি সূরিভিঃ ॥৬৪॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দেহ কখনই সুখ ভোগের নিমিত্ত নহে, * উহা কেবল তপঃ ক্লেশ, ধর্ম্মাচরণ এবং পরিণামে কৈবল্য মুক্তির জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৫২॥ যেরূপ অন্ধকার বিনাশকারী দিবাকরে অন্ধকার থাকিতে পারেনা, সেইরূপ যে ব্যক্তি ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া থাকেন তাঁহার শরীরে কোনরূপ পাতকই থাকিতে পারেনা ॥৫৩॥ ব্রাহ্মণেরাই পৃথিবীর দেবতা, ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন, সুতরাং সূর্য্যের যেরূপ প্রভাহীনতা সম্ভবেনা, ব্রাহ্মণেও সেইরূপ ক্রূরতা সম্ভব হয় না ॥৫৪॥ জীবে মহৎ পুণ্যবল না থাকিলে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না, একারণ যে ব্রাহ্মণ কুকার্য্যে রত, তাহাপেক্ষা আত্মঘাতী আর কে আছে ॥৫৫॥ ব্রাহ্মণেরা আপন বস্তুই ভোজন করেন ও দান করেন, তাঁহাদেরই কৃপালব্ধ বস্তু ক্ষত্রিয়াদি জাতিগণ ভোজন বা দান করেন ॥৫৬॥ সমগ্র পৃথিবী ও যাবতীয় ধর্ম্মই ব্রাহ্মণের——ক্ষত্রিয়াদি জাতি সকলই ব্রাহ্মণের শেষভাগ বা ত্যাজ্যাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৫৭॥

ব্রাহ্মণগণই লোক সমূহের পিতা ও ব্রাহ্মণীগণই সকলের মাতা স্বরূপা এবং অখিল তীর্থই ব্রাহ্মণের শ্রীচরণ সম্ভূতা॥ ৫৮ ॥ রাজাগণের আদি ভগবান মনু ব্রাহ্মণ, সতী এবং গোগণের রক্ষার জন্য এইরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, সতী এবং গো সমূহকে পুষ্পদ্বারাও আঘাত করিতে

---

* ব্রাহ্মণের দেহ ভোগ বিলাস বর্জ্জিত অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রথানুসারে ব্রাহ্মণদের বাবু সাজা,—চাকুরী করা,—মহাজনী করা,—জমিদারীরূপ দস্যুতাকরা অথবা দোকানদারী প্রভৃতি অবৈধ কার্য্যকরা কেবল যমের দ্বারে ভীষণ সাজা বা দণ্ডই সার মাত্র।

পারিবেনা এবং কেশ মুণ্ডন, সর্ব্বস্ব গ্রহণ, এবং দেশান্তরে নির্ব্বাসন ব্যতীত কুকর্ম্মান্বিত (প্রাণ দণ্ড যোগ্য আধুনিক ৩০৪ ধারা প্রভৃতি) ব্রাহ্মণের আর কোনরূপ কায়িক দণ্ড নাই। ফলে যেকাল পর্য্যন্ত গো এবং ব্রাহ্মণ অবস্থিত আছেন, সেইকাল পর্য্যন্তই পৃথিবী স্থির ভাবে অবস্থিত করিবেন ॥৫১—৬০॥ এই জন্য পৃথিবীর রক্ষার্থ দ্বিজ, গো, এবং সতীর পূজা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যেহেতু ব্রাহ্মণ, গো এবং সতী এই তিনই পৃথিবীর মঙ্গল স্বরূপ; যে ব্যক্তি এই তিনের অবমাননা করে অথবা দ্বেষ করে সে পার্থিব অমঙ্গল আবর্জ্জনা মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে ॥৬২॥ ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, সতীস্ত্রীর আর্ত্তব এবং গোগণের পবিত্র সরল স্বভাব মহাপাতকের বিনাশ কারক ॥৬৩॥ বিপ্রদিগের চরণদ্বয়, গোগণের পৃষ্ঠদেশ এবং স্ত্রীজাতির অঙ্গ সমূহকে পণ্ডিতেরা পরম তীর্থ তুল্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা শুচি বলিয়া থাকেন ॥৬৪॥

তথাহি (বৃহদ্ধর্ম্ম পুঃ উঃ খণ্ড ২।৫৭ শ্লোকং);—

ইত্যাদিমঙ্গমর্য্যাদাং যোহন্যথা কুরুতে জনঃ॥
স যাতি নরকং ঘোরং কথ্যতে জীবিতো মৃত ॥৬৫॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতৎ প্রভৃতি অঙ্গ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, সে ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে এবং তাহাকে জীবন্মৃত বলাযায় ॥৬৫॥

তথাহি (কল্কিপুঃ ১মাংশ ৪।২১—২৫ শ্লোং)—

ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা বাচো বেদাঃ করে হরিঃ।
গাত্রে তীর্থানি রাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতি স্ত্রিবৃৎ॥৬৬॥
সাবিত্রী কণ্ঠ কুহরা হৃদয়ং ব্রহ্ম সংজ্ঞিতম্।
তেষাং স্তনান্তরে ধর্ম্মঃ পৃষ্ঠোঽধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥৬৭॥
ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্ পূজ্যা বন্দ্যাঃ সদুক্তিভিঃ।
চতুরা শ্রম্য কুশলা মমধর্ম্ম প্রবর্ত্তকাঃ॥৬৮॥
বালাশ্চাপি জ্ঞান বৃদ্ধা স্তপোবৃদ্ধা মমপ্রিয়াঃ।
তেষাং বচঃ পালয়িতুম্ অবতারাঃ কৃতাময়া॥৬৯॥
মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
কলিদোষ হরং শ্রুত্বামুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াং॥৭০॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের করে স্বর্গ, বাক্যেবেদ এবং শ্রীহরি, গাত্রে তীর্থ সকল, ও ধর্ম্মানুরাগ পাড়ী ত্রিগুণা প্রকৃতি, সাবিত্রী কণ্ঠমালা স্বরূপা, অন্তঃকরণ ব্রহ্মস্বরূপ এবং বক্ষস্থলে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠে অধর্ম্ম অবস্থিত ॥৬৬ ॥৬৭ ॥ ব্রাহ্মণেরাই পৃথিবীর দেবতা—সুতরাং পূজা এবং স্তুতি বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের বন্দনা করাই সকলের কর্ত্তব্য। ফলতঃ—ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ে অবস্থান পূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম * প্রচার করেন ॥৬৮ ॥ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বালক, তাহারাও জ্ঞানবৃদ্ধ, তপস্যা বিষয়ে বৃদ্ধ এবং আমার একান্ত প্রিয়। অধিককি ব্রাহ্মণগণের পবিত্র বাক্য পালনের জন্যই আমি ভূতলে অবতীর্ণ হই অর্থাৎ মানব কলেবর ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি জগতের রক্ষা বিধান করি ॥৬৯ ॥ যিনি ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় এই মঙ্গলবার্ত্তা বা পবিত্র মহিমা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাতক বর্জ্জিত হইয়া কলির শাসন হইতে পরিত্রাণ পান ॥৭০ ॥

পাঠকগণ! ভগবানের শ্রীমুখোৎপন্ন ব্রাহ্মণ মহিমা আপনারা শুনিয়া পবিত্র হইলেন এবং ধর্ম্ম প্রাণ পাঠকের চিত্তে ইহাতে যে কিরূপ আনন্দ উৎস প্রবাহিত হইল তাহা তিনিই জানেন এবং তদ্বিধ মনস্বী জনই জানিতে সমর্থ হইবেন। আমি ব্রাহ্মণ নিন্দুক আমার উহাতে আনন্দ নাই এবং নিরানন্দও যে আছে তাহাও নয়। ব্রাহ্মণেরা একদিন তাদৃশ তেজসম্পন্ন, পবিত্র এবং মহামনস্বী ছিলেন বলিয়াই ভাই পাঠকগণ! ভগবান নারায়ণ, শচীপতি মহেন্দ্র, কৈলাশেশ্বর ভগবান আশুতোষ অথবা যাবতীয় দেবতাগণ এই ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র হস্তে যজ্ঞীয় হবি, পুষ্পাঞ্জলি এবং নৈবেদ্যাদি পূজোপহার গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইতেন। এইজন্যই অগ্নিস্বত্তা এবং সুকালিনাদি পিতৃগণ ব্রাহ্মণের মুখে পবিত্রতম, কব্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। এমন কি গোলোকেশ পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণও এই জন্যই ভক্ত প্রদত্ত নৈবেদ্য ব্রাহ্মণের মুখে, ভোজন করিয়া ভক্তের প্রতি অভীষ্ট বর অর্পণ করিতেন।

তথাহি (ব্রঃবৈঃ গণেশ খণ্ড ১১।১৩-১৪ শ্লোকং):—

ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বেচ সন্ততম্।
ভূঞ্জতে বিপ্রদত্তন্তু ফলপুষ্প জলাদিকম্ ॥৭১ ॥

---

* আমারধর্ম্ম—ভগবদ্ধর্ম্ম। রাজবিশাখ যুপের প্রতি ভগবান শ্রীশ্রীকল্কি দেবের উপদেশ বাক্য।

ব্রাহ্মণা বা হিতা দেবাঃ স্ব স্বধিষ্ণেষু পূজিতাঃ।
ন চ বিপ্রাৎ পরোদেবো বিপ্ররূপ স্বয়ংহরিঃ॥৭২॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরাদি দেবগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত ফল, পুষ্প এবং জলাদি উপচার গ্রহণ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। বিশেষতঃ—দেবতারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াই পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে শুভাগমন করিতেছেন ও ভক্তের অর্চ্চনা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিতেছেন এই জন্যেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কে আছেন? যেহেতু শ্রীহরিই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া এই ধরাতলে বিচরণ করিয়া থাকেন॥৭১॥৭২॥

তথাহি (পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে ৩২।৫২—৫৪ শ্লোক)—

ব্রাহ্মণান্‌হি বিশেষেণ প্রত্যক্ষং হরিরূপিণঃ।
পূজয়েয়ুর্যথা যোগং হরিস্তেষাং প্রসীদতি॥৭৩॥
বিষ্ণু ব্রাহ্মণ রূপেণ বিচরেৎ পৃথিবী মিমাম্।
ব্রাহ্মণেন বিনা কর্ম্ম সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি নৈব হি॥৭৪॥
ব্রাহ্মণানাং মুখে যেন দত্তং মধুর মার্জ্জিতম্।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুখে দত্তং তদ্বৈ ভুংক্তে হরিঃস্বয়ম্॥৭৫॥

অর্থাৎ যে সমস্ত মানব প্রত্যক্ষ শ্রীহরি স্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ প্রকারে পূজা করেন, হরি তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন্॥৭৩॥ ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করেন; এই জন্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন ক্রিয়াই সিদ্ধি হয়না॥৭৪॥ ব্রাহ্মণের মুখে যে সকল অর্চ্চিত সুমধুর দ্রব্য অর্পিত হয়, শ্রীহরি স্বয়ংই তাহা ভোজন করেন॥৭৫॥

তথাহি (ব্রং জং খং ২১।৫৫ শ্লোকং):—

সাক্ষাৎ খাদিত নৈবেদ্যং বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ॥৭৬॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণরূপী জনার্দ্দন শ্রীহরিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্ত প্রদত্ত নৈবেদ্য ভোজন করিয়া থাকেন এবং বিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইলেই দেবতা সকল সন্তুষ্ট হন॥৭৬॥

ভাই পাঠক! পরম স্বস্ত্যয়ন—এই ব্রাহ্মণ মহিমা সাগর সলিল তুল্য অসীম, ইহা বর্ণন করিতে যাওয়া আমার ন্যায় অজ্ঞান ও দরিদ্র জনের ধৃষ্টতা।

মাত্র, আমার ন্যায় বিপ্রদ্বেষী অধম ব্রাহ্মণের ভাগ্যে অসম্ভব হইলেও আবশ্যক বোধে অল্পাধিক কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারিবনা, এইটি "আমার ভাই রোগ বিশেষ। ভাল পাইলে প্রাণ খুলিয়া যথেষ্ট ভাল বলা, আর মন্দ পাইলে একান্তত: যেটুকু না বলিলে চলিবেনা, না বলিলে পাপের প্রসক্তি বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং সমাজ জগত আরো উৎসন্নের পথে যাইবে, কেবল তাহাই না বলিয়া পারি না। হায়! এখন বুঝিতে পারিলাম—ব্রাহ্মণ কুলে আমি নরাধম বা ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই জাহ্নবী তুল্য সুনির্ম্মল বিপ্র কুলকে পঙ্কিল এবং কলঙ্কিত করিতেই বুঝি অগ্রসর হইয়াছি। সর্ব্ব বর্ণের গুরু স্থানীয় সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপী ভূদেব ব্রাহ্মণগণের মহিমা সাগরের পরমাণু পরিমিত বারি বিন্দু অর্পণ করিতে না করিতে তদ্দণ্ডেই আবার কিনা পাঠক বর্গের নিকট আমাকে ভগবন্নিন্দারূপ বিপ্রনিন্দা—এই পাপ মুখেই প্রকাশ করিতে হইল। আহা কি শোচনীয় পরিণাম! হায়! হায়!!! মত্তুল্য জীবাধমের যে কি গতি হইবে, তাহা ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরিই জানেন। কি স্বার্থ উদ্দেশ্যে যে আমি এই মহাপাতকের চুড়ান্ত নিদর্শন বিপ্র নিন্দায় অগ্রসর হইতেছি তাহা একান্ত পাপাশয় এবং পুণ্যাত্মা প্রভৃতি যাবতীয় জীবের অন্তর্যামী সেই শ্রীহরিই জানে;—আমার সেই ক্ষোভের বিষয়,—কেই মর্ম্মভেদী বৃশ্চিক দংশন জনিত যাতনার কথা এবং আমার সেই অব্যক্ত অনন্ত দুঃখ কাহিনী বা মর্ম্ম পীড়ার বিষয় আর জানে সূক্ষ্মদর্শী ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণ। পাঠক ভ্রাতাগণ! যদিও অপনাদের মধ্যে সকলে না হউন, কোন কোন মহাত্মা আমাকে এমন অঘোর সন্নিপাত বিকারগ্রস্ত অথবা বায়ু বিকারগ্রস্ত উন্মাদ বলিলেও বলিতে পারেন। ফলে যে যাহা বলুন, বলিয়া তিনি অবশ্যই ক্ষণিক সুখি হইবেন বটে। কিন্তু পাঠকবর্গ! আমার এখনও ওই সাধারণ জ্ঞানের বিলোপ হয় নাই যে, "বর্ণ গুরু ব্রাহ্মণ" * নিন্দায় গুরু নিন্দা, শিব নিন্দা, বিষ্ণু নিন্দা অথবা সদসৎ নিখিল প্রাণি জগতের নিন্দা করার অপরাধ ঘটে। সামান্যত: পরনিন্দা কিংবা আত্ম প্রশংসায় যখন আত্মহত্যা জনিত পাপ সঞ্চিত হয়, তখন

* "চতুর্ণামেব বর্ণানাং স্ত্রীণাঞ্চ ব্রাহ্মণোগুরুঃ।" ইতি বৃহদ্ধর্ম্ম পুং পুং খং ৬।১৮ শ্লোঃ।

এমতাবস্থায় পরাৎপর বিপ্রনিন্দা যে নিতান্তই দূষণীয় এবং পরম নিরয় অস্ত্রার অপ্রতি বন্ধ কারণ,—ইহাতো মানব প্রাণীর স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞানেরই সীমাবদ্ধ †। আমি প্রসঙ্গাধীনে ব্রাহ্মণ নিন্দা করিতেছি, না ব্রাহ্মণের স্তুতি করিতেছি তাহা অন্তর্য্যামী ভগবান্ এবং সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী পাঠকবর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য, এজন্য অজ্ঞে বা মূর্খে যাহা বলিবে বলুক যে জন্য আমি পাপাশঙ্কা বা অন্যবিধ আশঙ্কা করিতেছিনা। সময় বিষয়ে বা অবস্থা বিশেষে নিন্দাবাদেও স্তুতিবাদের কার্য্য হয়, সত্য না বলিয়াও যথার্থ সত্যে পরিণত হয় এবং অজ্ঞানে ও সম্প্রদানের ফল হইয়া থাকে; ফলে বিষয়টীর অবস্থা এবং দেশকাল পাত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য জ্ঞানে অধিকার লাভ করা আবশ্যক। তবে স্বল্প চেতা আমি ইহাকে যদি একান্তই উচিত বা উপকার উপদেশ বাক্যের শ্রেণীতে স্থান দিতে অসমর্থ হই, আর সহৃদয় পাঠক মণ্ডলী ইহাকে যদি "স্বরূপ কথনে দোষ ভাব" এই সম্ভাবে গ্রহণ করিতে নাই পারেন, আমি তাহাতে অবশ্যই ক্ষমা চাহিব অথবা ভবিষ্যৎ কালের জন্য পূর্ব্বেই ক্ষমা চাহিতেছি। আমি খামখেয়ালীতে কিছু বলিবনা, আমার স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্যও কিছু বলিবনা এবং আমার পুত্র পৌত্রাদির আর্থিক, কায়িক অথবা সামাজিক উন্নতির জন্যও কিছু বলিবনা। * কেবল মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতাগণ, ব্যাস পরাশর প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্র রচয়িতা গণ, যাহা বহু পূর্ব্ব সময়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন নিন্দাস্তুতি যাহাই হউক ব্রাহ্মণাদি আর্য্য জাতির ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতি, সামাজিক উন্নতি এবং ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি কামনায় তাহারই সারভাগ বা সংক্ষিপ্ত উপদেশ বলিব মাত্র। তথাপি কোটপ্যাণ্টুলন ধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন, আর নামাবলি গরদের ধুতি পরিহিত গঙ্গার ঘাটের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন, ভূসুর

---

† "নিন্দাতু যাতনং ভগ্যনাশ্বযাতিমাপ্নুহি॥" ইতি বৃং ধং পুং, উঃ খঃ ৭৩৮ শ্লোং। "পরনিন্দা বিনাশায় স্বনিন্দা যশসে পরম্॥" ইতি ব্রঃ জন্ম খণ্ডে ৪১।৭ শ্লোং।

* আমি নির্ব্বংশ আমার পুত্র পৌত্র নাই, সেরূপ আপদে পড়িবার আর আশঙ্কাও নাই। উদ্ধরেতা যোগী পুরুষ না হইলেও তাঁহাদের পাদপদ্মের কাছে করজোড়ে দাঁড়াইবার একটু অধিকার গুরু কৃপায় আছে পাঠক।

বিপ্রমহোদয় বর্গের শ্রীচরণ সমীপে এবং বিপ্রদাসগণের সন্নিকটে আমি আমার এই অবিমৃষ্য কারিতার জন্য সানুনয় ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

যে সমস্ত শোচনীয় কারণে অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ দিগের পবিত্রতম দেহ নিকেতন হইতে পরমারাধ্য ব্রহ্মণ্যদেব পলায়ন করিয়া গিয়াছেন, যে সমস্ত কারণে ধরামর ব্রাহ্মণগণের প্রায়শ অন্ত্যজ শূদ্রবর্ণে বা ম্লেচ্ছত্বে পরিণত হইতেছেন এবং যে সমস্ত কারণে জাতি নিচয়ের আচার্য্য স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ অপাংক্তেয় বা পতিতে পরিণত হইতেছেন, পাঠক ভায়া! আমি মূর্খ তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিতে বাসনা করিয়াছি ভবিষ্য বুঝিয়া কার্য্য করেন এইটিকে প্রধান মনে করিয়াই বিপ্রের স্বরূপ কথনে অকুণ্ঠিত কামনা করিতেছি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র এবং সঙ্কর জাতি, সকলের নিকটই আমার ঐকান্তিক নিবেদন এই যে, দেশোদ্ধাররূপ মহাব্রত অবৈগুণ্যভাবে সমাহিত বা উদ্‌যাপিত করিতে হইলে, "ভারতীয় বর্ণগুরু" ব্রাহ্মণ জাতীয় সমাজ অভিজ্ঞ ব্যক্তি মহোদয়দিগকেই প্রথম আসন দিতে হইবে এবং সকলের অগ্রে অর্চ্চনা করিতে হইবে; সুতরাং প্রথমতঃ ব্রাহ্মণদিগকে যথার্থব্রাহ্মণে পরিণত করাই হইতেছে ভারতবাসীর প্রকৃত প্রয়োজন। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ আকারে সুগঠিত করা আবশ্যক মনেকরা কর্ত্তব্য। ভারতে যখনব্রাহ্মণ খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন বর্ণবিভ্রাট বৃত্তি বিভ্রাট এবং সমাজ বিভ্রাট ঘটিতে পারে নাই। ক্ষত্রিয়ে প্রজা পালন দেশরক্ষা প্রভৃতি রাজসিক গুণের পরিচালনা করিতেন, তখন বৈশ্যেরা কৃষি গো রক্ষা এবং বাণিজ্য দ্বারা রজোস্তমোগুণের সম্য নিগ্রহ প্রকৃতির পরম সেবায় সিদ্ধিলাভ করিতেন এবং শূদ্র জাতিয়েরা বর্ণ প্রধান ব্রাহ্মণের শুশ্রূষায় তমো গুণের চরম সাধনে তৎপর ছিলেন; শূদ্রেরা তমো গুণের জাতি হইয়াও সত্ত্ব গুণময় বিপ্রসেবা, বিপ্রসংসর্গ এবং বিপ্রগত প্রাণ হইয়া পরজন্মেই মুক্তি পাইবার অধিকরী হইতেন। হায়! কলি যখন উক্তবিধ প্রকৃতিকে বিকৃত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল, কলি কিঙ্করেরা যখন দলে দলে অথবা পঙ্গপালের ন্যায় পালে পালে তাহার ঐ "প্রকৃতির বিকৃতি" কুকার্য্যে যোগদান করিতে আরম্ভ করিল; ভাই পাঠক! তখন ভারত হইতে ব্রাহ্মণের যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব ধ্বংশ হইল, ক্রমে "বিকৃতি প্রকৃতি"র প্ররোচনায় সত্ত্ব প্রকৃতি ব্রাহ্মণও কৃত্রিমতা অনুপ্রাণিত ভাবে মিশিয়া গেল। হায়! তখন ক্ষত্রিয়ের

বাহুবীর্য্য এবং বৈশ্যের বার্ত্তাশাস্ত্রের পরম অভিজ্ঞতা অনন্তকালের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল, হায়! সঙ্গে সঙ্গে দাস শূদ্রও ফোস্ করিয়া ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার আবদার করিল অধিকন্তু শেষে জোর জবরদস্তি করিয়া দাসত্ব ছাড়াইয়া ফেলিল এবং প্রভুত্ব নিয়া কাড়াকাড়ী আরম্ভ করিয়াছিল। বলিতে কি তাহারা যে ভাবে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে কিয়দংশ কৃতকার্য্য হইয়াছে, ইহা "প্রকৃতির বিকৃতি কলেকৃশন্। এই যজ্ঞোপবীত যথার্থ যজ্ঞোপবীত নয়; তবে অযথার্থে পরিণত করিবার অধিকার আছে, ত্রুটী স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না। যে হেতু উন্নতিশীল জগৎ উন্নতির পথে না যাইয়া পারে না, তবে উহা অসংখ্যাত সময় সাপেক্ষ বটে। যাহা হউক, পাগলের মত বা অসভ্যের অসার ভাবে যে কিছু বলা হইল তাহাকে পাঠকগণ অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্য জাতিবর্গ ক্ষমা করিয়া ভারতীয় ব্রাহ্মণকে যথার্থ ব্রাহ্মণে পরিণত করিতে প্রয়াস পাউন। ভাই পাঠক! প্রকৃত ব্রাহ্মণের হস্তে সনাতন আর্য্য সমাজ পরিচালনের ক্ষমতা অর্পিত হইলে বা ভার দিতে পারিলে দ্বেষ, হিংসা, প্রতারণা, প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আর্য্যজাতির সুনির্ম্মল আর্য্যত্ব অথবা বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরম পবিত্রতা পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করিবে এবং সেই সুবিমল আর্য্যত্ব পবিত্রতা রূপ মহারত্নবেদিকা আশ্রয় করিতে পারিলে তবে দেশোদ্ধার রূপ মহাব্রত নির্ব্বিবাদে ও নিরাপদে নিষ্পন্ন হইতে পারে। দেশোদ্ধার কি? সর্ব্বাদৌ শব্দার্থে বোধ থাকিলেও গূঢ়ার্থ বা ভাবার্থে ভীষণ গলদ গলিয়া মাটি হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্য জাতির ধর্ম্মোদ্ধারই দেশোদ্ধারের রূপান্তর মাত্র। ভারতবাসী যথার্থ আর্য্যজাতি ধর্ম্ম প্রাণ; কাজেই ধর্ম্মোদ্ধারই আমাদের আর্য্যজাতির বা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর দেশোদ্ধার; আমাদের দেশোদ্ধার বাগ্মীতা মূলক নহে—ধর্ম্মমূলক; আমাদের দেশোদ্ধার ধর্ম্মধ্বজীদের অভিসন্ধীমূলক নহে—ধর্ম্মমূলক; আমাদের দেশোদ্ধার—ভাই! ষড়যন্ত্রমূলক নহে, অপবিত্র কলুষমাখা বিসদৃশ অবস্থা মূলক নহে, ইহা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদার জন্যই শ্রুতি স্মৃতি সম্মত অবশ্য অবশ্যই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম মূলক বটে।

দেশোদ্ধার বা ঈদৃশ ধর্ম্মোদ্ধারের প্রধান অঙ্গ বা সহায় হইতেছে রাজভক্তি, গুরুভক্তি, দৈবভক্তি, ভগবদ্ভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি, ন্যায়পরতা, স্বধর্ম্মাচরণ বা আশ্রমগত সদাচার ব্রত এবং অহিংসা পরম ধর্ম্ম।" এই অষ্ট শক্তি ভারতীয় আর্য্য সন্তানদিগের জীবন-সহচর; তদুপরি বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণই হিন্দু

ভক্তি—৫

সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার সুদৃঢ়া ও সুপবিত্রা ভিত্তি বটে। পাঠক ভ্রাতাগণ! আপনারা নিশ্চয় জানিবেন এবং মনে রাখিবেন যে, পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরশ্রী কাতরতা এবং অসম্ভব কল্পনা, এই শত্রু চতুষ্টয়ই উন্নতির পথে অবনতি, অধর্ম্ম, অধঃপাত প্রভৃতি দুরতিক্রম্য কণ্টক পাদপ পুতিয়া দেয়। পূর্ব্বকথিত পরশ্রীকাতরতা আবার দুই প্রকার, এক স্বভাবসিদ্ধ, অপর বল্লাল খোরী * যাহাই হউক ফলে ঐ দুই প্রকার পরশ্রীকাতরতা ভারতবর্ষকে উৎসন্নের উষর ভূমিতে পরিণত করিতেছে, অধঃপাতের অতলতলে একেবারেই আছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণের হস্তে সমাজ পরিচালনের ভার দিতে হইবে এবং তাহা হইলেই সমাজ সংস্কার হইবে এবং দেশোদ্ধার বা ধর্ম্মোদ্ধার হইবে, ধর্ম্মোদ্ধার হইলে অথবা ধর্ম্মের জীবন্যাস ও নেত্রোৎসব সম্পন্ন করিলেই আর্য্যজাতি ভারতীয় হিন্দু জন সমূহ কৃতকার্য্য হইবে অর্থাৎ ত্রিবর্গ সাধনে তৎপরতা লাভ করিবে †। বলিয়া রাখাভাল ব্রাহ্মণের হস্তে সমাজনেতৃত্ব অর্পণ করিতে হইলে, যথার্থ ব্রাহ্মণের হাতেই উহা ন্যস্ত করিতে হইবে। গলায় বেশ যজ্ঞসূত্র আছে, কিন্তু তাহা আলেকজাণ্ডার সহরের যজ্ঞসূত্র অথবা ইংরিজি যজ্ঞসূত্র; বেশ সন্ধ্যাপূজা করেন, কিন্তু অন্ত্যজ জাতির চাকুরী জীবী হইয়া দফারফা করিয়া দিয়াছেন; বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি আছে তাহা হয়তো ব্যবহার জীবেতে পরিণত প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার এইরূপ কালচক্রে নিষ্পেষিত অনিচ্ছালব্ধ আপদের শান্তি না হইলে সমাজ বিশুদ্ধ হইবে কি প্রকারে? এরূপ প্রশ্ন নাই বলিয়া তাহার অবশ্য বিচারও নাই, অথচ বিচারাভাবে উচিত সিদ্ধান্তেও কেহ মনোযোগ করিতে পারিতেছেন না।

আর্য্যসমাজ বা বর্ত্তমান হিন্দু সম্প্রদায় কিভাবে পরিচালিত হইলে যথার্থ আর্য্যত্ব লাভ করিতে পারিবে? হায়! আর্য্য সমাজরূপ মহানৌকা আজ মাঝীবিহীন হইয়া কর্ম্ম সাগরে ভাসমান। মাঝী বিহীন নৌকায় অনুকূল এবং

---

* বল্লালসেনের স্বার্থপরতা বা অর্থ লোভের অপূর্ণতা কর্তৃক অকারণ যে সকল জাতি পবিত্রতা হারাইয়াছে।

† ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম; ইহার নাম ত্রিবর্গ।

প্রতিকূল উভয় বিধ বায়ুই তুল্য অপকারী। একবার এদিক আরবার ওদিক্ করিয়া করিয়া কেবল কালস্রোতের টানে বিসদৃশ ভাবেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এবং পরদ্বেষ, পরহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, অধর্ম্ম, অনীতি, অবিবেকতা প্রভৃতি মহাভীষণ তরঙ্গের ধাক্কা খাইয়া খাইয়া "বাইন ঢিলে" গোছের হইয়া পড়িয়াছে। হায়! এই অপার কর্ম্ম সাগরে সাতার কাটিয়া মহাবিপন্ন উক্তবিধ "সমাজ নৌকা"কে কেউ তটস্থ করিতে চেষ্টা পাইবে কি ?

ইহার পর ভাই, সেই ব্রহ্মণ বিষয়ক ভাবনা। আহা! সেই সমাজনেতা বর্ণগুরু বা ধর্ম্মগুরু ব্রাহ্মণ বিষয়ক মহাভাবনা!! কিভাবে সমাজ নৌকা উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে; মহাজনেরা—ব্রাহ্মণেরাইবা কি ভাবে কোন সহজ উপায়ে সদ্‌ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে; কিরূপ সংস্কার সম্পন্ন হইলেইবা ভারতীয় আর্য্য জাতির পৈত্রিক পবিত্রকীর্ত্তি কলাপ অক্ষুণ্ণ রহিবে; কিরূপ সদাচারনিষ্ঠ হইলেইবা আমরা পুনরায় আমাদের সর্ব্বস্ব ইহ পরকালের পরম আশ্রয় সেই ব্রহ্মণ্য দেবকে লাভ করিতে পারিব এবং ব্রাহ্মণ সন্তানেরা কি প্রকার নিয়ম অবলম্বন বা বৈদিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেইবা পূজা, হোম, শ্রাদ্ধ, পুরশ্চরণ ও পুরবকার সাধ্য শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়ার ফল সাধন যোগ্য যোগ্যতা প্রাপ্ত হইব, ইহা আর্য্য জাতির এখন একটি প্রধানতম চিন্তার বিষয়। সমাজকে কি প্রণালীতে কোন মহামন্ত্রে সমাজ দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে এবং ইন্দ্রিয় সংযম ব্রহ্মচর্য্যাদি কি কি উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে যে আমরা আবার বিষ্ণুতুল্য বিপ্রদিগের পুনঃ দর্শন লাভ করিতে পারিব, ভারতীয় আর্য্যদিগের এখন ইহাই একটি অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে। সর্ব্ব প্রথম এতদ্বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হওয়া ভারতীয় যাবতীয় আর্য্য জাতির একান্ত আবশ্যক বলিয়াই। পাঠক ভ্রাতাগণ! জীবেদয়া প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ বিষয়ক কথার কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ভরসা করি বিষয়টি কাহারই রুচি বিরুদ্ধে বা ইচ্ছা প্রতিকূল হইবেনা। সকলেরই স্মরণ রাখিতে হইবে কৃত্রিমতা সর্ব্বথা বিসর্জ্জনীয়, কপট আচরণে অচিরেই অধঃপাতের অন্তঃস্থলে অনায়াসে চলিয়া যাইতে হয়।

এখনও যিনি বিশুদ্ধ সত্যের পাদ সেবা পুরায়ণ; এখনও যিনি সমীচিন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধনে ঐকান্তিক যত্নশীল এবং এখনও যিনি আর্য্য

ভূমি ভারতের উপস্থিত দুর্দ্দশায় সর্ব্বদা ব্যথিত, নিয়ত ক্ষোভিত চিত্ত এবং দুঃখে অধোবদনে অবস্থিত; আশা করিতে পারি তিনি বা তদ্রূপ ব্যক্তিবর্গ বর্ত্তমান প্রস্তাবে কখনই বিরক্ত হইবেন না, অথবা এ মূর্খকে তিরস্কৃত এবং অভিশপ্ত করিবেন না। তবে দুর্ব্বাসা প্রকৃতির কতিপয় বা অতিশয় যাহাই হউক, পরম দুর্ম্মনা ব্রাহ্মণ ভায়া দিগের জন্যই মধ্যে মধ্যে যেন একটু ম্রিয়মান হইতে হয়, সময় সময়ে একটু আতঙ্কিত হইতে হয়। যেরূপই লাভ হউক না কেন, ভগবদভিপ্রায়ে যখন মনের না বলিলেই স্বস্তি নাই, তখন ধ'রে বেঁধে পশ্চাৎপদ হওয়া বড়ই আত্মগ্লানিকর, বড়ই অনুতাপের বিষয় নয় কি? আমার জ্ঞান বিশ্বাসের ধারণা ইহা অবশ্যম্ভাবী শুভ ফল প্রসূ।

হে ব্রাহ্মণ প্রভুগণ! আপনাদের এবং আপনাদের ভবিষ্যদ্ বংশধর গণের বিশেষতঃ আপনাদের বর্ত্তমান আর্য্য সমাজের আন্তরিক মঙ্গল কামনা করিয়াই আমি অধম এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি; আপনারা অনুগ্রহের চক্ষে এ ব্রহ্ম বন্ধুটাকে একটু আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং ত্রুটি বলিয়া কিছু মনে করিলে ক্ষমা করিবেন। দেখিবেন আমার যেন অরণ্যে রোদন করা না হয়। ইহাও আপনারা মনে রাখিবেন "মূর্খ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মাত্রেই ভগবান বিষ্ণু বিগ্রহতুল্য পূজনীয় বা আদরণীয়," এ বোধ এই নির্ব্বোধের জাগরূক আছে, কেবল আর্য্য সমাজের বা আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ সন্তান গণের শুভ চৈতন্যের জন্যই বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

পাঠকবৃন্দ! যথাশাস্ত্র সংক্ষেপতঃ ব্রাহ্মণ বর্গের যথা কর্ত্তব্য অগ্রে নিবেদন পূর্ব্বক, পরে ব্রাহ্মণদিগের অনার্য্যত্ব বা অন্ত্যজ শূদ্রাদিবৎ আচরণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মহা পুরাণাদি হইতে যথাসম্ভব সরল সমালোচনা প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি; আশা করিতে পারি, নব্যশিক্ষিত, পাশ্চত্য মত প্রয়াসী ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর; ভূস্বামী ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর ভূস্বামী পরন্তু ব্যবহার জীবী অথবা চাকুরীজীবী ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর আর্য্য জগতের; আধুনিক পঞ্চ মকারী গৃহস্থ ও পশুবলি প্রিয় দেবীপুত্র প্রভৃতির এতদ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে।

তথাহি মঃ মোক্ষধর্ম্মে ২৬৮

দ্বারাণিযস্য সর্ব্বাণি সুগুপ্তানি মনীষিণঃ।
উপস্থমুদর বাহু বাক্ চতুর্থী ভবেদ্বিজ ॥৭৭॥

অর্থাৎ যে মনীষী ব্যক্তির উপস্থ, উদর, হস্ত এবং বাক্য, শরীরস্থ এই স্বর চতুষ্টয় সর্ব্বতো প্রকারে সংযমিত বা বশীকৃত, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ॥৭৭॥

ব্রাহ্মণদিগের যথা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভগবান পদ্মযোনির বাক্য এইরূপ,—"সত্য, শান্তি, ক্ষমা, অহিংসা, অল্পে সন্তোষ, দয়া, দান, যাহাতে অন্যের কোনরূপ ক্ষতি বা ক্লেশ না হয় এরূপ স্বল্প ভিক্ষা, সৌজন্য, বিনয়, যজন, যাজন, সৎ প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, মিতাহার, নিরামিষাহার, উপবাসাদিকায়ঃ শুদ্ধিব্রত সূর্য্যের উপাসনা (প্রত্যহ সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়া,) অগ্নির অর্চনা, গুরুসেবা এবং যাথাবিধি গোসেবা" ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা নীচজাতি নীচজনের সহিত কথোপকথন, নীচব্যক্তির গৃহে গমন, নীচকামনা, স্নান ও জপে অলসতা চিত্তক্ষোভ এবং শূদ্র কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ভোজন * পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ এবং সৎ শাস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরাও কদাপি গো পশু বিক্রয় করিবে না; যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করিবে সে গোবধের পাপভাগী হইবে। পশু পক্ষী ও মনুষ্যাদি কোন প্রকার প্রাণী, তৈজসপাত্র, বসা (চর্ব্বি) ও বস্ত্রবিক্রয় এবং চর্ম্মবাদ্য (ঢোল ভারাদি) নৃত্য, এবং গীতের দ্বারা জীবিকা রক্ষা করিবে না। চর্ম্মচ্ছেদাদি কার্য্য † কদাচ ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণেরা পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা, গায়ত্রীজপ এবং দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিবে। ত্রিসন্ধ্যায় সামাদি স্ব স্ব বেদোক্ত গায়ত্রীর রূপান্তর ধ্যান করিবে। যেহেতু প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রয়েই ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠিত আছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যার অনাদর করেন, তিনি কখনই ব্রাহ্মণ নহেন যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা বিমুখ সেই পাপাত্মা সূর্য্য হত্যার পাতকী হইয়া থাকে। স্নান বর্জ্জিত ব্যক্তি মল এবং জপ যজ্ঞ বিহীন ব্যক্তি পূঁজ শোণিতাদি ভোজন করে। প্রতি দিবস পিতৃ তর্পণ

---

* এই কারণ শূদ্রালয়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণে করেন।

† চর্ম্মবাদ্য ঢোল, ডঁগর, ঢাক, এবং তবলতুগী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন, তদ্বরা জীবিকা সংস্থান, চর্ম্মময় যন্ত্র প্রস্তুত করণ, চর্ম্ম বিক্রয় যাবতীয় চর্ম্মশিল্পী করিবে না।

না করিলে পিতৃ হত্যার পাপ ভাগী হয়। সূর্য্যোদয় হইলে মন্দেহ নামক ** বিকটাস্য রাক্ষস নিচয় প্রত্যহ তাঁহাকে (সূর্য্যদেবকে) ভক্ষণ করিতে সবেগে ধাবিত হয়, পরে প্রাতঃসন্ধ্যাকারী দ্বিজগণের বা ব্রাহ্মণগণের জলাঞ্জলি, অথবা আপমার্জ্জন অঘমর্ষণাদি নিক্ষিপ্ত জল দ্বারা তাহারা তাড়িত হইয়া বহুদূরে পলায়ণ করিয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা না করে (ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ) তাঁহারা আত্মহত্যা, সূর্য্য হত্যাদি ভীষণ পাপে পাপী হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ সেই দিবস সর্ব্বথা অশুচি থাকে * এবং যাবদীয় বৈদিক কার্য্যে অনধিকারী হয়। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারগত, বন্ধন প্রাপ্ত, এবং দূরপথ গমনে ব্যস্ত থাকিলে মানসিক সন্ধ্যা করিলে দোষান্বিত হয় না; যেহেতু মানব আপদগ্রস্থ অথবা শোক মোহাদিতে অভিভূত হইলে অশুচি হয়, সুতরাং এতদবস্থায় তাহার পক্ষে মানসিক সন্ধ্যাই বিধি জানিবে। শোণিতস্রাব, পূঁজনিঃসরণ, ধূমোদ্গার, জ্বরপীড়া এবং জন্ম মরণাশৌচে বৈদিক সন্ধ্যা অথবা সর্ব্বপ্রকার বৈদিক কার্য্য নিষিদ্ধ। দ্বাদশী, আমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি শ্রাদ্ধ দিবসে সায়ংসন্ধ্যা (কেবল বৈদিক সন্ধ্যা) করিলে পিতৃহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যহ এক সহস্রবার গায়ত্রীজপ করাই কর্ত্তব্য, অশক্ত পক্ষে শতকরা জপ করিবে, এবং একান্ত অশক্ত পক্ষে দশবার জপেরও বিধি আছে। পাষণ্ড সংসর্গে সাধকেরা স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন ভজনাদি অনুষ্ঠান না করিতে পারেন, কিন্তু দেবমাতা গায়ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না জপে বিঘ্ন হইলে দেবীকে মানসিক স্মরণ করিতে হইবে। অঙ্গুলি সকল পরস্পর যুক্ত রাখিয়া মধ্যমাঙ্গুলির নিম্ন দুই পর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অবশিষ্ট দশ পর্ব্বদ্বারা গায়ত্রী জপ করিবে। বিপ্রগণ "প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন কালে উত্থিত হইয়া, এবং সায়ংকালে উপবিষ্ট থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। প্রজ্বলিত অনলে পতঙ্গ যেরূপ ভস্মস্যাৎ হইয়া থাকে, তদ্রূপ গায়ত্রী জপ পরায়ণ ব্রাহ্মণের দৈবাৎ ব্রহ্ম হত্যাদি মহাপাতক সংঘটিত হইলেও তাহা ক্ষণমাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়।"

** মন্দেহ নামক অথবা সন্দেহ নাম; দ্বিবিধ পাঠই আছে।

* প্রাতঃ সন্ধ্যামকৃত্বাতু দেহশ্চা শুচির্ভবেৎ।

সর্ব্ব বৈদিক কার্য্যেষু প্রযাত্যনধিকারিতাম্ ॥২।

ব্রাহ্মণদিগের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য *। গায়ত্রী শত বার জপ করিলে দিনকৃত পাপ এবং সহস্র বার জপ করিলে যাবতীয় পাপ রাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। দ্বিজগণ গায়ত্রী জপান্তে "মহেশ বদনোৎপন্ন" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্য মণ্ডলে তেজময় জপ সকল অর্পণ করিবেন। আদিত্য পুরাণোক্ত গায়ত্রীর বর্ণ, রূপ এবং যথাযথ অর্থ অবগত হইয়া জপ করিবেন। "গান কারী (জপ কারীকে) পরিত্রাণ করেন বলিয়া উহাঁর নাম গায়ত্রী হইয়াছে।" † ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া লৌহ এবং রাত্রি বাস বস্ত্র স্পর্শ করিবেন না, সেই দিবসীয় ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবেন †। পরিত্যক্ত বস্ত্র এবং রাত্রি বাস বস্ত্র অপরিত্যাক্ত অশুচি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রতিবস্ত্র শতবার ধৌত না করিলে কখনই পবিত্র হয় না। পবিত্র চেতা ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শুক্ল বর্ণ তিলক ‡, শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত ও শুক্লবর্ণ যুগ্মবস্ত্র ধারণ করিবেন এবং দশন সমূহ পরিস্কৃত রাখিবেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সতত উপবীত ধারণ, শিখাবন্ধন ও তিলক ধারণ করা কর্ত্তব্য §।" ব্রাহ্মণ মল মূত্র পরিত্যাগ কালে বস্ত্রদ্বারা মস্তক দেশ আবৃত করিবেন, কর্ণে, স্কন্ধে অথবা মস্তকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং মুক্ত কচ্ছ হইয়া (কাছা খুলিয়া) মল মূত্র পরিত্যাগ করিবেন। দ্বিজগণ পরিমিত তৈলমর্দ্দন ব্যতীরেকে তৈলভ্যঙ্গ (অত্যাধিক তৈল ব্যবহার) করিবেন না এবং তৈলাক্ত দেহে মল মূত্র ত্যাগ করিবেন না। মলমূত্র ত্যাগ, মৈথুন, স্নান, ভোজন, জপ, দেবার্চ্চন এবং দন্তধাবন কালে মৌনী হইবেন (কথা বলিবেন না) কোনও প্রকার শব্দ করিবেন না। "ব্রাহ্মণের শরীর কখনই পার্থীব সুখ ভোগের জন্য

---

† সাবিত্রী জপ শিলস্য ব্রহ্ম হত্যাদি পাতকম্। উপেতং দৈব যোগেন নশ্যতম্বো পতঙ্গবৎ ॥১॥ (বৃহদ্ধর্ম্মপুঃ উঃখঃ ২।১৯।২৬)

* গায়ন্তং ত্রায়তযস্মাদ্ গায়ত্রীয়ং তদুচ্যতে॥ বৃ০ ধ০ পু০ উ০ খং ২।৩২

† মধ্যাহ্ণ স্নানান্তে এই বিধি প্রশস্ত জানিবে।

‡ গোপী চন্দন এবং শ্বেত চন্দন দ্বারা তিলক প্রশস্ত।

§ বৃহদ্ধর্ম্ম পু০ উ০ খ০ ২।৩৯—৪০ শ্লোক দ্বয় আবশ্যক মত দ্রষ্টব্য।

নহে, উহা কেবল তপস্যা ও উপবাসাদি ক্লেশ, ধর্ম্মোপার্জ্জন এবং নির্ব্বাণ মুক্তির (সেবামুক্তির) জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে।*

ব্রাহ্মণদিগের মৃত্তিকা শৌচের বিষয় শ্রবণ কর, ব্রাহ্মণ উপস্থে একবার, মলদ্বারে বারত্রয় বামকরে, দশবার, করতলে মৃত্তিকা লেপন করিবেন, পরে তিনবার নখশুদ্ধি করিয়া (নখমলনিঃসরণ) যথা যোগ্য আচমন পূর্ব্বক জলেরপ্রতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টি সঞ্চালন করতঃ তিনবার জলপান করিবেন।† তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা ওষ্ঠাধার সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক তিনবার মুখমার্জ্জন পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসাচ্ছিদ্রদ্বয় স্পর্শ করিয়া ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা পুনঃপুনঃ চক্ষু ও কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা নাভি করতলদ্বারা হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং পরে অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণের পক্ষেই এইরূপ শিবপ্রদ, এমন কি ঈদৃশ বৈদিক আচমন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য পরম পবিত্র হইয়া থাকেন। এতৎপর শাস্ত্র বিধিমত তিলক রচনা করিবেন।

তথাহি (বৃহদ্ধর্ম্মপুং উঃখং ৪।৪৩—৪৫ শ্লোঃ);

তিলকং বিন্দুমাত্রন্তু ললাটে শূদ্র আচরেৎ।
ব্রাহ্মণ শ্চোর্দ্ধ তিলকমাশিখান্তং সদাধরেৎ ॥৭৮॥
দ্বিফালং মধ্যশূন্যন্তু তিলকং মৃত্তিকা দিভিঃ।
বাহ্বোশ্চ হৃদয়েচৈব গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োরপি।
ব্রাহ্মণস্তিলকান্যেব কুর্য্যদ্বৈ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥৭৯॥
ন বাহ্বোস্তিলকং কুর্য্যাদ্‌যস্য জীবন্ পিতাস্থিতঃ।
তথা জ্যেষ্ঠঃ সোদরশ্চ যস্যজীবতিবাতথা ॥৮০॥

---

* ব্রাহ্মণস্যতু দেহোহয়ং ন সুখায় কদাচন।
তপঃ ক্লেশায় ধর্ম্মায় প্রেত্যমোক্ষায় সর্ব্বদা ॥ ১॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুংউঃখং ২।৪৪ শ্লোকম্,

† তিনবার জল পান দ্বারা সামান্যতঃ হৃদয়দেশ সিক্ত হইবে ইহাই ব্রাহ্মণের আচমনীয় জলের পরিমাণ। "মাষমজ্জন মাত্রেণ" ইত্যাদি জলের পরিমান নিরূপক প্রমাণও রহিয়াছে।" মাষৈক মজ্জন ইতিশেষঃ।"

অর্থাৎ শূদ্রগণ ললাটে বিন্দুমাত্র (বর্তুলাকার) তিলক * এবং ব্রাহ্মণগণ শিখা পর্য্যন্ত উর্দ্ধগামী তিলকই সর্ব্বদা ধারণ করিবেন ॥ ৭৮ ॥ দ্বিজগণেরা যাবতীয় কার্য্যে মৃত্তিকাদি দ্বারা (গোপী চন্দন, শ্বেত চন্দন, গঙ্গামৃত্তিকা এবং তুলসী মৃত্তিকাদি) ললাটে যেরূপ সছিদ্র, মধ্যস্থলে দ্বিভাগে বিভক্ত তিলক ধারণ কর্ত্তব্য, ঠিক সেইরূপই বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, গ্রীবাদেশে এবং উভয় পার্শ্বেও তিলকের আবশ্যক,—কেবল পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা জীবিত ব্যক্তির বাহুতে তিলক ধারণ নিষিদ্ধ ॥ ৭৯-৮০ ॥

মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্ম প্রকরণে বর্ণিত আছে যে, উদর ও উপস্থাদি দ্বার চতুষ্টয় যাহাদের উন্মুক্ত (৭৬ শ্লোক) তাহাদের যাবতীয় কার্য্যই নিস্ফল। এতাদৃশ ব্যক্তিকৃত তপস্যা, যজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবপূজাদি সমস্তই অকার্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাঁহার উত্তরীয় নাই, যিনি আস্তরণ (শয্যা) বিহীন স্থানে বাহু উপাধানে শয়ন করেন, সেই শমগুণাবলম্বী বা বশীকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেই দেবতারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি মননশীল হইয়া ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বক সুখ দুঃখাদি যাবতীয় বিষয় সন্তোষের সহিত স্বীকার করেন, দেবতারা তাঁহাকেই উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রকৃতি ও বিকৃতি (ব্রহ্ম এবং দ্বৈত) অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মের পরম গুহ্যতত্ত্ব সম্যক প্রকার জ্ঞাত আছেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের গতিজ্ঞ দেবতারা তাঁহাকেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতে যিনি ভীতি বর্জ্জিত এবং যাঁহার দ্বারা জীব মাত্রের কোন প্রকার ভীতি না জন্মে দেবতারা সেই অহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। দান এবং যজ্ঞাদি সংক্রিয়া সকলের পবিত্র ফল ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ্য (যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের তেজবীর্য্য) যে কিরূপ পরম পদার্থ তাহা কেহই লাভ করিতে পারেনা। মূঢ় মানবেরা ঐ সকল পরম রহস্য পরিজ্ঞাত না হইয়া বৃথা কেবল ক্ষণস্থায়ী স্বর্গ কামনা করিয়া মরে (শাঃ মোঃ ১৬৮ অং ২৮—৩৬শ শ্লোঃ)।

---

* বৈষ্ণব শূদ্র এবং অন্ত্যজ শূদ্র পর্য্যন্ত শিখাগত তিলক বা হরি মন্দির তিলক দিতে পারে।

মহাত্মা ভীষ্মদেব সংক্ষেপে বিপ্রধর্ম্ম বলিতেছেন, জ্যাকর্ষণ (রণকার্য্য) শত্রু নিবর্হণ (শত্রুনাশন) কৃষিকার্য্য (বাণিজ্য দোকানদারী) পশুপালন অন্যের শুশ্রূষা অর্থাৎ শূদ্রাদি জাতি মাত্রের দাসত্ব বা চাকুরী, মূলতঃ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই গুলি নিতান্তই অকার্য্য সুতরাং ব্রাহ্মণত্বের বীজ ধ্বংশ কারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিষয়ক ষট কর্ম্ম সকল আচরণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। ব্রাহ্মণেরা রাজসেবা (রাজনৈতিক বেতন ভুক্ চাকুরী) করিবেন না, কৃষিলব্ধ ধন, দোকানদারী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। পরদার গমনে এবং কুটিলতা ব্যবহারে ব্রাহ্মণ যেমন অধঃপাতে যায়, এমন আর কোন জাতিরই ঘটে না। সুদ গ্রহণে ব্রাহ্মণ সদ্য পতিত হয়। ব্রহ্মবন্ধু (অধম ব্রাহ্মণ,) চরিত্র হীন, স্বধর্ম্ম-ত্যাগী, বৃষলীপতি (শূদ্রাপতি,) রজস্বলা (স্ববর্ণা) কন্যার বিবাহকারী, খল, নর্ত্তক (বাজীকর) স্তাবক (খোসামোদী,) গায়ক এবং বাদক, গ্রামপ্রেষ্য (গ্রামযাজক, গ্রামের সাধারণের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক) এবং দৌত্য কার্য্যে রত ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ শূদ্রতুল্য সুতরাং সে বেদমন্ত্র জপকরিলেও দাস গণের ন্যায় শূদ্র পংক্তিতে শূদ্রগণের সহিত ভোজনার্থ উপবেশন যোগ্য। চাকুরী জীবী বা রাজ পেষাদি নিরত ব্রাহ্মণ মাত্রেই অন্ত্যজ শূদ্রতুল্য; অতএব ঐ সকল ব্রাহ্মণকে বৈদিক তান্ত্রিক প্রভৃতি দেবার্চ্চন এবং পিতৃ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।* ব্রাহ্মণ—মর্য্যাদা বিহীন, অশুচি, ক্রূরবৃত্তি, হিংসাপর এবং স্বধর্ম্মও উপযুক্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ যজন অধ্যাপনা এবং বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ প্রভৃতি সদবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাদির নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাকে ব্রহ্মতেজ শূন্য হইতে হয়। এবম্বিধ অধম ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য অর্থাৎ দেবার্চ্চনা ও পিতৃ শ্রাদ্ধাদিতে বরণ বা নিয়োগ করিলে তাহা নিস্ফল হইয়া থাকে। †

---

* এতে সর্ব্বে শূদ্র সমা ভবন্তি রাজন্নেতান্ দেবকৃত্যে ॥১॥

† হব্যং কব্যং যানি চান্যানি রাজন্ দেয়ান্যদেয়ানি ভবন্তি চাস্মৈ ॥২॥ মং শাং পং ৬৩ অং ৫ শ্লোক।

এই সমস্ত কারণে পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমেই ব্রাহ্মণদিগের শৌচ, আর্জ্জব (সরলতা) এবং আশ্রম বিহিত কার্য্যাবলীর সদ্বিধান করিয়াছেন। যিনি দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, সুশীল, দয়ালু, সর্ব্বসহ—সুখ দুঃখ সহনশীল, নিরাশী—বিষয়া শক্তি শূন্য, ঋজু (অকুটিল), মৃদু (কোমল স্বভাব) অনৃশংস, ক্ষমাবান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সোমপন করেন (সোমলতার রস পান করেন) তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ;—কিন্তু ইহা ব্যতিত অপরাপর পাপকর্ম্মা ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের মধ্যেই পরিগণিত। (মঃ শাঃ রাজধর্ম্ম প্রঃ ৬৩ অঃ ১—৮ শ্লোঃ পং)। তথাহি (মানবে ১০।৭৫—৭৬ শ্লোকং) ;—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দান প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥৮১॥
ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি-কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥৮২॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম ও জীবিকার জন্য অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥৮১॥ উহার মধ্যে সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন * সৎপাত্রে যথাশক্তি দান এবং যজন অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান নারায়ণের প্রত্যহ অর্চ্চনা দ্বারা পারলৌকিক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। অধ্যাপনা (বেদপাঠ করান বা সাঙ্গবেদ শিক্ষা দেওয়া) যাজন (যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনাদি বৈদিক পৌরাণিক কার্য্যের পৌরহিত্য) এবং প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজ জাতির সজ্জন হইতে (পাতিত্যাদি দোষ বিহীন ব্যক্তির নিকট হইতে) সরল ভাবে সদুদ্দেশ্যে অর্থ বস্ত্রাদি দান গ্রহণ,—এই তিন প্রকার বৈধ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥৮২ ॥

তথাহি (কল্কি পুঃ ১মাংশ ২।৩৯ শ্লোঃ)

---

* সাঙ্গবেদ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত এই ছয়টি বেদের অঙ্গ বিশেষ। উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন এবং বৈশেষিকাদি ষড় দর্শন অথবা শতপথ ব্রাহ্মণও বেদের অঙ্গ বটে উহা দর্শন নামে খ্যাত। ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিটি মূল বেদ ; উপবেদ ও কতকগুলি আছে।

যজ্ঞাধ্যয়ন দানাদি তপঃস্বাধ্যায় সংযমৈঃ।
প্রীণিয়ান্তি হরিং ভক্ত্যা বেদ তন্ত্র বিধানতঃ॥ ৮৩॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, বেদ পাঠ (স্মৃতি, শ্রুতি এবং পুরাণ), দান (জ্ঞান দান, অর্থ দান পরমার্থ দান), তপস্যা (একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দ্দশী, দুর্গাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত এবং নক্ত ভোজন ও একাহার), স্বাধ্যায় (অবশ্যকর্ত্তব্য প্রত্যাহিক বেদ বেদাঙ্গ উপনিষৎ পাঠ ও অর্থ চিন্তা), এবং ইন্দ্রিয় সংযম (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিচয়ে অন্তর্মুখী গতি) করতঃ শাস্ত্রবিধি দৃষ্টে (বিশ্বস্ত ভাবে) ভক্তি পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিবে॥ ৮৩॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২১তম অধ্যায়ের "ব্রাহ্মণস্য স্বধর্ম্মশ্চ" ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির অর্চ্চনা, অমৃতাধিক বিষ্ণু পাদোদক এবং বিষ্ণু নৈবেদ্য প্রত্যহ ভোজনই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম, বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্নাদি এবং বিষ্ণুর অপানীয় জল বিষ্ঠা মূত্র তুল্য সুতরাং ব্রাহ্মণেরা (দ্বিজবর্ণ) তাহা ভোজন করিলে শূকর যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ("ভবন্তি শূকরাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা যদি ভুঞ্জতে।") একাদশী, কৃষ্ণাষ্টমী, শিবরাত্রি, রাম নবমী এবং দুর্গাষ্টমী প্রভৃতি বৈষ্ণবাদি মহাপর্ব্বে (পুণ্য বাসরে) কখনই অন্নাহার করিবে না।

ব্রাহ্মণ জাতির তপস্যা কি এখন তাহাই বলিতেছি;—

তথাহি (পাদ্মে উঃ খঃ ১০৯ অধ্যায়);—

ব্রাহ্মণস্য তপোবক্ষ্যে তন্মে নিগদিতঃ শৃণু।
সায়ং প্রাতশ্চ যঃ সন্ধ্যা ধুপাস্তেহ স্বন্ন মানসঃ॥ ৮৪॥
জপন্ হি পাবনীং দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
তপসা ভাবিতো দেব্যা ব্রাহ্মণঃ পুত কিল্বিষঃ॥ ৮৫॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতির তপস্যা এই যে, তাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাতে ও সায়াহ্নে পরম পাবনী বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করিবে *। পুত-

* "প্রাতঃ ও সায়াহ্নে গায়ত্রী জপাদি করিবে" একথা বলায় ব্রাহ্মণেরা যেন মনে না করেন যে, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করিলেও চলে। তাহা নয় ঠাকুর মহাশয়গণ! এরূপ লেখার ভাবার্থ স্বতন্ত্র আছে। ত্রিসন্ধ্যাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। জীবে দয়াতেই প্রমাণান্তর দেখিবেন।

চিত্ত ব্রাহ্মণ যথাযথ দেবীর বৈদিক ধ্যান, যথেষ্ট উপাংস জপ (সমর্থ হইলে মানসিক জপ) † ও প্রাণায়ামাদি (উপযুক্ত গুরোপদিষ্টভাবে) অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহাদিগের তপস্যা ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ঈদৃশী তপস্যা প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার পাতক বর্জ্জিত হন ও সফল কাম হইয়া থাকেন ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥

প্রাণায়ামের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভগবান বেদব্যাস বলেন যে, (বৃহদ্ধর্ম্ম পুঃ উঃ খঃ ২।৫৮ শ্লোক)।

প্রাণায়ামৈ সদাবিপ্রো দহেৎ পাপানি ভূরিশঃ।
প্রাণায়ামং বিনা-পাপক্ষালনে নাস্তি কারণম্ ॥ ৮৬

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা প্রাণায়াম প্রভাবে প্রভূত পাপ রাশি দগ্ধ করিয়া থাকেন, স্থূল কথা (যথা নিয়মে প্রণব বীজ কিংবা গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা যথাশক্তি) প্রাণায়াম ব্যতীত পাপ সমূহ প্রক্ষালনের এরূপ উপায় আর নাই ॥ ৮৬ ॥

মহারাজ সগর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঔর্ব্ব মুনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের সনাতন আশ্রম ধর্ম্ম যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহার সংস্কৃতাংশের অধিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সংক্ষিপ্তাক্ষরে নিম্নে লেখা হইল। পাঠকদিগের নিকট বিষয়টি রুচি বিরুদ্ধ হইবেনা বলিয়াই আশা করিতেছি।

তথাহি (বিষ্ণু পুঃ ৩য়াংশ ৮।৪ শ্লোকং)—

সগরঃ প্রণিপত্যেদমৌর্ব্বং পপ্রচ্ছ ভার্গবম্।
বিষ্ণোরারাধনোপায় সম্বন্ধং মুণি সত্তম ॥ ৮৭ ॥

অর্থাৎ মহাত্মা সগর নৃপতি ভৃগুবংশীয় মুণি সত্তমঔর্ব্বকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মুণি প্রবর! কি উপায়ে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে (৮৭) এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মানবের কি ফল হয়? তদুত্তরে মুণি কহিলেন;— বৎস! ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিলে প্রথমতঃ ভূমি সম্বন্ধীয় (রাজ্যভোগ বিষয়ক) সর্ব্ববিধ কামনা সফল হয়; দ্বিতীয়তঃ স্বর্গ লাভ করা যায়,— তৃতীয়তঃ সর্ব্বোত্তমা নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্তও

---

† গায়ত্রী এবং প্রণব বাচিক জপ হয় না মানসিক জপই কর্ত্তব্য অশক্তপক্ষে বাচিক ব্যবস্থা।

পাইতে পারে। যে সকল যে পরিমাণে কামনা করা যায় তাহা অলৌকিক হাহাই হউক অচ্যুত শ্রীহরির আরাধনায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। “কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয় ?” তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথাযথ সিদ্ধান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—

তথাহি (বিষ্ণু পুঃ ৩য়াংশ ৮।৯।১০ শ্লোঃ)—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যঃ তত্তোষকারণম্ ॥ ৮৮ ॥

যজন্ যজ্ঞান্ যজত্যেনং জপত্যেনং জপন্ নৃপ !
ঘ্নং স্তথান্যং হিন স্তেনং সর্ব্বভূতো, যতোহরিঃ ॥ ৮৯ ॥

অর্থাৎ স্ব স্ব জাত্যুচিত আশ্রম ধর্ম্মের যথাযথ (উপযুক্ত) অনুষ্ঠান নিরত হইলেও (শ্রুতি স্মৃতি সম্মত স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা হইলেই) বিষ্ণু উপাসনায় অধিকার জন্মে। যেহেতু স্ব স্ব বর্ণ সম্মত আচার বা কর্ত্তব্য পালন ব্যতিরেকে (একজাতি হইয়া অপর জাতীয় ধর্ম্মাচরণের দ্বারা) ভগবান্ বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন করা যায় না ॥ ৮৮ ॥ হে নৃপ ! বিধি অনুসারে বা সাত্ত্বিক গুণাবলম্বনে যজ্ঞ করিলেই বিষ্ণুর যজন (আরাধনা) হয় * ;— বিধিপূর্ব্বক জপ করিলেই বিষ্ণু মন্ত্র জপ হয় ; (ক্ষুদ্র বৃহৎ) কোনরূপ প্রাণীর হিংসা (বধ এবং অপকার) করিলেই বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, যেহেতু ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীহরি সর্ব্বভূতময় ॥ ৮৯ ॥

আশ্রমোচিত বা স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পার্থ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—

তথাহি (গীতা ৩।৩৫ শ্লোকং) ;—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৯০ ॥

---

* যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বিষয়ে সাত্ত্বিক অর্থাৎ পায়স, ঘৃত, তিলাজ্য, দূর্ব্বাজ্য এবং পুষ্পাজ্য প্রভৃতি হোম প্রশস্ত। মাংসাদি দ্বারা রাজসিক হোম বিষ্ণু পূজায় অব্যবস্থায়।

অর্থাৎ সম্যক (উত্তমরূপ) অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির স্ব স্ব জাত্যুচিত (ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত) যে আরাধনা অথবা সদাচার তাহা দোষ যুক্ত বা অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই সকলের "স্বধর্ম্ম" *।

• ভগবদ্বাক্যে দ্বিরুক্তি দোষ থাকা সম্ভব না থাকিলেও ভগবান মানব জগতের ইহা দৃঢ় ধারণার জন্য পুনরায় গীতার একস্থানে বলিয়াছিলেন,—

তথাহি (ভগবদ্গীতা ১৮।৪৭ শ্লোকং,)—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পর ধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৯১॥

অর্থাৎ সম্যক প্রকার (সুন্দররূপ) অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্ম হীনাঙ্গ হইলেও তাহাই শ্রেষ্ঠ (তাহাই পরম সহায়,) যেহেতু স্বভাবগত কার্য্যের যথা যথা আচরণ করিলে কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না॥ ৯১॥ ভগবৎ কথিত "স্বভাবগত কার্য্যের"—এই কথাটির যথার্থ ভাব অবগত হইবার জন্য মানব জগত মনোযোগী হই—গভীরভাবে এই কথার সমালোচনা করে এবং "স্বভাব গত কার্য্য"টি যে কিরূপ ধরণের কিম্ভূত আকার প্রকারের, জানিবার চেষ্টা করে, ইহা আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি গীতা বুঝিনা—গীতার "সঞ্জয় উবাচ"তে পর্য্যন্ত আমার বোধশক্তি জন্মে নাই আর অধিক কি বলিব? গীতার "সঞ্জয় উবাচ"তে আমার বোধশক্তি এককালীন না থাকিলেও আমার এইটুকু বোধ শক্তি আছে যে, ঔর্ব্ব মুণি কথিত "বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি যে ৮৮তম শ্লোক তাহারও তাৎপর্য্য হইতেছে "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণ"—আর "স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম" ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্য—গীতার ১৮ অং ৪৭শ শ্লোক। ফলে বিষ্ণুপুরাণ ৩য়াংশ ৮৯—১০ শ্লোকের তাৎপর্য্য এবং গীতা ১৮ অং ৪৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থের উদ্দেশ্য একই প্রকার।

---

* স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম কথাটি যেমন জাতিগত, (না বলিয়া পারিলামনা) তেমনি আবার ব্যক্তিগতও বটে। দেশকাল পাত্র ভেদে "স্বধর্ম্ম" স্বধর্ম্মের উপযুক্ত হইয়া থাকে। গভীর চিন্তাশীল বা স্বধর্ম্ম নিরত যোগী জনেরই উহা জ্ঞাতব্য। জাতি ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। অধিক কি ঈদৃশ স্বধর্ম্মে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াও শ্রেয় (ভাল) তথাপি পরধর্ম্ম অর্থাৎ অপর জাতির ধর্ম্ম অত্যন্ত ভীষণ জানিবে এবং অবশ্য পরিত্যাগ করিবে॥ ৯০॥

ভূদেব ব্রাহ্মণ মণ্ডলির স্বকর্ত্তব্য, ভূভুজ ক্ষত্রিয় বর্গের স্বকর্ত্তব্য বাণিজ্যাধিপতি বৈশ্যের স্বকর্ত্তব্য এবং এমন যে দাসত্ব জীবি শূদ্র নিচয় তাঁহারও উহাই স্বকর্ত্তব্য। উপরি উক্ত শ্লোকত্রয়ের যিনি যথার্থ অর্থ ধারণে তৎপর তিনিই স্বপদে প্রতিষ্ঠিত। ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থে গ্রহণে যিনি উদাসীন, যিনি বিরক্ত অথবা তদ্বিধ ভগবদ্‌ বাক্যে এবং আপ্ত বাক্যে যিনি শিথিল চিত্ত তিনি সর্ব্বথা আর্য্যধর্ম্ম কর্ম্ম বহির্ভূত। তাহার পদে পদে বিপদ তাহার পদে পদে অমঙ্গল।

বিষ্ণুপুরাণের উপরি উক্ত তৃতীয়াংশের অষ্টমাধ্যায়ের (১০মের পর) ১১শ শ্লোকেই বর্ণিত হইয়াছে,—

তস্মাৎ সদাচারবতা পুরুষেণ জনার্দ্দনঃ।
আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান কারিণা ॥৯২॥

অর্থাৎ—এইরূপ সদাচার যুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ভগবান্ জনার্দ্দনের (শ্রীহরির) আরাধনা করা হয় ॥৯২॥

বিষ্ণু পুরাণীয় (৩—৮।১১শ্লোক) এই শ্লোকের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাদি যাবতীয় (উচ্চনীচ 'সঙ্কর' জাতি পর্য্যন্ত) ব্যক্তিই আপন আপন আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপর থাকিবে, তাহা হইলেই বিষ্ণুর আরাধনা করা হয় আশ্রম ধর্ম্মে অনুরক্ত ব্যক্তিই বিষ্ণু উপাসক বলিয়া অভিহিত হয়।

আর্য্যজাতির উচ্চনীচ সকলকেই বেদ বিহিত সদাচার যুক্ত হইতে হইবে, আচার ভ্রষ্ট জনের আশ্রম ধর্ম্ম সাধনে অধিকার নাই। তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, আচারহীন, আশ্রম ধর্ম্মহীন; আচারহীনের প্রতি বিষ্ণু ভগবানের প্রীতি নাই। অতএব বিষ্ণু ভগবানকে যে সন্তোষ করিতে না পারে তাহার জন্মই বৃথা। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে,—

আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ।
আশ্রমাচার যুক্তেন পূজিতঃ সর্ব্বদোহরিঃ ॥৯৩॥

---

* বৃহন্নারদীয় পুং ৪।২১,—২৫—২৭ শ্লোং দ্রষ্টব্য, অধিকন্তু মহাভারত আনুশাসনিকে বিষ্ণু সহস্র নামাধ্যায়ং দ্রষ্টব্যম।

সদাচার দ্বারা ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, সেই ধর্ম্ম সাধনে অচ্যুত শ্রীহরিকে পাওয়া যায়; অতএব আশ্রমাচারযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাঁহার সম্যক্ সাধন দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীহরির পূজা করিবে॥৯৩॥ এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে, ভগবৎ প্রাপ্তি আচার সাপেক্ষ জানিতে হইবে। ফলে আচার ভ্রষ্ট, আর্য্যত্ব হইতে সর্ব্বথা বঞ্চিত। ঐ সদাচার প্রসঙ্গ অত্যন্ত বৃহৎ, এদিকে না বলিলেও প্রস্তাবের অঙ্গহানিত্ব দোষ ঘটে। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী মহোদয়েরা সংস্কৃত অংশটিকে অতিরিক্ত মনে করেন তাই উপস্থিত সদাচার প্রসঙ্গে একটি মাত্র শ্লোকও সন্নিবেশিত হইতেছে না, ইহাতে বিশেষ বিশেষ পাঠক মহাশয়েরা যেন এরূপ মনে না করেন যে, "সদাচার প্রসঙ্গ আমার স্বকপোল কল্পিত।"* আমরা মানব জাতি যেরূপ আচারবান্ হইলে আমাদের আশ্রম ধর্ম্মে যথার্থ অধিকার হয় এবং যেরূপে আশ্রমধর্ম্মের সেবা ব্রত ধারণ করিলে নিশ্চয়ই বিষ্ণু ভগবানের কৃপা পাইতে পারি বাহুল্য অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাই মাত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এখন ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকের পরিতৃপ্তি এবং আস্থাহীন পাঠকবর্গের স্বধর্ম্মে অবিমল আশক্তি জন্মিলেই আমি আমার এই অসীম কষ্টের সার্থকতা মনে করিব ;—

"যিনি (সমক্ষে অসমক্ষেবা) পরনিন্দা, শঠতা এবং মিথ্যাচরণ মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগী, তিনি প্রাণি মাত্রেরই বান্ধব বা বিশ্বাস স্থানীয়, সুতরাং এবম্বিধ মহাশয় ব্যক্তির প্রতিই ভগবান বিষ্ণু সদা সন্তুষ্ট। পরস্ত্রীতে যিনি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন, পরদ্রব্যে যিনি লোভ হীন, পরহিংসা কুকর্ম্মে যিনি বিরত, তিনিই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি কোন প্রকার জীবকে (উদ্ভিদাদি প্রাণিপর্য্যন্ত) সংহার, প্রহার বা মানসিক ঈর্ষাও না করেন তিনিই বিষ্ণু ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি দেবতা (যাবতীয় দেব দেবী) ব্রাহ্মণ ও গুরুসেবা তৎপর তিনিই বিষ্ণু ভগবানের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ, যিনি আপন

---

* বিষ্ণু পুরাণ— ৩য়াংশ ৮অধ্যায়টি সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য। আমি হতভাগা "হিন্দুর সদাচার," "শূদ্রান্ন ও ব্রাহ্মণ" "ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রাহ্মণ" এবং "সৎপ্রসঙ্গ" প্রভৃতি কতিপয় ছোট ছোট পুস্তক লিখিয়াছিলাম কিন্তু অর্থাভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালেই রহিল।

পুত্রের ন্যায় সর্ব্বজীবের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি পরম সুখে থাকিয়া শ্রীহরির সন্তোষ জন্মাইতে পারেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগণ কর্ত্তৃক যাহার মন দূষিত নহে সেই বিশুদ্ধ চেতা ব্যক্তির উপরই বিষ্ণু সন্তুষ্ট থাকেন। স্থূলতঃ ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে যিনি তাহাতে শ্রদ্ধানিরত তিনিই কেবল ভগবান্ বিষ্ণু উপসনার উপযুক্ত ব্যক্তি।

রাজা সগর কর্ত্তৃক আশ্রম ধর্ম্ম এবং বর্ণধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাত্মা ঔর্ব্বঋষি পুনরায় কহিলেন যে * ;— দান, যজ্ঞ, দেবার্চ্চন, বেদাধ্যয়ন, নিত্যস্নান (ত্রৈকালীন) এবং তপর্ণাদিতে ব্রাহ্মণেরা অবশ্য রত থাকিবেন ও অগ্নি পরিগ্রহ করিবেন †। ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্য—অপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দ্বিজবর্ণত্রয়ের যাজন (পূজা ও যজ্ঞাদি) করিবেন, অধ্যয়ন করাইবেন এবং বিশেষ কোন আবশ্যক ঘটিলে বা গুরুদক্ষিণার প্রয়োজন স্থলে ন্যায়ত প্রতিগ্রহ করিবেন অর্থাৎ দান গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রাণিরই হিতসাধনে যত্নপর হইবেন কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, কারণ জীবজগতের প্রতি যথার্থ সুহৃদ্ব্যবহারই ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি। ব্রাহ্মণ পারকীয় (অন্যের) ধনকে প্রস্তর বা লোষ্ট্রের ন্যায় মনে করিবেন এবং বংশরক্ষা মানসেই (আবশ্যকে মাত্র) ঋতুকালে বৈধভাবে সবর্ণা ধর্ম্মপত্নিতে সঙ্গত হইবেন *। ক্ষত্রিয় জাতি স্বেচ্ছানুসারে সদ্বিপ্রগণকে (স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, ভূমি এবং ভোজ্যাদি দান করিবেন, বিবিধ হোম যজ্ঞ দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন এবং যথাশক্তি সাঙ্গবেদ করিবেন। শস্ত্র ধারণ এবং পৃথিবীর রক্ষা বিধানই ক্ষত্রিয়ের পবিত্র জীবিকা, এতন্মধ্যে পৃথিবী পালন

---

* সংস্কৃত শ্লোকের আবশ্যক বোধকরিলে বিষ্ণু পুরাণের উপযুক্ত স্থান (৩য়াংশ) দেখিবেন।

† উপস্থিত (বহু শতাব্দি যাবৎ) সময়ে অগ্নি হোত্রী বিপ্রের অভাব বড়ই বেশী, বঙ্গদেশেতো নাইই আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থাও তত ভাল নহে।

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ব্রাহ্মণেরা অ-বর্ণা ভার্য্যাও গ্রহণ করিতেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা, এমনকি শূদ্রানীও গ্রহণ করিতেন। জ্ঞান দুর্ব্বল বা কাম প্রবল উপস্থিত কলিযুগে এই জন্যই বহু ভার্য্যা বা অসবর্ণা ভার্য্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

করাই সর্ব্বোত্তম বা প্রথম কল্প। বর্ণাস্থিতি সম্পৰ্কে (লোকস্থিতি বা স্বধর্ম্মে মানব রক্ষার) রাজা দুষ্ট দুর্বৃত্তের নিগ্রহ এবং সাধু সজ্জনের রক্ষা বা পালন রূপ স্বাশ্রম বিহিত ধর্ম্ম দ্বারা অভিষ্ট যে ইন্দ্রলোক তাহা প্রাপ্ত হন। লোক পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে ;—"তাহারা (বৈশ্যেরা) পশু পালন (গোরক্ষা) কৃষি ও বাণিজ্য করিবে; বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান এই তিনটি কর্ম্ম বৈশ্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট আশ্রধর্ম্ম।" এতদ্ ব্যতীত তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মত সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ ও করিবে। শূদ্রের কর্ত্তব্য বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের (ব্রাঃ ক্ষঃ বৈঃ) সেবা শুশ্রূষা করিবে, দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাচরণ করিবে এবং তদ্দারাই পারিবারিক বা আত্ম জীবিকা রক্ষা করিবে। যদি একান্তই দ্বিজ শুশ্রূষায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত না হয় তাহা হইলে সনাতন সেবা বৃত্তির সঙ্গে শিল্প কার্য্য কারু কার্য্য দ্বারা অর্থসঞ্চয় এবং পরিবার পালন পোষণ করিতে পারিবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা বা দাসত্বকে পরম তপস্যা বলিয়া সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিবে! বিপ্র সেবা ব্রতধারী শূদ্রের কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহিত হইলেও শিল্প কার্য্যাদিতে মনোযোগ করিবে না। ক্ষত্রিয়ের দাসত্বকারী শূদ্র জীবিকা ক্লেশ বোধ করিলে কারু কার্য্যাদির সাহায্য লইতে পারে আর বৈশ্যের শুশ্রূষা পরায়ণতা স্থলে বাণিজ্য করিতে পারে। ফলে সেবাপর, অপর কিছু করিতে হইলেও শূদ্রেরা দ্বিজবর্ণের শুশ্রূষা বর্জ্জিত হইতে পারিবেনা এরূপ হইলেই আর্য্য ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবে। শূদ্রেরা দ্বিজ সেবালব্ধধনে সর্ব্ব প্রথম, বৈশ্যদের নামক যজ্ঞ, দানাদি সৎকর্ম্ম এবং পিতৃ শ্রাদ্ধ দেবার্চ্চনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে; এতদতিরিক্ত ধনই তাহারা জীবিকা বিষয়ে ব্যয় করিতে পারিবে।

ভৃত্যাদির ভরণ জন্য সদ্ভাবে অর্থোপার্জ্জন, ঋতুকালে পুত্র কামনায় স্বদার গমন, প্রাণি মাত্রে দয়া, কষ্ট সহিষ্ণুতা, নিরভিমান, সত্যভাষণ সত্যব্যবহার, বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি, পরিমিতশ্রম, মঙ্গলানুষ্ঠান, প্রিয়বাদিতা, মৈত্রী, অস্পৃহা অকার্পণ্য, পরনিন্দাত্যাগ, এইগুলি ব্যক্তি মাত্রেরই সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ সাধারণ লক্ষণ বলিয়া প্রোক্ত সদ্গুণাবলী বর্ণ চতুষ্টয়ের সকলেরই থাকা আবশ্যক।

মহাত্মা ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য আপদ্ধর্ম্ম বলিতেছেন ; স্ব স্ব জাত্যুচিত বৈধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি শস্ত্র ধারণ (যুদ্ধাদি) অথবা তদভাবে বৈশ্যের বৃত্তি গোপালন, কৃষি বাণিজ্যাদি করিতে পারেন ;* ক্ষত্রিয়েরাও আপদকালে বৈশ্যবৃত্তির আশ্রয় লইতে পারিবেন এবং বৈশ্যও শূদ্রবৃত্তি (দাসত্ব) অবলম্বন করিতে পারিবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা কখনই শূদ্রবৃত্তি দাসত্বের রত হইবেন না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেবা বৃত্তি বড়ই ঘৃণিত বড়ই নিন্দিত। যদি একান্তই বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাও জীবিকা সঙ্কট দূরীভূত না হয় বা প্রাণ বাঁচানো না যায়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়জাতি শূদ্রবৃত্তি বা দাস বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন ব্রাহ্মণেরা কখনই পারিবে না। দুরতিক্রমণীয় কালচক্রের নিষ্পেষণে যদি এরূপ সংঘটিত হইয়াই পড়ে, তাহা হইলে (আর্যসমাজ) এইরূপ লক্ষ্য রাখিবেন এবং একান্ত সাবধান থাকিবেন যেন শাস্ত্র নিরূপিত চাতুর্ব্বর্ণ্যবৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের যিনি যখন অনিবার্য্য আপদ বা দারিদ্রতার করাল কবলে নিপতিত হইবেন তিনিই মাত্র অপর (নীচ) বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। অপর কখনই অপরবৃত্তি যাহাতে অবলম্বন না করে তৎপক্ষে সমাজ সর্ব্বথা সতর্ক থাকিবেন। ফলে শ্রীমান্ দুর্গাচরণ দেবশর্ম্মার জীবিকা সঙ্কট উপস্থিত সে এক-যুগ বার বৎসর এক উপোসে একবেলা ভোজনে অস্থিচর্ম্মসার হইতেছেন, এখন হয়তো সকল দিবস একবেলাও জুটিতেছেনা শিশু সন্তানগুলি অথবা সহধর্ম্মিণীর এখন প্রাণ থাকেনা আপন প্রাণও আর থাকিতে চায়না অর্থাৎ অন্নাভাবে প্রাণ যায় বস্ত্রাভাবে লজ্জা সম্ভ্রম যায় এবং গৃহাভাবে গাছের আশ্রমে থাকিতে হয়, এমন সময়ে ব্রাহ্মণেও নিকৃষ্ট বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। অনা-পদীব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণ বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে আছেন, দাসদাসী দালান কোটা বাগ বাগিচা রাজা জমিদার বাড়ীর ভূরি ভূরি বিদায় মিনন্ত্রণের পত্রিকা পাইতেছেন। এমতাবস্থায় অক্ষয়চন্দ্র ব্রাহ্মণেতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না করিলে তিনি যে ব্রাহ্মণত্ব ভ্রষ্ট হইবেন তাহা আর তাহার

---

* আপদগ্রস্থ ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সত্য পথে থাকিয়া করিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রান্তরের অভিমত।

হৃদয়ে কখনই ফিরিয়া আসিবে না। সম্যক্‌রূপে ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্র সতর্কভাবে দেখাইতে বলিতেছেন, কেহই যেন অকারণ অপবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না, করিলে যে স্বধর্ম্মচ্যুত হইবেন তাহা আর ফিরিয়া পাইবেন না। অনাদপী ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিলে সে তখনই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে কর্ম্মের গতি নীচগামী হইবেই হইবে।

ঔর্ব্বমুনি বিষ্ণু পুরাণ তৃতীয়াংশের অষ্টমাধ্যায়ে উনচল্লিশ শ্লোকের বর্ণনায় "কর্ম্ম সঙ্কর" বলিয়া একটি পদ যোজনা করিয়াছেন, উহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত চারি প্রধান বর্ণ; এই চারি প্রধান বর্ণের প্রত্যেকের জীবিকা বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও পৃথক পৃথক্। এতৎপর উচ্চনীচ বহুসংখ্যক বর্ণসঙ্কর ঐ প্রধান বর্ণ চতুষ্টয়ের অনুলোম বিলোম সংসর্গ কর্তৃক উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, তাহাদেরও জীবিকা বিভিন্ন প্রকারেরই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের জীবিকা যেমন যাজন, অধ্যাপনা এবং প্রতিগ্রহ উচ্চ বর্ণসঙ্কর অম্বোষ্ঠের বৃত্তি যেমন আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা, আবার নীচবর্ণসঙ্কর বিশেষের যেমন কাষ্ঠতক্ষণ, বস্ত্রপরিষ্করণ ইত্যাদি। এই সকল জাতিগত বৃত্তি গুলি কেহ স্বেচ্ছা প্রণোদিত ভাবে অর্থাৎ উচ্ছৃংখল স্বভাবে ব্যবহার করিয়া "বর্ণসঙ্করে" "কর্ম্মসঙ্করের" যোগ দিয়া আর্য্যজাতির পরম পবিত্রতাকে এক কালীন অধঃপাতের অন্তস্তলে ডুবাইয়া না দেয়। কুশাগ্র বুদ্ধি মহর্ষিত ঔর্ব ঋষির মনে বহুশতাব্দি পূর্ব্বে আমাদের ঈদৃশ বর্ত্তমান দুর্গতির কথা জাগিয়া ছিল সুতরাং আশঙ্কিত চিত্তে বলিয়া গিয়াছিলেন "জাতিগত বৃত্তি গুলির প্রতি কেহ স্বেচ্ছাকৃত অপব্যবহার করিতে না পারে" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৃত্তি শূদ্রে, শূদ্র বৃত্তি ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিয়া জাতিগত পার্থক্য এক কালীন ভুলিয়া না যায়। জাতি পার্থক্য (কে ব্রাহ্মণ কে চণ্ডাল) ভুলিয়া গেলে স্ব স্ব বৈধ বৃত্তির ও ভুল না হইবে কেন? আমাদের ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি এখানে জাতি গত পার্থক্য, ধনুগত পার্থক্য, আকারগত পার্থক্য, এবং বর্ণগত (দৈহিক) পার্থক্য প্রভৃতি বহু প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাঠক ভ্রাতাগণ! আপনারা ইংলণ্ডের মানুষ দেখিতেছেন, আফ্রিকার মানুষ দেখিতেছেন এবং চায়নার মানুষ দেখিতেছেন এমন কি রাত্রি দিন বিপরিত যে আমেরিকা বা দ্বিতীয় পৃথিবীর পাতালপুরের মানুষ পর্য্যন্ত দেখিতেছেন। ইহাদের

কর্ম্ম, জাতি পাতির পার্থক্যই ... তাহাদের অনেকে বুঝেন না অথবা তলাইয়া দেখিবার অবসর অনেকে পান না কিন্তু ব্যক্তিবর্গকে দর্শন করিয়া বর্ণগত ... চাল চলনগত বিশেষ কোন পার্থক্য বোধ করিতে পারেন কি?

বোধ হয় পারিবেন না। আর আমাদের ভারতীয় সহস্র ব্যক্তিকে একত্রিত করিলে তাহার ভিতর সবে মাত্র দুইটিকে একাকৃতি একই বর্ণ বিশিষ্ট পাইবেন কি? এই যে একই প্রকার দুই ব্যক্তিকে (সহস্র ব্যক্তির মধ্যেও) পাইতেছেন না, এই স্থূল হিসাবেই ধরিয়া লইবেন ভারতবাসী আর্য্য জাতির জাতিগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিগত, ধর্ম্মগত, এবং প্রবৃত্তিগত পার্থক্য পর্য্যন্ত না থাকিয়া পারে না। ভারতবাসী আর্য্য সন্তান বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিশিষ্ট সুতরাং ইহারা জাতিগত, ধর্ম্মগত এবং জীবিকা গত পার্থক্য ভুলিয়া একত্র হইতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে জাতি নাশ জাতিনাশের সঙ্গে ধর্ম্ম নাশ, ধর্ম্ম নাশের সঙ্গে সনাতন জীবিকা নাশ, জীবিকা নাশের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতার সর্ব্বনাশ, হায়! হায়!! সেই সর্ব্ব চরম সর্ব্বনাশ!!!

চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যবিলি বা বর্ণাশ্রমাচার সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ;—

তথাহি (গীতা ৪।১৩ শ্লোক ;—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগসঃ।
তস্য কর্ত্তারমপিমাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৪॥

হে অর্জ্জুন! সত্ত্ব রজঃ এবংতমো এই গুণত্রয়ের বিভাগ এবং কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছি॥১৪॥ তাৎপর্য্যার্থ এই এই যে, সত্ত্বগুণাধিক্যে শম, দম, আর্জ্জব এবং তপঃ কেশাদির প্রবৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণের; রজোগুণাধিক্য শৌর্য্য, বীর্য্য, একান্ত পৌরষ এবং প্রজারক্ষণ প্রভৃতি শক্তি দিয়া ক্ষত্রিয়ের; রজস্তমো মিশ্রগুণাধিক্যে-পশু সংসর্গ বা পশু পালন, কৃষি এবং বাণিজ্যাদির শক্তি দিয়া বৈশ্যের পরন্তু তমোগুণাধিক্যে পরাধিনতা বা দাসত্বের প্রবৃত্তি দিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু অর্জ্জুন! তুমি এইটি মনে রাখিও যে, আমি সৃষ্টি কর্ত্তা হইলেও এ সকল বিষয়ে আমি অকর্ত্তা বা সর্ব্বথা নিস্পৃহ অর্থাৎ অনাশক্ত।